বাংলা কাব্য প্রবাহ

সিন্ধুগামী নদীর মত বাংলা কাব্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যুগে যুগে ভগীবথব্রতী কবিকুল সেই প্রবাহকে নিয়ে চলেছেন বিচিত্রপথে মানুষেব অনুভব-সিন্ধুব উদ্দেশ্যে। এই কাব্যধাবাব অমৃত স্পর্শে অভিসিঞ্চিত হচ্ছে আমাদেব হৃদয।

উৎসমুখ থেকে উৎসাবিত এই অমৃত-নদীব পবিচয নেবাব চেষ্টা কবা হযেছে এই গ্রন্থে।

চর্যাপদ থেকে ভাবতচন্দ্র পর্যন্ত প্রসাবিত পথযাত্রাব পবিচযবাহী এই গ্রন্থখানি বাংলা-সাহিত্যেব এক বস গ্রাহী ইতিহাস।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

শৈলপুরী কুমায়ুন

বসন্ত বিলাপ

কলাভূমি কলিঙ্গ

কন্যা কাশ্মীর

অগ্নিকন্যা

অনেক বসন্ত দু'টি মন

ভোরের রাগিণী

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী

রোদ * বৃষ্টি * ভালবাসা

বাংলা কাব্য প্রবাহ

বাংলা কাব্যের অন্তরঙ্গ আলোচনা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অধ্যাপক
বঙ্গভাষা
ও
সাহিত্য

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক : ডি মেহরা
রূপা অ্যাণ্ড কোং
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : বিভূতি সেনগুপ্ত

দাম : দশ টাকা

পূজ্যপাদ আচার্য

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভাগীরথীর স্রোতধারা চির পুরাতন তবু নিত্য নবীনা। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন বৃত্তান্তটিও তেমনি বহুশ্রুত, তবু নিত্যশ্রবণে বীতক্লান্তি। এই চির পরিচিত বৃত্তান্তটি কেবলমাত্র একটি কাহিনী যদি হতো তাহলে আমাদের চিত্ত মহাকাব্যের যুগ থেকে এত দীর্ঘকাল-পথ তাকে সঙ্গী করে রাখতে পারত না; বহু বিস্মৃতির পথিপার্শ্বে তাকে পরিত্যাগ করে আসতো।

কিন্তু তা হয়নি। এই না-হওয়ার পেছনে সমগ্র জাতির একটি মানস-ইতিহাসের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা সমগ্র জীবনব্যাপী প্রবাহকে পূজা করি।

এই গতি প্রবাহে আমাদের কামনা কল্পনা অজস্র আবর্তের আনন্দলীলা সৃষ্টি করে চলে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তটিকে আমরা নানাভাবে দেখতে অভ্যস্ত।

গ্রন্থ সম্বন্ধে

ভগীরথ গঙ্গাকে আহ্বান করে বন্ধ্যা অভিশপ্ত ধরিত্রীর শাপমোচন করেছিলেন। মৃত মৃত্তিকা গতিশীল *জলপ্রবাহের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে জীবনের* ফসল ফলিয়েছিল।

এই ছোট্ট চিত্রটি আমাদের হৃদয়কে আশ্চর্যভাবে স্পর্শ করে রইল। আমরা উপবাসী-হৃদয়ের দ্বারে কোন কবির কাব্যপ্রবাহের অমৃত স্পর্শ পেয়ে তাঁকেও ভগীরথ-ব্রতী বলে ভাবতে শিখলাম। ভগীরথ বৃত্তান্ত এইভাবে আমাদের জীবনের বৃহত্তম উপমার উৎসধারা হয়ে রইল।

বাংলাকাব্যসাহিত্য সয়ম্ভু নয়। জননী তার সংস্কৃত। সহোদরা হিন্দী, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি। বন্ধুত্বের গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে তার বহুজনের সঙ্গে। পৃথিবীর বহু ভাষা তাকে ভূষিত করেছে নানা ভাব-সম্পদে।

সংস্কৃত-জননীর অঙ্ক থেকে ক্রীড়াচ্ছলে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকটি ভগিনী। শৈশবের স্খলিত পদসঞ্চারে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

বাল্যলীলার লিপিবদ্ধ ইতিহাস রাখা সম্ভব নয়। তাদেরও কোন সুগ্রথিত লীলা-পরিচিতি পাওয়া যায় না। কেবল ক্রীড়াচ্ছলে যে দুই-চারিটি শিলালেখ অথবা তাম্রপত্র তারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে গিয়েছিল, তার থেকে আমরা তাদের গতিপ্রকৃতির যৎসামান্য আভাস পাই মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখ্য রূপটি আমরা দেখতে পেলাম চর্যাপদে।

ধর্মের সংগুপ্ত আশ্রয়ে আমরা দেখলাম তাকে। দেখতে পেলাম তার

প্রথম বিকশিত রূপটি। আধ্যাত্মিকতার আবরণের আড়ালে কাব্যকন্যার দেহে নব বসন্তশ্রীর সুষমা। ধর্মের কঠিন কঠোর শিলাবরণের আড়ালে মধুর রসের অমৃত-নিস্যন্দী প্রবাহ।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥

[উঁচু উঁচু পর্বত। সেখানে আমাদের মধুর রসের লাবণ্য-প্রতিমা শবরীর বাস। পরিধানে তার ময়ূরপুচ্ছের ঘাগরা; কণ্ঠে অপরূপ গুঞ্জার মালা।]

এই শবরীর জন্যে শবর পাগল হল। ধর্মের একটি সংগুপ্ত তত্ত্ব এর ভেতর আমরা লাভ করি। কিন্তু সে তত্ত্ব বিশেষ এক শ্রেণীর সাধকের হতে পারে, —রসগ্রাহী সাহিত্য পাঠকের কাছে সে আবেদন মোটেই অপরিহার্য নয়।

আমরা বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবীন প্রাণের বসন্ত লগ্নে অস্পষ্ট কনে-দেখা-আলোয় যাকে দেখলাম, সে আমাদের মানস-প্রতিমা। সে কঠোর ধর্মের নির্মোক খুলে ফেলে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে এসে মানসী-মূর্তিতে দাঁড়াল।

এই কন্যাই বাংলা কাব্যের সৌন্দর্যলক্ষ্মী হয়ে বারে বারে আমাদের অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

'গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে যে গীতি-রসধারা নির্ঝরিত হয়েছে, সেখানেও আমরা দেখেছি কাব্য-কন্যার ভাব-মূর্তি। সেখানেও কেবলমাত্র ভূষণ বসনের অন্তরাল। এই অন্তরাল থেকে তার বাঙালী ভাব-মূর্তিটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। মধুর রসের সরোবরে জয়দেব কন্যাটিকে অবগাহন-স্নান করিয়ে এনেছেন। এ লাবণ্য-রচনায় বাঙালীর সৃজনশীল মনেরই স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আমাদের বাঙালী ভাব-চেতনার আর এক সাক্ষ্যবাহী গ্রন্থ। এখানেও প্রণয়-মাধুর্য। দেহজ কামনা বাসনার উচ্ছলিত আবর্তলীলা। রাধাকৃষ্ণ সাধারণ মর্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন এখানে।

বাঙালী চিরদিনই গৃহাঙ্গণে দেবতার আসন বিছিয়েছে। ঘরের মানুষের হৃদয়কে কল্পিত দেবতার ধ্যানলোক-বিহারী হৃদয় অপেক্ষা সত্য ও স্পষ্ট করে দেখেছে। তাই তার সৃষ্টিতে দেবতা মানুষের ঘরে নেমে এসে মানুষী লীলাই করে গেছেন। এ লীলার কোথাও প্রাকৃত বলে সংকোচ নেই। সাধারণ স্তর থেকে এই লীলা অসাধারণ আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণবপদকারদের পদে সাধনাকে মিথ্যা কৃত্রিম কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। বাস্তব সত্যকে

স্বীকার করে তাঁকে সুষমামণ্ডিত করা হয়েছে। বাস্তব-সত্য এক সময় নিশ্চিত পথ পরিক্রমার অন্তে ভাব-সত্যে উপনীত হয়েছে।

বাংলা কাব্য-কন্যা এই প্রেম মূর্তিতেই চর্যাপদ থেকে পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে বিহার করেছে।

কিন্তু বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ পর্বে কিংবা মঙ্গলকাব্য পর্বে আমরা বাঙালীর মধুররসে গড়া প্রতিমার সাক্ষাৎ পাইনা।

এই দুটি অধ্যায়ে আমরা একটি সর্বজনীন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। এই সত্য অবশ্য চর্যা, কিংবা বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যেও পাওয়া যায়।

বাঙালীর দেবপ্রীতি অপেক্ষা মানবপ্রীতির প্রবণতাই অধিক।

কৃত্তিবাসের শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ; কিংবা মঙ্গলকাব্যের বেহুলা, চন্দ্রধর, সকলেই আমাদের ঘরের মানব-মানবী। কোমলতা ও কঠোরতার বিমিশ্র যে মানস-প্রকৃতি বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এইসব চরিত্রসৃষ্টিতে তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

দেবতাকে সংগ্রাম করে দূরে সরিয়ে রাখা, অথবা একান্তভাবে ঘরের মানুষ করে নেবার মেজাজটি সম্পূর্ণভাবে বাঙালী মানসের।

বাঙালীর কাছে চিরদিনই দেবতার উপর মানুষই জয়ী হয়েছে।

তাই বাঙালী কবি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছেন.

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

এই মানব-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যদেব। কল্পিত দেবতার চেয়ে মানুষের দৃষ্টিতে তিনি প্রিয়তম হয়েছেন। তাঁকে আশ্রয় করে যে জীবনীসাহিত্য-শাখা গড়ে উঠেছে তা মানুষেরই জয়গান। কাব্যে, সমাজ, সংসার, রাজনীতি সবকিছুই এসে পড়ে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা বাঙালী ইতিহাসের বৃহত্তম প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছি। পতন অভ্যুদয়ের এমন সংগ্রামী ইতিহাস বোধ-করি বাংলা কাব্যসাহিত্যের আর কোন পর্বেই দেখা যায় না। ঘটনার আবর্তলীলা এই পর্বগুলিকে দান করেছে কিছু পরিমাণে মহাকাব্যের মহত্ত্ব।

বৈদিক এবং ঔপনিষদিক চিন্তার স্পর্শ আমাদের বাংলা কাব্যদেহে আছে সন্দেহ নেই, এবং এই স্পর্শ বাংলা কাব্যকে যে এক অচিন্তনীয় ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেছে তাও সত্য, কিন্তু সমগ্র বাংলাকাব্যের আত্মা স্পন্দিত হয়েছে অবৈদিক বাঙালী চেতনার কাদামাটি মিশ্রিত প্রবাহ-স্পর্শে। এইখানেই বাঙালী স্রষ্টার নিজস্বতা।

'প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল-সীমা পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের দেহে আর্যভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশী চিন্তা তাদের স্পর্শ রেখেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ সব চিন্তাধারাকে আমরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেও প্রাণের বস্তু বলে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। যেখানে বাঙালীচিন্তার জলহাওয়ার স্পর্শ পাই সেখানেই আমরা প্রাণের মধ্যে তাকে বরণ করি। আপনার বস্তুকে পেয়ে হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করি।

বাঙালীচিন্তার এই নিজস্ব পটভূমিতেই আমরা রসগ্রাহীর দৃষ্টি নিয়ে বাংলা কাব্যপ্রবাহের দিকে তাকিয়েছি।

ইতিহাসের ধারা রক্ষা করে এই কাব্যের সম্ভাব্য গতিপথ নিরূপিত হয়েছে, বিভিন্ন স্রোতধারা কি ভাবে মূল প্রবাহে এসে তার ধারা মিলিয়েছে তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিরা এসেছেন বিভিন্ন রসের নৌকো বেয়ে। বিচিত্র ভাবের সম্ভারে পূর্ণ সে সব নৌকো। তাঁরা দুই তীরের উৎসুক জনতার কাছে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের পণ্য। পরিবর্তে নিয়ে গেছেন গ্রহিতার সোচ্ছ্বাস অভিনন্দনের মালা।

যুগে যুগে কালে কালে কাব্যপ্রবাহের তীরে তীরে চলেছে এমনি দেয়া-নেয়ার লীলা বৈচিত্র্য।

যতটুকু সম্ভব হয়েছে চর্যাপদ থেকে কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্য প্রবাহের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

আমার পূর্বসূরীদের প্রায় প্রত্যেকের কাছে আমি এ বিষয়ে ঋণ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি।

বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীসুকুমার সেন, স্বনামধন্য শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, দেশবন্দিত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও আমার অগ্রজপ্রতিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের কাছে।

সর্বশেষে যাঁকে স্মরণ করছি তিনি আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের দান এই গ্রন্থ রচনায় বোধকরি লেখকের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি, নানাভাবে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতো না।

লেখক

আলোচনা সূচী

● নবীন প্রাণের বসন্তে

বাংলাদেশেব ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত আলোচনা। বাঙালীদেব সংস্কৃত চর্চা। এই প্রসঙ্গে কবি জয়দেব। পববর্তী কাব্য-প্রয়াসেব ভাব-স্পন্দন।

● প্রথম উদয়

বাংলাদেশেব ধর্মধাবা। চযাপদেব ধর্ম, সমাজ ও কাব্য-পবিচয় প্রথম বাংলাভাষায় বচিত সাহিত্যেব যথার্থ স্বরূপ।

● তিমির বিদারী অভ্যুদয়

তুর্কী আক্রমণেব ফলে সাহিত্যেব অন্ধকাব আকাশ। সাময়িক অন্ধকাবেব অন্তবালে বাঙালী সমাজেব সংহতি। এই সংহতিব পথে বাংলা সাহিত্যে লোকাযত ও আর্য সংস্কৃতি-সূত্রে আগত অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য ও গীতিকাব্যেব প্রসাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গ। বিদ্যাপতি ও তাঁব কবিকৃতি। বাংলা কাব্যধাবায কৃত্তিবাস ও তাঁব বামাযণ। মালাধব বসুব শ্রীকৃষ্ণ-বিজয কাব্য। মঙ্গলকাব্যেব পবিমণ্ডল। চৈতন্য পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যকাব ও তাঁদেব কাব্য।

● আলোকের এই ঝর্ণাধারায়

শ্রীচৈতন্যেব আবির্ভাব। তদানীন্তন সমাজ-পবিবেশ। চৈতন্য-জীবনলীলা ও সাহিত্যে তাব অমৃত-স্পর্শ। শ্রীচৈতন্য জীবনী-সাহিত্য। সংস্কৃত ও বাংলায বচিত লীলাকাহিনী। চৈতন্য-জীবনীকাব কবি সম্প্রদায। চৈতন্যযুগেব পদাবলী সাহিত্য। গৌবাঙ্গ বিষযক পদাবলী। বাধাকৃষ্ণ বিষযক পদাবলীব ভাব-পবিমণ্ডল। চৈতন্য-সমসাময়িক ও তৎপববর্তীকালেব পদাবলীকাব। জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস এবং গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতিব পদেব সাদৃশ্য আলোচনা। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেব কতিপয় বিশেষ বিশেষ

পদের রসাস্বাদন। চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যধারা। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কবি। মুকুন্দরামের কবিকৃতি। মনসা-মঙ্গলকাব্য ও কবি সম্প্রদায়। ধর্মমঙ্গলকাব্য ও কবিসম্প্রদায়। ঘনরামের কবিকৃতি। শিবমঙ্গল বা শিবায়ণকাব্য। রামেশ্বরের কবিকৃতি।

চৈতন্যোত্তর যুগেব অনুবাদ সাহিত্য ও অনুবাদক। কাশীরাম ও তাঁর কাব্য। নাথ-সাহিত্য ও লোকসাহিত্য পরিচিতি। মণিকার ভাবতচন্দ্র ও তাঁব কবিকৃতি। শাক্ত পদাবলী রচয়িতা রামপ্রসাদ।

নবীন প্রাণের বসন্তে

কবিগুরু তাঁর বহুপঠিত একটি কবিতায় ভূমিকে নির্লাজ কুলটা বলে ধিক্কারধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন ; আজ বাংলাদেশের কলেবরের দিকে তাকিয়ে বাব বার কবির ঐ উক্তিটিই ফিরে ফিরে মনে পড়ে।

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ভূমি হস্তান্তরিত হয়, দেশের সীমাচিহ্ন নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায় বহু সাধনায় গড়েওঠা কৃষ্টি সংস্কৃতি মহাকালের গর্ভে। মুষ্টিমেয় গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দল প্রাচীন গ্রন্থাদির অস্পষ্ট লিপিলেখার মধ্যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলালেখর অভ্যন্তরে লুপ্ত ইতিহাসের সূত্র সন্ধান করে ফেরেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও ভাবনার সম্মুখে অতীত ইতিহাস স্পষ্ট করে তার গুপ্ত অধ্যায়ের পাতাগুলি মেলে ধরে না।

বর্তমান বাংলাদেশ নানা আবর্তে একে একে তার অঙ্গ হারিয়ে যে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়েছে, তাকেই যদি আমরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জন্মভূমি বলে মনে করি তাহলে আংশিকভাবে তা সত্য হবে মাত্র। আজকের ভূগোলের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ বঙ্গ একদিন বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল, আর তারই বুকে নন্দন শোভায় জেগে উঠেছিল বাংলা-সাহিত্যের মধুগন্ধে ভরা পারিজাত।

কালের কুটিল প্রবাহে বঙ্গভূমি যদিও আজ তার সীমারেখাকে হারিয়েছে, তবুও অসংখ্য নদনদীর কেশজাল বিস্তৃত করে শ্যামাঙ্গী বঙ্গপ্রকৃতি মানুষের মনে যোগান দিয়ে চলেছে নিত্য নবরসের বিচিত্র স্বাদ। এ দেশ চিরযৌবনা, দক্ষিণ মলয়ের মৃদু হিন্দোলে হাল্কা সবুজ চেলাঞ্চল বিকম্পিত করে, অধরে স্ফুরিত হাস্যের ছটা বিকীর্ণ করে এ দেশ তার সন্তানের মনে জীবনরসের প্রবাহকে প্রতিক্ষণে উচ্ছল উত্তাল করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ঝটিকাবর্তে দেশের গভীর নীল আকাশ থম থম করেছে, ঈশানের রুদ্ররোষ

ঝঞ্ঝার মঞ্জীর ঝঙ্কারে ক্ষণেকের জন্য স্নিগ্ধ-শ্যাম শান্তি বিদীর্ণ করেছে, কিন্তু 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'।

যুগে যুগে বাঙ্গালী রঙ্গরসের যে পরিচয় পরিস্ফুট করেছে তার কাব্য-কবিতায় তার স্বাক্ষর এখনো বিদ্যমান। বস্তুতঃ বাংলাদেশের কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী-জীবনের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলাদেশের কাব্যধারায় দেশপ্রকৃতিও চিত্রপারম্পর্যে পরিমণ্ডিত হয়ে জ্যোতিসমুদ্ভাসিত মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং বাংলাকাব্যের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হলে এদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ধারা এবং জাতীয় জীবন-পরিচিতি অত্যাবশ্যক।

একেবারে সম্প্রতিকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মাটির নিচে প্রাচীন সভ্যতার নানা পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য এই পরিচয় এখনো সম্পূর্ণতঃ সমুদ্ঘাটিত হয়নি, যেদিন তা হবে সেদিন নিশ্চয়ই বাংলার সভ্যতাকৃষ্টির সম্যকরূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। এখনো পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন যে ভৌগোলিক পরিচয় পাই তাতে দেখা যায় যে প্রাচীনকালে আধুনিক বাংলাদেশ প্রধানতঃ চার বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল—বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ। এই সমগ্র ভূখণ্ডকে গৌড়-বঙ্গ বা গৌড় বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হত্তো। গৌড় বলতে বোঝাতো সাধারণতঃ রাঢ়-বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং বঙ্গ শব্দ দ্বারা বঙ্গ কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাংলা বোঝাত্তো। এই ভূখণ্ডই শাসনকার্যগত দিক থেকে আবার চার ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, দণ্ডভুক্তি এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, বর্ধমানভুক্তি পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে গঠিত, দণ্ডভুক্তিতে ছিল দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অংশ আর প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ভুক্তির মধ্যে ছিল কামরূপ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও আসাম। বাংলা-দেশের এই ভৌগোলিক সীমা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল, তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম পর্বের বাংলাকাব্যে এই ভৌগোলিক পরিবেশের

প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মোগলযুগেই এই ভূখণ্ডকে 'বাঙ্গালা' নামে প্রথম নির্দেশিত করা হয়। 'বঙ্গাল' নামটি সম্ভবত 'বঙ্গপাল' শব্দটি থেকে এসেছে। একসময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল প্রধানতঃ জলা জায়গা ছিল এবং সাধারণভাবে এই জলা জায়গার নাম ছিল বঙ্গ। বঙ্গের অধিবাসী বঙ্গাল নামে উল্লিখিত হয়েছে অন্ততঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী থেকে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদের 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলি' উক্তি থেকে এর যোগ্য সমর্থন মেলে।

কিন্তু এ আলোচনার আগেও আলোচনা আছে। একটি প্রশ্ন সরাসরি সামনে রেখে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। ভারতের এক অংশে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ যখন রচিত হয়েছে তখন বাংলাদেশের অবস্থা কি ছিল? এই প্রশ্নের কোন প্রত্যক্ষ উত্তর আমরা পাই না। জনতত্ত্বের সাহায্যে এই প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশে আর্যীকরণের ধারা লক্ষ্য করে তার সমাধানের পথ সন্ধান করা যেতে পারে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে নিম্নবর্ণের বাঙালী এবং বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আদি-অষ্ট্রেলীয় জনধারার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণেও এর সমর্থন মেলে। এই অষ্ট্রিকজাতি-প্রভাবের জন্যই পুরোনো সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বাংলাদেশ নিন্দিত হয়েছে। অনেকের মতে এই জাতিধারাই নিষাদ। এই জাতিধারার মধ্যে কৃষি সভ্যতা প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে গিয়ে সেই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের ওপর আর্যপ্রভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আধুনিক কালেও দৈনিক ব্যবহার্য শব্দে, যেমন বাঁখারি, খামার, পাগল, পেট, নারিকেল, তাম্বুল ইত্যাদি; বাঙালীর জন্ম-মরণ-বিবাহ সংস্কারে; মেয়েদের ব্রত-আচারে; এদেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চর্যায়, নাথ-

পন্থীদের আচার-আচরণে, ধর্মঠাকুরের পূজায়, শিবের গাজনে অষ্ট্রিক প্রভাবের নিদর্শন বিদ্যমান।

অষ্ট্রিকজাতিগোষ্ঠীর পরেই বাংলাদেশের জনপ্রবাহে দ্রাবিড়ভাষী জাতির স্থান স্বীকার করে নিতে হয়। এই জনপ্রবাহও বাংলাভাষায় বিচিত্র শব্দসম্পদ দান করেছে, যেমন উর, পুর, কুট প্রত্যয়ান্ত নগরবাচক শব্দ ; রূপ, কলা, কপি, মর্কট, ময়ূর, তণ্ডুল, শিব<শিবম্ শম্ভু<শম্বু, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, নাড়াজোল, হাওড়া, চুঁচুড়া, রিষড়া প্রভৃতি শব্দ ও স্থানের নাম।

বাঙালীজাতির মূল উপাদান হিসেবে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এই মিশ্র অষ্ট্রো-দ্রাবিড়-জাতিকে লক্ষ্য করেই আরণ্যক, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে এদেশ সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইজন্যই যে উৎসাহী আর্যরা নিজেদের বাসভূমির গণ্ডী লঙ্ঘন করে এদেশে এসে কিছুকালের জন্য বসবাস করতেন, এদেশের মিশ্রজাতির সান্নিধ্যে আসতেন, তাঁরাই 'ব্রাত্য', 'বৃষল' ও 'অদীক্ষিত' নামে নিন্দিত হতেন। কালক্রমে এদেশে আর্য-অনার্য সম্প্রদায় মিলে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করলো ; বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্রতর বিশ্বাস, বিভিন্ন উপাদান তার পাথেয় হলো। এই মিলনসূত্রে আরও একটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করতে হয়, সে গোষ্ঠীটি হলো তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠী। এখনও বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব-সীমান্তে এদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের বিশেষ কোন দান নেই।

আমাদেব উত্থাপিত প্রশ্নে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাই যে প্রাগার্য বাংলাদেশে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী কৃষিসভ্যতার এক অঙ্কুরিত রূপকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু সেই অঙ্কুরিত রূপ প্রকাশের আলোক লাভে বঞ্চিত ছিল, সে কেবল মুখের কথায় ছবি এঁকেছে, হৃদয়ের স্বপ্নে কারুকৃতি করেছে। সুর্যসনাথ বৃক্ষের পত্র-পল্লব শোভার, পর্যাপ্ত পুষ্পসম্ভারের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয় বঙ্গ-

সংস্কৃতি সভ্যতার জন্য অপেক্ষা করেছে বাংলাদেশ আর্য অভিযান পর্যন্ত।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই আর্যগণ পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই তাঁরা বাংলাদেশেও এসেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া আর্যসমাজে কি হয়েছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড সঞ্চালিত হওয়ার শুরু থেকে (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) এদেশে আর্যপ্রভাব বিস্তৃতি-লাভের সুযোগ পেল। ক্রমে এ দেশের আর্যেতর জাতিও আর্যদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মর্মলোকের সন্ধান লাভ করলো ; বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে তারাও হয়ে উঠলো বরণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ তৃতীয় শতক থেকেই এই ধারা বইতে শুরু করলো আর গুপ্তসাম্রাজ্যের বাহুপাশে আবদ্ধ বাংলাদেশ তার সম্পূর্ণতাকে প্রকট্‌ করে তুলল। অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩০০—খ্রীষ্টাব্দ ৫০০ পর্যন্ত মোট আটশো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে এবং সুগভীরভাবে আর্যীকরণের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এই জন্যই খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান চুয়াং যখন বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি এদেশে একদিকে ব্রাহ্মণ্যমত ও বৌদ্ধ-জৈন মতের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন, অন্যদিকে দেখেছেন যে এদেশ সম্পূর্ণতঃ আর্যভাষী হয়ে গেছে।

এই আর্যীকরণের ফলশ্রুতিস্বরূপ বাংলাদেশে ক্রমে বিবর্তনের পথ বেয়ে বাংলাভাষা রূপ লাভ করে। অবশ্য ভাষায় রূপান্তরিত হতে সময় লেগেছে প্রচুর। প্রথমতঃ আর্যভাষা (সংস্কৃত) কালবৈগুণ্যে এবং দেশপ্রকৃতির জন্য প্রাকৃত রূপ লাভ করেছে, দ্বিতীয়তঃ এই প্রাকৃত থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে অপভ্রংশ জন্মলাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে ভাষা আত্মবিস্তার লাভ করেছে। আনুমানিক ৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলাভাষার যাত্রা শুরু। এই ভাষায় প্রথম যে সাহিত্যসঙ্গীত উদ্গীত হয়েছে 'চর্যাপদের' মধ্যে তার প্রাণবন্ত সুর এখনও ধ্বনিত হচ্ছে। বাংলাভাষার আবির্ভাবের পর থেকে বাংলাদেশে সাহিত্য-সাধনার মন্দাকিনীধারা

প্রবাহিত হতে শুরু করলো। সংস্কৃত জননীর সদ্যোজাত এক শিশু মুক্ত অঙ্গনে স্বাধীন অপটু পদবিস্তার শুরু করেছে দশম শতকে আর তার বলিষ্ঠ চরণের ছন্দিত গতি বিশ্বজনকে বিস্মিত করেছে বিংশ-শতকে। বাংলাকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাব কেমন করে একটি সহস্রদল পদ্ম ধীরে ধীরে তার দল উন্মোচন করে গন্ধে বর্ণে আপনাকে বিকশিত করে তুলেছে।

কিন্তু তার আগেও কিছু কথা আছে। বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভের সূত্রেই এদেশে সাহিত্যচর্চার এবং সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। বলা বাহুল্য এই সাহিত্য সৃষ্টি সংস্কৃতভাষার আশ্রয়ে, প্রাকৃতের আশ্রয়ে এবং অপভ্রংশের ছত্রছায়ায় সাধিত হয়েছে। আর্যীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপই বাংলাদেশে 'সংস্কৃতী-করণ' ঘটে। অবশ্য এই জন্যই বাংলাভাষাও একটি সুদৃঢ় বনিয়াদ লাভ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করেছে। বাঙালী সংস্কৃতের সংস্পর্শে এসে এই ভাষার প্রাণসম্পদ গ্রহণ করেছে এবং আপন মনের অজস্র মাধুরী মিশিয়ে তাতে রসের মূর্তি রচনা করেছে। বিভিন্ন প্রত্নলিপিতে, তাম্রলিপিতে, নানা প্রশস্তিতে, কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থদ্বয়ে, জয়দেব-উমাপতি-ধোয়ীর রচনায় বাঙালীর সংস্কৃত আশ্রয়ে সাহিত্য রচনার উজ্জ্বল নিদর্শন এখনও অপরিম্লান রয়েছে। সংস্কৃত রচনার রীতি হিসেবে গৌড়ীরীতি একসময় সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেছিল, এই পরিচিতির সঙ্গে অবশ্য দোষগুণ দুই-ই মিশে আছে। বামনের মতে গৌড়ীরীতি নিন্দনীয় নয়, এই রীতি ওজঃ ও কান্তি গুণসমন্বিত, অন্যদিকে বাণভট্ট 'গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ' (গৌড়ে কেবলমাত্র অক্ষর ডম্বর, শব্দাড়ম্বর) বলে গৌড়ীরীতিকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, বামন সম্ভবতঃ বাঙালীর শিল্পচেতনার মর্মরূপটি দেখতে পেয়েছেন —তিনি বাঙালীর রচনায় ওজস্বিতার নিদর্শন পেয়েছেন এবং কান্তিগুণের সন্ধান পেয়েছেন। উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতির প্রকাশভঙ্গী এমনি হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের

আকাশে বাতাসে, প্রান্তে ও প্রান্তরে, নদী-নির্ঝরিণীতে, বৃক্ষলতায় উচ্ছ্বাসধর্মিতা এবং আবেগপ্রবণতার অফুরন্ত উৎস সঞ্চিত রয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সংস্কৃতে রচিত বাঙালীর সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা যেতে পারে :

সিদ্ধার্থস্য পরার্থসুস্থিতমতেঃ সন্মার্গমভ্যস্যতঃ
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুত্তরাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াৎ।
যস্ত্রৈ ধাতুকসত্ত্বসিদ্ধি পদবীরত্যুগ্রবীর্যোদয়াজ্
জিত্বা নির্বৃতিমাসসাদ সুগতঃ সন্ সর্ব্বভূমীশ্বরঃ॥

[দেবপাল দেবের মুঙ্গের ও নালন্দায় প্রাপ্ত লিপির প্রথম শ্লোক।]

(অন্বঃ—যাঁর মতি পরার্থে সুস্থিত, যিনি সন্মার্গ অভ্যাস করছেন, যিনি অত্যুগ্রবীর্যবলে ত্রিলোকনিবাসী জীবের সিদ্ধির উপায় জয় করে নির্বৃত্তি লাভ করেছেন, যিনি সুগত এবং সর্বপারমিত ভূমির ঈশ্বর, এমন ভগবান সিদ্ধার্থের সিদ্ধি তাঁর প্রজাদের অনুত্তর সার্থকতা প্রদান করুক।)

মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সী সন্দধানঃ
সম্যক্ সম্বোধি বিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ।

[নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর লিপির প্রথম শ্লোক।]

(যিনি কারুণ্য রত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সী-রূপে ধারণ করেছেন, যিনি সম্যক্ সম্বোধি বিদ্যারূপ নদীর অমলজলে অজ্ঞান পঙ্ক ক্ষালন করেছেন, যিনি মাররূপ অরির আক্রমণ পরাভূত করে শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, এমন শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুক্ত হোন।)

এই ধরনের রচনার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। উদ্ধৃত শ্লোক-গুলি প্রশস্তিমূলক। প্রশস্তি রচয়িতাগণ সুযোগ মত কাব্যরস সৃষ্টিরও সার্থক প্রয়াস দেখিয়েছেন। রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ

ভট্ট ভবদেব ছিলেন হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী। ভুবনেশ্বরে ইনি যে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন তার গায়ে এঁর উদ্দেশ্যে রচিত প্রশস্তিফলক রয়েছে। এই প্রশস্তির রচয়িতা কবি বাচস্পতি। রচনাটিকে প্রশস্তি না বলে খণ্ড কাব্য বলাই সঙ্গত। এই রচনার সামান্য উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

গাঢ়োপগূঢ় কমলাকুচকুম্ভ পত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু
হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

[মঙ্গলাচরণ শ্লোক।]

(কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁর কুচকুম্ভপত্রলেখার ছাপ যাতে লেগেছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হলে, অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয় এই বলে বাগ্‌দেবতা যাঁকে উপহাস করেছিলেন এমন হরি তোমাদের শ্রীর হেতু হন।)

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে
তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্তাস্মি ভট্ট ভবদেব কুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি
রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ॥

[সরস্বতী বন্দনা প্রসঙ্গে]

(হে বাগ্‌দেবি, বাল্যকালাবধি তুমি প্রত্যহ উপাসিত হয়েছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হোক, তুমি প্রসন্ন হও। ভট্ট ভবদেবের কুল প্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করবো, তুমি রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হও।)

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতি কবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।
আকল্পং শুচি সুরধামমূর্তিকীর্ত্তেরধ্যাস্তাং জঘনমিব সুবর্ণকাঞ্চী॥

[পুষ্পিকা শ্লোক]

(এঁর প্রিয় সুহৃদ দ্বিজাগ্রগণ্য শ্রীবাচস্পতি কবি কর্তৃক রচিত এই প্রশস্তি পবিত্র দেবমন্দির স্বরূপিণী কীর্ত্তির জঘন দেশে সুবর্ণ কাঞ্চার মত কল্পান্ত পর্যন্ত বিরাজিত থাক।)

প্রশস্তিমূলক অসংখ্য রচনা সেনরাজাদের আমলে পাওয়া যায়। এই রচনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যগুণমণ্ডিত। সেনরাজগণ তাঁদের সভায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের যোগ্যস্থান দিয়েছিলেন। তাই মনে হয় সেনরাজত্বের প্রশস্তিগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনা। অবশ্য সেনরাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দম্'।

এই কাব্য কালিদাসের মেঘদূতের মতই সর্বভারতীয় প্রখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভিন্ন কারণে গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সেন রাজত্বে কবি উমাপতি, কবি ধোয়ীও কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু জয়দেব যেমন করে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করে আছেন সত্যই তার তুলনা নেই। জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতভাষায় রচিত হলেও তার রসলাভে বাঙালী পাঠকের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। জয়দেবের সংস্কৃত পড়লে সাধু বাংলার রূপটা আমাদের অপরিচিতির রাজ্যে নিয়ে যায় না, সে সংস্কৃত অতি সহজেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাংলাভাষা সংস্কৃত-দুহিতা।

কবি জয়দেব ও তাঁর গীতগোবিন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা কালে প্রথমেই একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, জয়দেব ১২শ-১৩শ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিতে রাজচক্রবর্তীর মহিমায় বিরাজিত। কবির কাব্য নন্দনকাননের পারিজাত সৌরভ। কবি জয়দেবের বহুদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে সংস্কৃতভাষায় সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়েছে, আমরা প্রাথমিক যুগের সীমায় অভিনন্দের রামচরিত এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রামচরিত, অসংখ্য কবির বিচিত্র খণ্ড রচনা, শ্লোক, উদ্ভট শ্লোক পেয়েছি। এই সমুদয় রচনার মধ্যে ধীরে ধীরে বাঙালীর সৃজনশীল চেতনা রূপ লাভ করেছে' যেন এই চেতনার সার্থক রূপায়ণ জয়দেবের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার, জয়দেবের আগেই বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য প্রভাতের অরুণাভায় পরিমণ্ডিত হয়ে

আত্মপ্রকাশ করেছে, তবে তাকে বন্দনা জানাতে সমবেত-সামগীতি তখনও উদ্গীত হয়নি।

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রাম অজয়নদের মর্মগীতিতে উচ্ছ্বসিত, এই গ্রামেই জয়দেবের আবির্ভাব। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের (জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, শরণ, গোবর্ধন আচার্য) অন্যতম ছিলেন। কালবিচারে তিনিই সেই রত্নসমূহের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। তাঁর গীতগোবিন্দ কান্তকোমল পদের সুন্দর সার্থক রসসমৃদ্ধ রূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার এমন বাণীরূপ ভারতীয় সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে জয়দেবের আগে মাত্র কয়েকটি শ্লোক রচিত হয়েছে। নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাধিপতি বনমাল দেববর্মণের একটি লিপিতে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে উদ্ধৃত বাঙালী কবি রচিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে যেন গীতগোবিন্দের প্রস্তুতি পর্বের ইঙ্গিত মেলে। এখানে তিনটি শ্লোক দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া হলো:

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যু পবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনী-কৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

[কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় গ্রন্থে এই শ্লোকের রচয়িতার নাম নেই, সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্লোকটি শুভাঙ্কের নামে প্রচলিত হয়েছে।]

(অন্বয়:—'দ্বারে ওকে'? 'হরি' (অর্থান্তরে বানর)। 'উপবনে যাও, শাখামৃগ, এখানে কি?' 'প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ'। 'তাহলে আরও ভয়ের কথা, বানর কি কালো হয়।' 'মুগ্ধে, আমি মধুসূদন' (অর্থান্তরে মধুকর)। 'ফুলফোটা লতার কাছে যাও তবে।' এইরূপে প্রিয়া কর্তৃক নিরুত্তর লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।)

ময়াশ্লিষ্টো ধূর্ত্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্বাভিস্মৃতঃ।

ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্দ্ধনগিরে-

র্ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন নিচুল কুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ [অজ্ঞাতনামা]

[সখী, এখানে থাকতে পারে, ওখানে থাকতে পারে ভেবে আমি সারা রাত ধরে সেই ধূর্তকে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছি ; (নিশ্চয়ই সে) অন্য গোপীর কাছে অভিসার করেছে। কৃষ্ণকে আমি ভাণ্ডীর তলায় দেখিনি, গোবর্ধনগিরির তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কূলে নয়, বেতসকুঞ্জেও নয়।]

[শীঘ্রং গচ্ছত] ধেণুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িনীকুলে পুণরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশ গুপ্তহৃদয়ঃ কুর্ব্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবং কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ ॥

[সোন্নোক রচিত]

(অনু ঃ—'দোহা দুধের কলসী নিয়ে গোপীরা এখনি ঘরে যাও, বকনাগুলি দোহা হলে রাধা পরে যাবে'—এই ব্যপদেশে মনের কথা গোপন রেখে ব্রজ [অর্থাৎ বাথান] নির্জন করছেন যিনি, নন্দের পুত্ররূপে অবতীর্ণ সেই দেব কৃষ্ণ তোমাদের অমঙ্গল হরণ করুন।)

সহজেই চোখে পড়ে যে তৃতীয় শ্লোকটির সঙ্গে গীতগোবিন্দের প্রারম্ভিক শ্লোকের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে জয়দেব বাঙালীর রসচেতনার সুপরিণত স্তরেই তাঁর কাব্য রচনা করেন।

জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে। তবে তিনি যে সমসাময়িক ধারায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-আখ্যান থেকেই তাঁর কাব্যকে পরিপুষ্ট করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সামগ্রিক ভাবে এই কাব্য বিচার করলে দেখা যাবে যে, এ কাব্যের ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত এবং ভাব সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের মাটিতেই পরিবর্ধিত। এই কাব্য যেন প্রাচীন প্রবীণ সাহিত্যের সঙ্গে নবীন সাহিত্যের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে আমরা যে

গীতিউচ্ছ্বাসকে বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুরণিত হতে দেখি তার পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকিত রূপ গীতগোবিন্দের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়।

জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতভাষায় রচিত, কিন্তু এই কাব্যের প্রধান গৌরব অপভ্রংশের ধরনে গানগুলি। তাঁর কাব্যের ছন্দ ও ধ্বনিগুচ্ছ বহুলাংশে প্রাকৃত অপভ্রংশের অনুসরণ করেছে। এর ফলে কাব্যখানি আগামী দিনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে। অবশ্য এই প্রেরণার মূলমন্ত্র এই কাব্যের রস ও ভাব। কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রদীপ্ত চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্যেই কাব্য রচনা করেছেন এবং কাব্যের ভূমিকাতেই নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন :

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্তপদাবলীম্
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

(অনু :—যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করার ইচ্ছা থাকে, যদি তাঁর বিলাসকলা জানার কৌতূহল হয় তবে জয়দেবরচিত এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন।)

এর পরেই শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনায়, বসন্তবিলাসে কবি আত্মনিয়োগ করেছেন। আধুনিক রুচিতে অবশ্য এই কাব্যের কোন কোন স্থান পাঠের উপযোগী মনে না-ও হতে পারে, এই কাব্যে শৃঙ্গাররসের আতিশয্য লক্ষিত হতে পারে কিন্তু এই কাব্য গঠন-চমৎকারিত্বের দিক থেকে, রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার ভাববিভোরতার দিক থেকে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবকাব্যধারার গোমুখী উৎস। পরবর্তীকালে শ্রীরূপ গোস্বামীর ব্যাখ্যায় এই কাব্যের রস গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। বস্তুতঃ এই কাব্যে বাঙালীর নিজস্ব রসবোধ বহুল পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করেছে; তার ভাবময়তা, তার সৌকুমার্য, তার সর্বাতিশয়ী মাধুর্যবিমণ্ডন যে চেতনালোক নির্মাণ করে তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দ। এই জন্যই বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যরচনার শ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে আমরা

গীতগোবিন্দকে গণ্য করি। একাব্য যেন বাঙালীর মানস-লোকের একগুচ্ছ পারিজাত। এখানে জয়দেবের কবিকৃতির কিছু কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

বসন্ত ঋতুতে কন্দর্পদেব নরপতিরূপে বিরাজমান্। প্রস্ফুটিত নাগকেশর তাঁর স্বর্ণচ্ছত্র, ভৃঙ্গবেষ্টিত পাটলী-কুসুম তাঁর বিলাস তূণীর।

মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুম বিকাশে।
মিলিত শিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণ বিলাসে॥

প্রেমের দেবতা পুষ্পধনুর আবির্ভাবে বসন্ত প্রকৃতি কেবল বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়নি স্পর্শে ঘ্রাণে, আভাসে ইঙ্গিতে প্রেমিকজনের দর্পণ হয়ে উঠেছে।

মলয়-মারুত পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করছে লবঙ্গ-লতিকাকে—কি অপরূপ শোভার সৃষ্টি হয়েছে। ওদিকে নিকুঞ্জগৃহ ভ্রমরগুঞ্জন আর কোকিলের কুহুধ্বনিতে পরিপূরিত।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥

প্রণয়-পরিবেশ রচনায় এমন অসাধারণ ইঙ্গিত-দক্ষতা সত্যই বিরল।

নরনারীর মিলন-মেলায যে প্রণয়-অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, সেই চিত্রই আমরা জয়দেবের বসন্ত প্রকৃতির পত্রপুষ্প, ভ্রমরগুঞ্জনে অনুষ্ঠিত হতে দেখি।

কালিদাস প্রণয়ক্ষেত্রে চেতন অচেতনের ভেদরেখা রক্ষা করেননি, কবি জয়দেবের কাব্যে আমরা সেই পরিচয়ই নতুন করে একটু অভিনব রূপেই পাই।

এখানে বকুলতরু সারা অঙ্গে ফুটিয়েছে অজস্র কুসুম, (যেন কামনা কায়া ধরেছে) আর ভ্রমরকুল তাতে উপবেশন করে একান্ত আকুল করে তুলেছে।

অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহ নিরাকুলবকুলকলাপে

এ চিত্র কামনার কাতরতায় উন্মুখ কোন নায়িকার ওপর নায়কের অসহ উল্লাস-স্পর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কেবল কামনার উদ্দীপক প্রকৃতি-সজ্জা নয়, এ যেন তার চেয়েও অনেকখানি—প্রণয়ীজনের একেবারে মানস দোসর অথবা দর্পণ-বিম্ব হয়ে উঠেছে।

জয়দেব প্রণয়ীজনের উদ্দীপক পরিবেশ রচনা বা লীলাবিলাস বর্ণনার পর যতই পরিশুদ্ধ হরি বর্ণনার এক একটি পদ সংযোজন করুন না কেন, নিত্যকালের মানব-মানবীর প্রণয় পিপাসার একান্ত বাস্তব সত্য কাব্যই তিনি রচনা করেছেন। এবং এ রচনা পরবর্তী-কালের মানব-মুখী পদাবলী সাহিত্যের যথার্থ ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীরঘুনন্দনের একটি পদে অচেতন বস্তুর ওপর শ্রীমতী রাধার সূক্ষ্ম ঈর্ষার যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে তার আভাস আমরা জয়দেবেই পাই। যদিও জয়দেবে শ্রীমতী রাধা অতীত স্মৃতি রোমন্থনে ঐ চিত্রটি স্মরণ করেছেন মাত্র।

> সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশং
>
> মুরলী হইল বাশ কি পুণ্য করিয়া
>
> বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া। (শ্রীরঘুনন্দন)

কৃষ্ণবিহনে শ্রীমতীর প্রকৃতি-বিরূপতা ; আবার প্রণয় ভাবনায় কখনো বা উচ্চতর 'সেই আমি' ভাব (আমিই কৃষ্ণ), সবই জয়দেব থেকে পরবর্তীকালের চিন্তা-ঋণ।

জয়দেব প্রণয়-কলায় কতখানি বাস্তব সচেতন কবি ছিলেন এবং সেই বাস্তবতাকে কতদূর কাব্যশ্রীমণ্ডিত করতে পারতেন, তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীমতীর আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জে কাতর হয়ে পড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ মাধব। পাখির শব্দ কিংবা পত্র পতনের শব্দ হলেই চমকিত হয়ে ভাবছেন, 'ঐ বুঝি শ্রীমতী আসে'। অমনি ত্বরিতে শয্যা প্রস্তুত করেন, আর চকিত নয়নে তাকিয়ে থাকেন শ্রীমতীর আগমন পথের দিকে।

কি সুন্দর উদ্বেগ-আকুল প্রতীক্ষার চিত্র।

> পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
>
> রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥

ওদিকে সজ্জিত রয়েছেন শ্রীমতী। চরণে বেঁধেছেন নূপুর। কলহংসের ধ্বনি তুলে সে নূপুর চলার পথে সুরের ফুল ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু প্রণয় বিদ্যায় নিপুণা সখী শ্রীমতীকে বাধা দিয়ে বললেন,

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং বিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

সখি, তোমার চরণের ঐ মঞ্জীরটি ত্যাগ কর। ওটি অতীব মুখর; অনুক্ষণ শব্দিত হচ্ছে। ঐ শব্দ চপল রতিকেলির বিঘ্নকর। আঁধারে আচ্ছন্ন কুঞ্জগৃহ। নীল বসনখানি অঙ্গে জড়িয়ে অভিসার যাত্রা কর।

সখী রাধাকে বাধা দিলেন মুখর মঞ্জীরটি চলার পথে চরণে রাখতে। মুহূর্তে একটি বাস্তব সত্য প্রতিভাত হলো।

কুঞ্জগৃহে প্রতীক্ষাকাতর কৃষ্ণ চোখে মুখে উৎকণ্ঠার চিত্র এঁকে বসে আছেন, দূর থেকে মুখর নূপুরের শব্দ যখন তাঁর কানে গিয়ে বাজবে তখন তিনি সচেতন হয়ে যাবেন। তখন তিনি চেষ্টা করবেন একান্ত স্বাভাবিক হতে; মুছে ফেলবেন মুখের সেই প্রতীক্ষাকাতর ভাব। যেন কোন উৎকণ্ঠাই তাঁর নেই, এমনি অভিনয়ও তিনি করতে পারেন। তাহলে শ্রীমতী কি করে জানবেন তাঁর জন্য মাধবের কাতরতার কথা।

অতএব মঞ্জীর ত্যাগ কর। চুপি চুপি চরণ ফেলে সহসা কুঞ্জদ্বারে হাজির হলে তবেই তো কৃষ্ণের কাতরতার চিত্রটুকু চোখে পড়বে, আর তাতেই পাবে তোমার বিরহ দুঃখের পুরস্কার।

প্রণয়ের এই সূক্ষ্ম সুচারু ভাববিলাস একান্ত মানবগৃহেরই আচরণ-লীলা। জয়দেব মর্ত্যপ্রণয়ের এই অভিলষিত আচরণ-বিধির সার্থক শিল্পী।

সংস্কৃত কাব্যধারায় বাঙালীকবির দানের কথা আলোচনা করা আমাদের কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমরা বাঙালী কবির সংস্কৃত কাব্য রচনার সূত্রকে অবলম্বন করে একটি বিশিষ্ট সত্যে উপনীত হতে চাই। তা হলো বাংলাদেশের মাটিতে আগামী দিনে কাব্যধারার যে তরঙ্গ হিল্লোলিত হবে তার রূপ ও ভাবগত উপাদান আগে থেকে

সমীকৃত হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, বাঙালীর কাব্য চেতনা *সংস্কৃত কাব্য অনুশীলনের ফলেই সুসম্পূর্ণতা লাভ করে* আগামী দিনের দায়িত্ব বরণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে বাংলা কাব্যধারায় মঙ্গলকাব্যের, বৈষ্ণবকাব্যের, শাক্তপদাবলীর, শিবায়ণ কাব্যের যে স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়েছে তার প্রারম্ভিক ভূমিকা রচনা করেছে বাঙালীর রচিত অসংখ্য সংস্কৃত টুকরো কবিতা, নানা কাব্যগ্রন্থ। এই সাহিত্য-সাধনা থেকে আরও একটি সত্য প্রতীয়মান হবে যে বাঙালী তার পরিচিত জীবনপরিবেশ থেকে তার সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করেছে, এবং সর্বত্রই তার শান্ত মধুর কোমল সুন্দর দৃষ্টির আলোক প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত রকম বিষয়কেই এক আশ্চর্য মাধুর্য দান করেছে। এর প্রমাণ অবশ্য বাঙালী কবি রচিত কয়েকটি অপভ্রংশ কবিতার সাহায্যে দেওয়া যায়। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হল :

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আ-এ
চেউ চলাএ॥

[সেই আমার কান্ত (এখন) দূর দিগন্তে ; প্রাবৃষ্ আসে, চিত্ত চঞ্চল হয়।]

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে পরবর্তী কালের 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' অথবা 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া' এর পার্থক্য কোথায় ?

ওগ্গর ভত্তা
রম্ভতা পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।

দিজ্জই কন্তা
খাই পুণবন্তা ॥

[ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, জুতসই দুধ, মৌইলি মাছ, নালতে গাছ—কান্তা দেয়, পুণ্যবান খায়।]

ভোজন রসিক বাঙালীর যে পরিচয় মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে শুরু করে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তারই পূর্ব স্বরই তো উদ্ধৃতিটির মধ্যে বিধৃত।

বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী
উবা অহীণা মুই এক্ক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঙ্গ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥

[পুত্র বালক, ছয় মুণ্ডধারী (সে ছয় মুখ দিয়ে খায়) উপায়-হীনা আমি একলা নারী, ভিখারী (স্বামী) অহর্নিশ বিষ খায়, আমার কি গতি হবে।]

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায়, শিবায়ণ কাব্যে, বাংলাদেশের নানা ব্রতকথায় এমন কি আধুনিক কালের কবির কাব্যেও নিঃস্ব সংসারের কর্ত্রীর এমন হতাশার সুর শুনতে পাওয়া যায়।

নানাদিকের নানা আয়োজনে বাংলা কাব্য ধারার নিজস্ব সুরটি সৃষ্ট হয়েছে। অষ্ট্রিকজাতি ও দ্রাবিড় জাতি কাল প্রবাহে আর্যসভ্যতা সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করেছে, আর্যজাতিও এই দেশের জলবায়ুর গুণে পৃথক হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে শকহুনদল পাঠান মোঘলের, আর্য-অনার্যের একদেহী রূপ, অখণ্ড বাঙালী জাতি। এই জাতির বিশিষ্ট পরিচয়কে বক্ষে ধারণ করেই এর কাব্যসম্পদও সমৃদ্ধ হয়েছে ; কালের প্রসন্ন দৃষ্টিতে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলে উঠেছে। তার ভাণ্ডার প্রত্যহই সোনার তরী-বাহিত সোনার ধানে প্রভূত পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

প্রথম উদয়

পূর্ব অধ্যায়ে বাঙালীর রসচেতনা ও কাব্যসংস্কারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এবার আমাদের দৃষ্টি পড়বে বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশের ধারায়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে বাংলাভাষা আত্মপ্রকাশ করে। এই নবীন ভাষার প্রথম সাহিত্য সম্পদ 'চর্যাপদ'। এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে আলোচনার আগে আমাদের একটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। তা হলো, আধুনিক-পূব যুগে কবি সম্প্রদায় কোন না কোন ধর্ম বিশ্বাসকে আশ্রয় কবে কাব্য রচনা করেছেন। যে উদার উন্মুক্ত স্বনির্ভর ব্যাক্তিত্ব, যে একান্ত মানবিক বোধ এবং যুক্তি বুদ্ধি সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতার মূলমন্ত্র, আধুনিক-পূর্ব যুগে তার স্পষ্ট নিদর্শন মিলবে না। আধুনিক-পূর্ব যুগেব কবিগণ সাধারণ ভাবেই ধর্মীয় ভাব, ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তাঁদের শিল্প-বোধকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। সুতরাং 'চর্যাপদের' আলোচনাকালে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই গ্রন্থের পরিচাযিকা স্বরূপ একটি বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের বোধ থাকা দবকাব। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে আর্যীকরণের কালে বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসাব লাভ করে। তার আগে বাংলাদেশে ব্রতধর্মী আচার কেন্দ্রিক অতি প্রাকৃত বিশ্বাসধর্মী ধর্মধারণা প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে ধমধারণা বোধ উপলব্ধি গ্রাহ্য নয়, তা ভয় ও ভক্তির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এর ধারা বাঙলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও অটুট আছে। বাঙলাদেশে আর্যধারায় বয়ে আসা বিভিন্ন ধর্মদর্শন এবং লোকায়ত ধর্মাচার শেষ পর্যন্ত মিলেমিশে গেছে, আর এই মিশ্রণের একটি বিশেষ মাধ্যম হয়েছে তন্ত্রাচার। বাংলাদেশের ধর্মধারা আমাদের আলোচ্য নয়, আমরা দেখবো আধুনিক-পূর্ব কাব্যকবিতা

কিভাবে ধর্মভাব ও ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে আপন পরিচয় প্রকটিত করেছে। 'চর্যাপদ' যে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের পক্ষছায়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে, একথা সর্বজন বিদিত। এখন আমাদের দেখা দরকার চর্যার ধর্মদর্শনের স্বরূপ কি।

খ্রীষ্টপূর্ব ছ'হাজার বছর আগে ভগবান তথাগত যে ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালপ্রবাহে তার রূপ ও প্রকৃতি অভাবনীয় পরিবর্তন লাভ করেছে। বুদ্ধদেব চারটি 'আর্যসত্য', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' (কার্যকারণ তত্ত্ব) এবং পঞ্চস্কন্দ—মূলতঃ এই তিনটি মৌলিকতত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে মানবদুঃখের হেতুবাদ নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর মতে জীবসত্তা পঞ্চধর্ম দ্বারা গঠিত, ধর্ম বলতে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমবায়কে বোঝায়। অন্যভাবে একে 'স্কন্দ' বলা যায়। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্দ দেহকে গঠন করেছে। এই পঞ্চস্কন্দাত্মক দেহ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা দ্বাদশ নিদানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। এই দ্বাদশটি নিদান পরস্পর সম্পর্কক্রমে স্থাপিত। এই বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, জীবের নিয়তি হলো, অনন্ত জন্ম পরিক্রমা ও অনন্ত দুঃখ। এই দুঃখ তত্ত্বই বুদ্ধদেবের মৌলিকতত্ত্ব। তাঁর মতে চারটি আর্যসত্য যথাক্রমে, দুঃখ (দুঃখের অস্তিত্ব), সমুদয় (দুঃখের কারণ), নিরোধ (দুঃখ নিরোধ সম্ভব) এবং মার্গ (দুঃখ নিরোধের পন্থা)। বুদ্ধদেবের জীবন সাধনা দুঃখের অস্তিত্ব, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ এবং তার প্রচারই সত্য হয়ে উঠেছে এবং এই দুঃখবাদ সমুত্থিত অমৃতবাণীই তিনি বিশ্বজগতকে দান করেছেন। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পরেই তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের ব্যাখ্যা শুরু হল, মতান্তর শুরু হলো। এই মতান্তরের অনিবার্য ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মে হীনযান, মহাযান নামে দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় উদ্ভূত হলো। হীনযান মুখ্যতঃ বাহ্যবস্তুর বস্তুসত্তায় বিশ্বাসী, আত্মনির্বাণকেই এঁরা চরম বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তিতে এই সংসারের মধ্যে থেকেই মুক্তি লাভ সম্ভবপর। এঁদের কাছে নির্বাণের অর্থ হচ্ছে চৈতন্যের বিনাশসাধন।

পক্ষান্তরে মহাযান মত কেবলমাত্র নিজের নির্বাণ লাভের প্রয়াসে নিবদ্ধ নয়। ভগবান বুদ্ধ যেমন সমগ্র বিশ্বজগতের দুঃখপীড়িত মানবের কল্যাণ চিন্তা করেছিলেন, মহাযানীগণও তেমনি নিজের চিন্তার পরিবর্তে জীবনিচয়ের নির্বাণের কথাই মুখ্য এবং একমাত্র চিন্তা বলে মনে করতেন। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মহাযানের দুটি শাখা সৃষ্ট হলো—(১) মাধ্যমিক (২) যোগাচার। মাধ্যমিকগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একটি মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করেন। মাধ্যমিক-বাদের প্রবক্তা নাগার্জুনের মতানুযায়ী বস্তু বা চৈতন্যের মধ্যে কোনটাই পারমার্থিক অস্তিত্বযুক্ত নয়। কিন্তু অসঙ্গের এবং বসুবন্ধুর নেতৃত্বে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ গড়ে ওঠে। এই যোগাচারবাদের মধ্যে সাধনগত দিকটি গুরুত্বলাভ করেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে মাধ্যমিক ও যোগাচারবাদ প্রসারিত হয় এবং অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময়ে বাংলাদেশে পাল-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা অবশ্য ধর্মমতগতদিক থেকে উদারপন্থী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মমত বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতও পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মমত যে সে সময়ে বিশেষ অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সময় থেকে মাধ্যমিক যোগাচারবাদের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবে একদিকে যেমন অদ্বৈতবাদ অখণ্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করলো অন্যদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মাচার হৃত গৌরব ফিরে পেলো। এর ফলশ্রুতি হিসেবেই যোগাচারবাদের মধ্যে, মহাযানের মধ্যে হিন্দুতন্ত্র, কৌলধর্ম ও শৈব নাথ ধর্ম অনুপ্রবিষ্ট হলো। কালের অমোঘ নির্দেশে ভগবান তথাগতের ধর্মে তন্ত্রমন্ত্রের, রহস্যাচারের প্রভাব বিস্তৃত হল আর আবির্ভূত হল মন্ত্রযান অর্থাৎ কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। সহজযানের রূপ ও প্রকৃতি আমরা বিশেষভাবে চর্যাপদের মধ্যে লক্ষ্য
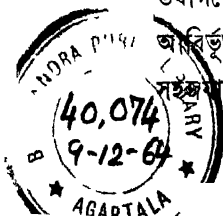
40,074
9-12-64
AGARTALA
Rs 10·00

করি। এই যানের চরম ও পরম লক্ষ্য হল অদ্বয় মহাসুখ উপলব্ধি করা। সহজানন্দ লাভ করলে সাধক চিত্তের তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং এই অবস্থাই মহাসুখ। বাংলাদেশে মন্ত্রমান এইভাবে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে বিকশিত হয়ে ওঠে। বাংলায় সহজযান মতবাদের প্রচারক তিব্বতের সিদ্ধাচার্যগণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বাংলাদেশের মধ্যে অভাবনীয় বিস্তৃতি লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। এই সহজযানের মর্মার্থকেই আমরা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া, আউলবাউল, সুফিমারফতি প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে পুষ্পিত হতে দেখি। প্রাণের যে সহজ সরল বিশ্বাস, আত্মার যে সর্বব্যাপ্ত আনন্দ বাঙালীর ভাবপ্রবণতার অনুকূল তার উৎসভূমি হিসেবে আমাদের সহজযানেরই দ্বারস্থ হতে হয়।

'চর্যাপদ' বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ, কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাংলাদেশে এই গ্রন্থের কোন সংবাদই জানা ছিল না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর তৃতীয়বারের নেপাল সফরের কালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অনেক পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকগণ এই পুস্তকের আবির্ভাবে যেন চমকে উঠলেন; বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং বহুমূল্য রত্ন যেন তাঁদের সামনে উপস্থিত হলো। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলায় লিখিত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করেন, পরে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানির ধর্ম-পরিচয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চর্যাপদগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত করেন।

বস্তুতঃ শাস্ত্রীমহাশয় যেন বঙ্গসাহিত্যকে কালসমুদ্রের গর্ভে স্থিত রত্নভাণ্ডার উপহার দেন।

পরবর্তী কালে চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে এবং অন্যান্য পার্শ্ববিচারের সাহায্যে গ্রন্থখানির একটি প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ গঠিত হয়। হাজার বছরের বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যে গ্রন্থখানির নাম 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' বলে উল্লিখিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বিচার করে দেখান যে, এ গ্রন্থের নাম 'আশ্চর্য চর্যাচয়', কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে মূল পুঁথির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। গ্রন্থের নাম সম্পর্কে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। চর্যাপদ বলেই আমরা এর উল্লেখ করব, কারণ আধুনিক পাঠক সমাজে এই নামেই গ্রন্থখানি পরিচিত। বিভিন্ন বিচার-বিবেচনার সাহায্যে, চর্যার রচয়িতাদের কালনির্ণয়ের সাহায্যে মেনে নেওয়া যায় যে চযাপদগুলি মূলতঃ খ্রীষ্টীয় দশম—দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। গ্রন্থখানর মধ্যে ৫১টি পদ রয়েছে, অবশ্য একটি পদের সন্ধান মাত্র কিছুদিন আগে স্থির হয়েছে।

চর্যাসমূহের রচয়িতাগণ বাংলাদেশে এবং তিব্বতে সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। সাধারণতঃ বজ্রযান ও সহজযানের আচার্যরাই সিদ্ধাচার্য আখ্যা লাভ করেছেন। এঁরা 'চৌরাশি সিদ্ধা'র অন্তর্গত। চর্যাপদের মোট পঞ্চাশটি চযাব রচয়িতা হলেন ২৪ জন আচার্য—লুই, কুক্কুরীপা, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন (চর্যায় এই বানানের নানা রূপ প্রচলিত), কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, ঢেণ্টনপা, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রীপাদ, লাড়ীডোম্বী। বাংলায় লাড়ীডোম্বীর কোন পদ পাওয়া যায় নি। চর্যাপদের মধ্যে লুইপার দুটি, ভুসুকুপার আটটি, কাহ্নপার তেরটি, সরহপার চারটি এবং শান্তি ও শবরপা প্রত্যেকের দুটি করে চর্যা সংগৃহীত হয়েছে, অন্যান্য পদকারদের একটি করে পদ পাওয়া গেছে। চর্যাপদ রচয়িতারা সকলেই বাঙালী ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সে সব তর্কবিতর্কের

মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি আমরা লুইপাদ, ভুসুকু, শবরীপাদকে বাঙালী বলেই গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে উড়িষ্যা ও বিহারের যোগসূত্র ভাষাগত দিক থেকে, ধ্যান-ধারণার দিক থেকে অত্যন্ত নিবিড় ছিল। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই সূত্রে একটি কথা বলা যেতে পারে, চর্যার রচয়িতাদের কেউ কেউ মগধ বা উড়িষ্যার অধিবাসী হিসাবে পরিচিত হওয়ায় এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন উড়িয়া ভাষার, প্রাচীন মাগধী ভাষার নিদর্শন বলে দাবী করা হয়। অবশ্য ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিক এ গ্রন্থকে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বলেই সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

চর্যাপদ গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গীণ আলোচনার আগে আমাদের একটি সত্যকে জানতে হবে ; এই পদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন প্রক্রিয়ার রহস্যময় পরিচয় বহন করে। এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিতে তন্ত্রসাধনার গভীরমূল অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং বৌদ্ধ সহজিয়াদের দোঁহায় এবং বাংলাগানে (চর্যাপদে) একটি বিশিষ্ট সাধন প্রণালীর নিগূঢ় রূপই স্থান লাভ করেছে। তান্ত্রিক সাধকদের মত এই বৌদ্ধ সহজিয়ারাও দেহকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলে মনে করতেন। তান্ত্রিকরা যেমন অন্নময় আত্মা থেকে আনন্দময় আত্মার জগতে উন্নীত হন, বৌদ্ধ সহজিয়ারাও সেইভাবে শেষ পর্যন্ত সহজানন্দ লাভে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সহজানন্দের জন্য যে ধর্মাচরণ তারই রহস্যময় পরিচয় চর্যাপদগুলির মধ্যে রয়েছে। তবে চর্যাপদগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে নানা ধরনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীকের সাহায্যে সাধনতত্ত্বের রহস্যময়তা রূপ লাভ করেছে। এই রীতি বাংলা কাব্যে একটি বিরাট শাখাতে বিচিত্র-ভাবে যুগে যুগে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা চর্যাগীতিপদাবলীর ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করব না, কেন না এর কাব্যমূল্য নির্ধারণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গীতিপদাবলী কেমন করে তুষার মৌলি পর্বতের মত

অসংখ্য নদীজাল সৃষ্টি করে বাংলাকাব্যকে স্নিগ্ধ সরস প্রাণোচ্ছল করে তুলেছে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের আলোচনার অঙ্গীভূত। কাব্যগত দিক থেকে চর্যাগীতিপদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে পরিস্ফুট সমাজজীবনের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কোন শিল্প সৃষ্টিই মানবজীবন বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনের রূপ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, ধর্মনির্ভর হয়ে অথবা ব্যক্তিনির্ভর হয়ে শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে। চর্যাগীতিপদাবলী সম্পর্কেও একথা পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। গ্রন্থখানির রচনাকাল ধরা হয় খ্রীষ্টীয় নবম দ্বাদশ শতক এবং এই গ্রন্থের যে প্রাচীনতম পুঁথি আমাদের হাতে এসেছে তাকে কেন্দ্র করে বিচার করলে এর রচনাকাল ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছে-পিঠে কোনও এক সময়। অর্থাৎ এই গ্রন্থের উপাদানগত দিকগুলি বুঝতে হলে পালরাজত্বের অন্তিমপর্ব এবং সেন-বর্মন রাজত্বের পর্বটি জানা দরকার। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। শঙ্কর, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি বেশ শিথিল হয়ে যায়। তাছাড়া তন্ত্রসাধনার ধারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজের উচ্চকোটির শাস্ত্রমুখী ধর্মাচরণের কথা বাদ দিলে এই সময়ে লোকসমাজে সহজিয়া ধর্মসাধনার বৃত্তিটি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। সেনরাজত্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা দীর্ঘকাল দোর্দণ্ড প্রতাপে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে নি। পালরাজাদের উদারপন্থী ধর্মমতের পরিবর্তে সেন-বর্মন রাজত্বের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বাংলাদেশের ধর্মীয় জীবন স্পষ্টতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। আপামর জনসমাজ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাধিকার লাভ করেনি, এই ধর্মরীতি সমাজের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত ছিল; দ্বিতীয়তঃ বর্ণাশ্রম বহির্ভূত বাঙালী এক বেদবিরোধী, আচারবিরোধী লোকায়ত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল। চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে এই ভাবপরিমণ্ডলটি স্পষ্টতঃই বিধৃত হয়েছে। সমাজের ধর্মধারণার একটি ব্যাপক রূপ চর্যাপদের মধ্যে লাভ করা যায়। পরবর্তীকালে

এই রূপটি অন্তঃসলিলা নদীর মত শীর্ণবিশীর্ণ ধারায় বাংলাদেশের সমাজজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সেন-বর্মন রাজত্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে, এই প্রক্রিয়া রাজানুকূল্যও লাভ করেছে ; ফলে লোকায়ত ধর্মাচরণ যবনিকার অন্তরালে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। সেইজন্যই বাংলা কাব্যধারায় চর্যাগীতিপদাবলীর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ লাভ করা যায় নাথ সাহিত্য, সহজিয়া সাহিত্য, আউল বাউলের গান।

চর্যাগীতিপদাবলীর রচয়িতাদের নামগুলি বিচার করলে এ ধরনের অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ডোম্বী, নটী, রজকী প্রভৃতি কুল থেকে রচয়িতাগণ এসেছেন। অবশ্য এর বিপক্ষেও যুক্তি আছে। তবে চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে এমন কিছু সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, আচরণ, জীবনযাত্রার উল্লেখ রয়েছে যা থেকে মনে হতে পারে যে চর্যাপদের কবিদের সঙ্গে এই প্রথাসমূহের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। অবশ্য কবিরা এই প্রথাসমূহের উল্লেখ করেছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কারণে। সহজিয়া কবিগণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই নানা সামাজিক চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। এই সহজিয়া সাধকদের নির্বাণ ত্রিস্বভাব যুক্ত—শূণ্য, করুণা ও মহাসুখ। কবিগণ কখনও পৃথকভাবে কখনও যৌথভাবে শূণ্য, করুণা ও মহাসুখকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা প্রায়ই বিভিন্ন প্রতীক ও বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার স্পন্দনে প্রবুদ্ধ হয়ে অদ্বয় মহাসুখ তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। এই মহাসুখকে চর্যাকারগণ ডোম্বী, শবরী, হরিণী, নৈরামণি প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কখনও শিকার চিত্রের সাহায্যে, কখনও নৌকা বাওয়ার সংকেতের সাহায্যে, আবার কখনও গার্হস্থ্য পরিবেশের সাহায্যে সাধককবিগণ অধ্যাত্মবোধকে পরিস্ফুট করেছেন। এই চিত্রগুলির উৎস বিচার করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে কবিদের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল। সুতরাং একটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে চর্যাগীতিকবিতার মধ্যে বাঙালী জনজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে তৎকালীন বাঙালীজীবনের পরিচয় কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার নিদর্শন এখানে দেওয়া হল। বিরুআর 'এক সে শুণ্ডিণী দুই ঘরে সান্ধঅ। চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ (এক সে শুঁণ্ডিণী দুইঘরে সাঁধায় চিয়ান বাকড়ে বারুণী বাঁধে॥) পদটিতে সেকালে কেমন করে মদ চোলাই করা হত, শুঁড়ির দোকান কি ভাবে চেনা যেতো, কি ভাবে পসার জমতো, খরিদ্দার কি উপায়ে ভাঁটিখানায় প্রবেশ করতো তার একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভুসুকু আবার দুটি চর্যায় ব্যাধ জীবনের সুন্দর ছবি এঁকেছেন :

আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী॥

(আপনার মাংসে হরিণ (নিজের) বৈরী। ক্ষণমাত্র ছাড়ে না ভুসুকু শিকারী। হরিণ তৃণ ছোঁয় না জল খায় না, হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না।) এবং এই অবস্থার কারণ 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস' (চৌদিকে বেড়া হাঁক পড়ছে)। গহন অরণ্যকে ঘিরে ফেলে হাঁকডাক করে শিকার তাড়িয়ে তাকে বধ করার এই চিত্র বাঙালী ব্যাধের বাস্তব জীবনের ওপর নির্ভর করেই রচিত। ভুসুকুর 'জই তুহ্মো ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা' (যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাবে পাঁচজনকে মেরো) পদটির মধ্যেও শিকারেরই অন্য একটি চিত্র পরিস্ফুট।

চাটিল বৃক্ষচ্ছেদন করে পাটাজুড়ে টানা দিয়ে সাঁকো নির্মাণের একটি চিত্র এঁকেছেন। নদী নালা আর কাদায় ভরা বাংলা দেশের একটি রূপ যেন এই সাঁকো নির্মাণের পশ্চাতে আত্মগোপন করে রয়েছে :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই
পারগামি-লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ
আদঅ দিঢ়ি নিবাণে কোড়িঅ ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী
নিয়ড্‌ডী বোহি দূর মা জাহী ॥
জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী ॥

(ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে, দুইধারে কাদা, মাঝখানে থই নাই। ধর্মের জন্য চাটিল সাঁকো গড়েছে, পারগামী লোক নির্ভয়ে তরে। মোহতরু ফাড়া হয়েছে, পাটি জোড়া হয়েছে, অদ্বয় জ্ঞানের টানা নির্বাণের জন্য দেওয়া হয়েছে। সাঁকোয় চড়লে ডানদিকে বাঁদিকে যেয়ো না, বোধি নিকটেই, দূরে যেয়ো না। হে লোক, যদি তোমরা পারগামী হবে তাহলে সাঁইশ্রেষ্ঠ চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর)। এই চর্যাগীতিটির মধ্যে একটি চিত্ররূপ সার্থক সুন্দর ভাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং এই চিত্রের বর্ণ এবং রূপ ভাবের অন্তর্নিহিত প্রাণকে সহজস্বচ্ছ উপায়ে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, বৃত্তিমূলক পরিচয় এবং কবির আধ্যাত্মিকতা যেন যুগপৎ পদটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। সমস্তপদটি এক বিচিত্র ধ্বনিমাধুর্যে পূর্ণ হয়ে পদটির ভাবচেতনাকে গভীরতা ও বিস্তৃতি দিয়েছে। কাহ্নের 'ভবনির্বাণে পড়হ-মাদলা' পদটিতে বিবাহযাত্রার একটি কৌতুকোদ্দীপক চিত্র আছে। বিবাহার্থী ঢাক-ঢোল কাঁসি-দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিয়ে করতে চলেছে, বিবাহে বর প্রচুর যৌতুকও লাভ করেছে। কাহ্ন অন্য দুটি চর্যায় ডোমদের মধ্যে প্রচলিত সাঙ্গার (বিধবা বিবাহের) কথা উল্লেখ করেছেন। কাহ্ন অবশ্য ডোমের জাতি বৃত্তি তাঁত তৈরি, চাঙ্গারি বোনা ও নৌকা বাওয়ার উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে কাপালিকের অন্যতম ব্যবসা নটবৃত্তির কথাও বলেছেন। তৎকালীন নানা বর্ণের মানুষের বৃত্তি-

নিচয়ের নানা পরিচয় চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। শুঁড়ি বা ডোম সম্প্রদায়ের পরেই দেখা যায় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের কথা। বাড়ীর পাশেই কাপাসভুঁই, সেখান থেকে তুলো সংগ্রহ করে তাঁতি তাঁত বোনে, সে অবশ্য মাদুরও বোনে। কিন্তু এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজকর্ম করে দিন কাটাতো, এদের দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। 'হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেষী' (হাঁড়িতে ভাত নেই নিত্য দিনই উপোষ করতে হয়)—এই অবস্থায় এদের জীবনের বোঝা পুঞ্জীভূত হয়। এই ভাগ্য-তাড়িত দরিদ্র সম্প্রদায় নগরের বাইবে কুণ্ঠিত ভাবে বাস করে, উচ্চবর্ণ তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। এই হতদরিদ্র মানুষগুলির মধ্যেও উৎসব আনন্দ অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসবের উপকরণ অবশ্য বেশী কিছু নয়—চোলাই করা মদ আর উদ্দাম নৃত্যগীত।

চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে আমরা তৎকালীন ধনীসম্প্রদায়ের পরিচয়ও পাই। তারা রাজার তাম্রশাসন দলিলের বলে ভূমি ভোগ করতো, তাদের ঘরে সোনারূপোর ছড়াছড়ি। ধনীরা দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে স্বগৃহে পূজো করতো। এমন এক ধনীর ঘরে আগুন লাগার একটি জীবন্ত দৃশ্য এঁকেছেন 'ধাম' তাঁর চর্যাপদে :

দাটই হরিহর বাম্ভ ভড়ারা
দাটা হই ণবগুণ শাসন-পড়া ॥

(হরিহর ব্রহ্মা ঠাকুর পুড়ছে, নগুণ শাসন পাট্টা পুড়ে গেল।)

ভসুকু একটি পদে জলদস্যুরা হানা দিয়ে কিভাবে ধনীগৃহস্থকে সর্বস্বান্ত বরে দিতো তার উল্লেখ করেছেন :

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥
....
দহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসআ ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পিণ থাকিউ

(বজ্রনাওয়ারা পদ্মাখালে বাওয়া হল, নির্দয় দস্যু দেশ লুঠ করলো। ...পাঁচ পাটন দগ্ধ, ইন্দ্রের বিষয় নষ্ট। জানি না চিত্ত আমার কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট। সোনারূপা আমার কিছুই থাকলো না।)

সমাজের শ্রেণীগত এবং বৃত্তিগত পরিচয় যেমন চর্যাগুলির মধ্যে রূপ লাভ করেছে, তেমনি নদীমাতৃক বাংলাদেশের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য বিমণ্ডিত ছবিও সেগুলিতে বিধৃত হয়েছে। নদীতে নদীতে অমল-ধবল পাল উড়িয়ে কেড়ুআল, খুণ্টি, কাচ্ছি, মাঙ্গ, পিট, ডুখোল প্রভৃতি নানা অবয়বের নৌকা চলেছে; নদী কখনও গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে, কখনও তার গতি মৃদুমন্দ। অনুমান করতে পারা যায়, সেই সব নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে জনবসতি, নদীর সঙ্গে তাদেরও জীবনের ধারা সন্নিবিষ্ট।

এসব ভিন্ন চর্যাগুলিতে আরও অনেক টুকরো টুকরো চিত্র আছে, সেগুলো থেকেও প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলায় হাতি পোষা প্রচলিত ছিল। মাহুতের হাতি চালানোর কলাকৌশল, পাগলা হাতির উদ্দামতা কাহ্নের চযায় উল্লিখিত হয়েছে। গৃহস্থ ঘরের গঠনটা কেমন ছিল তাও জানা যায়—শ্বশুর (সসুরা) শাশুড়ী (শাসু) ননদ (ননন্দ) ইত্যাদির সঙ্গে বধূকে ঘর-সংসার করতে হতো, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে শ্যালিকাও স্থান লাভ করতো। শ্যালিকার অবস্থিতিতে যে অবকাশ বিনোদন আনন্দের হতো, একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।

সমৃদ্ধশালী পরিবারের মেয়েরা বাজন নূপুর (ঘণ্টা নেউর) কাঁকন (কাঙ্কাণ) মুক্তাহার (মুক্তিহার) এবং কুণ্ডল পরতো, আরশিতে মুখ দেখতো, বিছানাপাতা খাটে শুয়ে কর্পূব সংযোগে বিলাসী পান (তাঁবোলা) খেতো।

তখনকার দিনে হাঁড়ী, পিটা (দুধ দুইবার পাত্র) ঘড়ি (ঘড়া) ঘড়ুলী (গাড়ু) প্রভৃতি গার্হস্থ্য বাসনপত্রের প্রচলন ছিল। কুঠার, টাঙ্গি, খনতা (নখলি) প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হতো।

সেকালে যে গীতবাদ্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল তা জানা যায়

তৎকালীন দিনে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলির উল্লেখ থেকে এবং চর্যার প্রথমে উল্লিখিত রাগরাগিণীর নাম থেকে। সেকালে পটহ (পড়হ), মাদল, করণ্ড, কসাল, ডমরু, ডমরুলি (ছোট ডমরু), বীণা (একতারা), বাঁশি (বংশা) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং পটমঞ্জরী, গউড়া (গৌড়), মালসী (মালবশ্রী ?), মল্লারী গুঞ্জরী, কহ্নু গুঞ্জরী, রামক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, বরাড়ী, শবরী, অক, দেবকী, ধনসী, বঙ্গাল প্রভৃতি রাগের নাম উল্লিখিত আছে।

তখনকার দিনে ধার্মিক লোক আগম পুঁথি পড়তো, কোশাকুশি নিয়ে পূজো করতো এবং মালা জপ করতো :

জো মণ গোএর আলা জালা
আগম পোথী ঠঠা মালা।

(যে মনোগোচর তার জন্যই আড়ম্বর—আগম পুঁথি, ঘণ্টা, জপমালা।)

সে সময়ে বিদ্বানব্যক্তির বিশেষ সম্মান ছিল। এইভাবে তৎকালীন সমাজ ধনী-দরিদ্র, ধার্মিক, শিক্ষিত, দস্যুভয়, চোরধবার জন্য দারোগা (দুষাধী), থানা বা কাছাবি (উআরি) নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যগীতের, নটকলার এমন কি শূন্যে স্থিতি বাজি খেলার, দাবা খেলাব আয়োজনও তখন ছিল। চর্যাপদকারগণ তাঁদেব আধ্যাত্মিক জীবনের সুরকে বাস্তব জীবনের বিচিত্র উপাদানের সাহায্যে রূপায়িত করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনের উপাদান নিচয় একদিকে কবিদের রসবিমণ্ডিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির এবং অন্যদিকে তৎকালীন সমাজজীবনের এক অখণ্ড পরিচয়ের সাক্ষ্যবাহী।

কাব্যবিচারে চর্যাগীতিপদাবলী সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে মধুব ভাব-রসকে আশ্রয় কবেই পদগুলি রচিত। কবিদের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সহজানন্দ, মহাসুখ লাভ। এই সহজানন্দের, মহাসুখের উপায় হিসেবে নারীকে গ্রহণ করা হয়েছে :

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ
বোহি কি লব্ভই এণ-বি দেহেঁ। (কাহ্ন)

[হে তরুণি, তোমার নিরন্তর প্রেম ব্যতীত এই দেহে কি বোধি লাভ করা যায় ?]

ভাবপ্রবণ বাঙালীকবি কাব্যধারার সূত্রপাতেই এক অমিত সম্ভাবনাময়, অনিন্দ্য সুন্দর, অপরিম্লান রসসমৃদ্ধ কাব্যভাব-রূপ নির্মাণ করলেন। প্রেমরস সমুজ্জ্বল গীতিকবিতায় বাংলাদেশ জগৎসভায় আপন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তার উৎস সন্ধানে আমরা হাজির হতে পারি চর্যাপদকারদের সান্নিধ্যে। চর্যাগীতি পদাবলীর কবি প্রেমজীবনের আনন্দবেদনার স্রোতে অবগাহিত হয়ে আপন অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং সেই পরিপূর্ণতার সাগরকে মন্থিত করেই চর্যাগীতি পদাবলীর কাব্যআত্মা সৃষ্টি করেছেন। চর্যাকারগণ তাঁদের প্রিয়তমাকে চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী প্রভৃতির দেহে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই প্রিয়তমাকে পাওয়ার জন্যই ব্যাকুল হয়ে নগর ত্যাগ করেছেন, প্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত হয়েছেন, প্রাপ্তির পরিপূর্ণতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য এই প্রাপ্তি মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক, তবু আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই আধ্যাত্মিকতার অন্তরালেই বাঙালীর কাব্য সাধনার মর্মবাণীটি গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে চর্যাকারগণের প্রেমচেতনার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করা যাক্ ঃ

উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥

[উচু উচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে, শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, গলায় তার গুঞ্জার মালা।]

এই শবরীর জন্য শবর উন্মত্ত, পাগল; শবরীও আপন মনে এ বন সে বনে ঘুরে বেড়ায়; শেষপর্যন্ত উভয়ের প্রেমে প্রগাঢ়তা জন্মালো এবং

তিঅ ধাতু খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥

[ত্রিধাতু খাট পড়লো, শবর মহাসুখে শয্যা পাতলো। শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাত্রি অতিবাহিত করলো।]

অবশ্য এই পদে দেহমিলনের মাধ্যমে ধর্মসাধনার কথাই ব্যাখ্যাত হয়েছে, প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের উন্মত্ততাকে একান্তভাবেই ধর্ম-সাধনার উপায় হিসেবে বিচার করতে হবে। তবু এর মধ্যে প্রাণোচ্ছল যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্বরূপটি পরিস্ফুট। অন্য একটি চর্যায় দেখা যায়ঃ

তিঅড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী
কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী॥
জোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

[তিউড়ি অর্থাৎ মেখলা চেপে যোগিনী আলিঙ্গন দে, পদ্ম বজ্রের ঘাঁটে বিকাল করবো। যোগিনী তুই বিনা ক্ষণকালও বাঁচিনা। তোর মুখ-চুম্বন করে কমলরস পান করি।]

এই পদের মধ্যে দেহনিষ্ঠ প্রেমের একটি সুতীব্র আর্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এই আর্তিরই একটি সূচীমুখ তীক্ষ্ণরূপ কাহ্নের একটি চর্যার মধ্যে পাওয়া যায়, সেখানে কবি প্রেমিকার জন্য সর্বত্যাগীঃ

নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ॥

... ...

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর্ না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া॥
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥

[নগরের বাইরে ডোমনী তোর কুঁড়ে ঘর, নেড়া বাঁমুনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস্। ওলো ডোমনী, আমি তোর সঙ্গে সাঙ্গা করবো, (আমি) কাহ্ন কাপালিক যোগী লাঙ্গা।···ডোমনী তাঁত আর চাঙারি বিক্রি করে, তোর জন্য নটসজ্জা ছাড়া হয়েছে। তুইলো ডোমনী আমি কাপালিক, তোর জন্য আমি হাড়ের মালা ছাড়লাম।] কাহ্ন

ডোমনীর জন্য সর্বত্যাগ করেছেন; প্রেমের ঐকান্তিকতা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও অবরোধ, সকল প্রকার সংস্কার ও প্রথা অবলুপ্ত করে দিয়ে প্রেমিকচিত্তে প্রাপ্তির অনিবার্যতা সুতীব্র করে তুলেছে। দাম্পত্য জীবনের একটি স্পষ্ট রূপ যে এখানে প্রেমের ভিত্তি-ভূমির কাজ করেছে তা সহজেই চোখে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ আমরা ডঃ শ্রীসুকুমার সেনের বিশ্লেষণ স্মরণ করতে পারি: চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের মিষ্টিক (রাগাত্মিক) পদাবলীর এক বিষয়ে বেশ পার্থক্য আছে। চর্যাগীতির বাহ্য অর্থের বিষয় সমসাময়িক জীবন হইতে নেওয়া। সে জীবন অত্যন্ত সাধারণ লোকের···

চর্যাগীতি অর্ধসাঙ্কেতিক, রাগাত্মিক পদাবলী পুরাপুরি সাঙ্কেতিক। যেমন, চর্যাগীতিতে নারী-সঙ্গিনী গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু তাহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে সাধারণ নরনারীর দাম্পত্য বা গার্হস্থ্য সম্পর্কই প্রকটিত; এবং তাহা সময়ে সময়ে এতটা বাস্তবিক যে গ্রাম্য বলিয়া কুণ্ঠা জাগায়। 'কাপালিক যোগী প্রেমিক ডোমনীর প্রেমাসক্ত হইয়া কাপালিক বৃত্তি হেলায় ত্যাগ করিতেছে।'

[বাং। সা। ই। পূর্বার্ধ। পৃ ৭০]

বাস্তবিক পক্ষে দাম্পত্য জীবনের পটভূমিতে চর্যাকারগণ প্রেমের রূপটি দেখেছেন, এবং তাঁদের সাধন-প্রক্রিয়ার রহস্যময় অভিব্যক্তি হিসেবেই তাঁরা প্রেমের রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চর্যার মধ্যে আবেগ মথিত উষ্ণ হৃদয়ের, উদ্দাম প্রেমের প্রথম পদধ্বনি শোনা গেল। বাংলার কাব্যধারায় দেহজ কামনা-বাসনা নিয়েই যে প্রেমের সৌন্দর্য শতদল পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছে তার অরুণাভকান্তি (তা গ্রাম্য হলেও) আমরা চর্যার মধ্যেই প্রথম লাভ করেছি। সম্প্রতিকালে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ আবিষ্কৃত বিনয়শ্রী রচিত একটি চর্যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা চর্যায় রূপায়িত প্রেমচেতনার আলোচনা শেষ করবো:

খমণা খমণিএঁ বালা বালী
খমণএঁ খমণ্ডলু ভাগ অফালী॥

বিরহী খমণি অস্থই পমাণে
খুধী পইসই ঘোর মসাণেঁ ॥
ভণই বিণয়শ্রী খমণি দিঠি
খমণা চ্ছাড়ি ন খণ বি সংতুঠী ॥

[ক্ষপণক ক্ষপণকী দুজনে প্রেমিক প্রেমিকা (বালক বালিকা)। ক্ষপণক লাফ দিয়ে খ-মণ্ডল থেকে সরে পড়লো (অথবা কমণ্ডলু ভেঙে ফেললো)। এমন প্রমাণে (বা অপমাণে) ক্ষপণকী বিরহিণী হলো এবং ঘোর মশানে প্রবেশ করলো। বিনয়শ্রী বলে, ক্ষপণকীকে দেখা গেছে, সে ক্ষপণককে ছেড়ে কালমাত্রও সন্তুষ্ট নয়।]

প্রেমের একটি আর্তি এই চর্যাটির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। প্রেম-জীবনের রূপের বহু বৈচিত্র্য চর্যাগীতি পদাবলীতে নেই সত্য, কিন্তু নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, মিলনে আনন্দ, বিরহে জ্বালাবোধ প্রভৃতি অতি সত্য ধারণাগুলি অনলঙ্কৃত ভাষায় চর্যায় স্থান পেয়েছে। এই অস্ফুট অঙ্কুরই কালের পরিচর্যায় ও যত্নে মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, চর্যায় ধর্মসাধনা মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও মধুর ভাবকে আশ্রয় করেই তা বহুক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছে। ঐ মধুর ভাবগুলিকে অবলম্বন করতে গিয়ে চর্যা-পদকারেরা কবিজনোচিত সৌন্দর্যসৃষ্টির দৃষ্টান্তও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পর্বতবাসিনী শবরীর অঙ্গসজ্জা বর্ণনায় বাস্তব দৃষ্টি ও শিল্পবোধ দু-এরই পরিমিত সমন্বয় ঘটেছে।

আবার ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব ছেড়ে কাব্যের সহজ মুক্ত আকাশে পদ-কারেরা কখনো কখনো অবসর বিনোদন করেছেন। মধুরভাবের পরিবেশটিকেও তাঁরা সৌন্দর্যের সুষমায় ভরে তুলেছেন।

অপুব্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।

[অপূর্ব বসন্ত উদিত। আকাশে ফলফুলের বিকাশ হয়েছে শবর।]

অন্য একটি চর্যায় এমনি সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

যুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥

[চমৎকার, এখন কাপাস ফুল ফুটল। তৃতীয় বাটিকার পাশের জ্যোৎস্না বাটিকা তৈরী হলে দূর হল অন্ধকার। ওরে আকাশ ফুল ফোটাল।]

এমনি ছোট ছোট কাব্যের কুসুম ফুটিয়ে চর্যাকারেরা ধর্মালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁদের সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন।

চর্যার আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। পরবর্তী কালের কাব্যভাবনা ও সাধন-চিন্তার ক্ষেত্রে এর প্রভাব নানা ভাবে লক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

১০নং চর্যায় নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের উৎপ্রেক্ষার দ্বারা সহজাবস্থা সিদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালের মনসামঙ্গল, শিবসংকীর্তন কাব্যে শিবের সঙ্গে নৌকা-বাহিকা কোঁচ তরুণীরূপে দেবীর প্রেমলালার পূর্বাভাস এর মধ্যেই সূচিত হয়েছে।

৩ নং চর্যায় শুঁড়িগৃহে মদ বিক্রির বর্ণনা করা হয়েছে, ধর্মদাসের ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে এমনি চিত্রই দেখা যায়।

১ নং চর্যায়, কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল ॥

বৃক্ষের সঙ্গে দেহের উৎপ্রেক্ষা পরবর্তীযুগের বৈষ্ণব সাধকদের কাব্যেও দেখা যায়,

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ভাই সংসারে আইনু
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষরূপ হৈনু।

৩২ নং চর্যায় অধ্যাত্ম সাধনার বাহ্য আড়ম্বর ও কৃচ্ছ্র অভ্যাসের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

অনুরূপ সত্য-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে,

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্যে ভক্তি চিত্তে করয়ে উদয় ॥

কাব্যের কায়া গঠনের দিক থেকেও চর্যাগীতি পদাবলী বাংলা কাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাছন্দের উৎস-সন্ধানে নিঃসন্দেহে চর্যাগীতিপদাবলীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে হয়। সাধারণ বিচারে চর্যাগীতিগুলি তিন-রকম ছন্দে লিখিত এবং এই তিন ধরনের ছন্দরীতিই অবহট্‌ঠ থেকে এসেছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চর্যাগীতিতে অবহট্‌ঠ ছন্দের হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রায় সুদৃঢ়তা অনুপস্থিত; চর্যাগীতিতে অক্ষরগুলি মাত্রা সমতার দিকেই সমধিক প্রবণতা দেখিয়েছে। এই লক্ষণের সাহায্যে বিচার করলে বলতেই হবে যে চর্যাগীতির ছন্দ একদিকে অবহট্‌ঠ ছন্দ এবং অন্যদিকে বিশুদ্ধ বাংলা ছন্দ—এই দুয়ের মাঝামাঝি। অধিকাংশ চর্যাগীতি ষোলমাত্রার পাদাকুলক পজ্ঝটিকা-পদ্ধড়ী চউপই ছন্দে লিখিত এবং প্রায় প্রত্যেক চর্যাগীতিতেই এমন দু-একটি ছত্র আছে যেখানে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের রূপ স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে ছত্রের শেষ অর্ধে এই রূপ সমধিক প্রকটিত। যেমনঃ

দিঢ় করিঅ মহা। সুহ পরিমাণ
লূই ভণই গুরু। পুচ্ছিঅ জাণ।

কিম্বা, সসুরা নিদ গেল। বহুড়ী জাগই
কানেট চোরে নিল। কা গই মাগই।

উপরের উদাহরণ দুটিতে ১৬ মাত্রার ছন্দের রীতি অনুসৃত হয়েছে। চর্যাগীতিতে ১৬ মাত্রার ছন্দের পরেই ব্যবহৃত হয়েছে ২৬ মাত্রার ছন্দ। ২৬ মাত্রার এই ছন্দ দোঁহা থেকে উৎপন্ন। যেমন,

মহারস পানে মাতেল রে। তিহু অন সত্রল উএখী
পঞ্চ বিষয়ের নায়ক রে। বিপখ কোবী ন দেখী।

ত্রিপদী ছন্দের ঢংটিও চর্যার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে,

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ॥
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ
লীলে পার করেই॥

অর্থাৎ চর্যাগীতিপদাবলীতে যে ছন্দসাধনার সূত্রপাত, তাই ই পরবর্তী কালের বাংলা ছন্দের কায়াধারণের পথকে নির্দেশিত করেছে।

চর্যাগীতিগুলির অলঙ্কার বক্রোক্তি প্রভৃতির ধারাও বাংলাকাব্যের প্রসাধন-কলায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র উপাদানকে রূপক উৎপ্রেক্ষা হিসেবে প্রয়োগ করার সুনিপুণ চাতুর্য চর্যাপদকারগণ দেখিয়েছেন। তত্ত্বকথাকে সহজ করে তুলতেই তাঁরা এই পথ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের গৃহীত পথ তত্ত্বের সীমায় আবদ্ধ মাত্র না থেকে কাব্যকলার সমৃদ্ধিসাধন করেছে। তাঁদের ব্যবহৃত চিত্রকল্প কাব্যবিচারে বিশিষ্টতার দাবা করতে পাবে। চর্যাগীতিগুলির মধ্যে কোথাও চিত্রকল্প, কোথাও সৌন্দর্যানুভূতি এবং কোথাও বা লোক জীবনের প্রতিচ্ছায়া আত্মবিস্তার করে গীতিগুলির সাহিত্যমূল্য প্রবর্ধিত করেছে। একথা বলা বাহুল্য যে, চর্যাগীতিকারগণ সচেতন ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, ধর্মসাধনার তত্ত্বরূপকেই তাঁরা গীতি-গুলিব মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু প্রেমের প্রাবল্যে, গঠনের পাবিপাট্যে এবং বাস্তবজীবনবসের প্রগাঢ়তায় চর্যাগীতিগুলি বিমণ্ডিত হওয়ায় এগুলি থেকে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যরস নির্ঝরিত হয়। বাংলা কাব্যধারায় এই সাহিত্যরসের মূল্য বড় কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা চর্যাগীতিপদাবলীর মধ্যে বাংলাদেশ ও বাঙালী যেন সংহত, সুসম্পূর্ণ এবং সর্বব্যাপক এক রূপের প্রথম পল্লব-সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ এ কাব্যেব পটভূমি; ব্রাহ্মণ, ডোম, তাঁতি প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাঙালী এ কাব্যের উপাদান; দেহনিষ্ঠ প্রেমসুখাবেশ এ কাব্যের বিশিষ্ট রস এবং সহজানন্দ লাভের পথনির্ধারণ এ কাব্যের ভাব-আত্মা। সর্বত্রই বাঙালীর নিজস্বতাবে বিচ্ছুরিত করেছে চর্যাপদাবলী। বাংলাকাব্য ধারায় এ কাব্য গোমুখী-উৎস। সংস্কৃত জননীর অঙ্কে লালিত, প্রাকৃত এবং অবহট্‌ঠের প্রযত্নে পরিবর্ধিত শিশু বঙ্গভাষা এই কাব্যেই আপন স্বাধীন গতিচ্ছন্দের পরিচয় রেখেছে।

তিমির বিদারী অভ্যুদয়

চর্যাগীতি পদাবলী রচিত হওয়ার পরেই বাংলা কাব্যধারা বেশ একটু সময়ের জন্যই থমকে দাঁড়িয়েছে। খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাগীতি পদাবলী রচিত। তারপরের যে রচনা আমাদের হাতে এসেছে তা হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং এ গ্রন্থের রচনা কাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। অর্থাৎ মাঝখানের প্রায় দুশো বছর বাংলা সাহিত্যের তালিকায় কোন সংযোজনা হয়নি বললেও চলে, কিংবা তা হলেও মহাকাল তাকে আপন অন্ধকার অন্তরে লুকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মহাকালের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এই কালগণ্ডীতে রচিত দু চারটি গান ও ছড়া পাওয়া যাচ্ছে অথচ বড় গোছের বাংলা গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সুতরাং বিষয়টিকে অন্যদিক থেকে দেখা দরকার। এই সময়ে বড়গোছের বাংলা গ্রন্থ যদি লেখা হতো তাহলে পরবর্তী কালের কোন না কোন রচনায় তার উল্লেখ অন্ততঃ থাকতো। এক্ষেত্রে অনুমান করতেই হয় যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের ফলস্বরূপ বাংলা-দেশের সাহিত্য-স্রষ্টারা রাজার আশ্রয়ছায়া হারিয়ে হয় অন্য কোথাও পালিয়ে গেলেন, না হয় ক্ষমতাহীন হয়ে আত্মগোপন করলেন। বিগত যুগের সাহিত্য পরিবেশের সঙ্গে এই যুগের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

চর্যাগীতি পদাবলী খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে লেখা। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের রাজবৃত্ত বারবার বিঘূর্ণিত হয়েছে। পাল রাজত্বের অন্তিম পর্বে বাংলাদেশে বর্মণ ও সেন রাজত্বের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং সেন রাজত্ব খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের আঘাতে অবলুপ্ত হয়ে যায়। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হলো।

এতদিন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প পরিপুষ্ট হয়েছে। তুর্কী শাসনের কালে বিজিত বাঙালী জাতি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে, যেন কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছে। পাল রাজত্বের বা সেন রাজত্বের আনুকূল্যে বাঙালী যে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত করেছিল তার মূলে যেন তুর্কী আক্রমণের কুঠারাঘাত পড়লো। তাই খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক কাল-পর্যায়ের মধ্যযুগ পরিকল্পিত হলেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সূচিত হয় নি। অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষভাগে শমসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতান রাজ্য সংস্থাপিত করার ফলেই দেশ সুসংস্থিত হলো এবং এদেশে জ্ঞানচর্চার ও সাহিত্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হলো। আলোচনার ধারায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি পর্ব কোন ফসল ফলাতে পারে নি, একে সেইজন্য তামস-যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এই তামস যুগে কোন সাহিত্য সম্ভবতঃ সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু এই যুগ যে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য অতন্দ্র সাধনায় ব্রতী ছিল তা অনুমান করা যায়, কেননা পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে অকস্মাৎ ভাব ও রূপ, বিষয় ও রস—সমস্ত দিক দিয়েই অজস্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অজস্রতা আকস্মিক নয়, বরঞ্চ একে তুর্কী আক্রমণের ফল বলা চলতে পারে। বস্তুতঃ তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যেন জোয়ার এলো, আর এই জোয়ারের টানেই আরও কিছুকাল পরে চৈতন্য-পর্বে বাংলা কাব্যধারা উত্তাল তরঙ্গমালায় উচ্ছল হয়ে নীল আকাশের সীমা স্পর্শ করলো। পর্বত-গুহা-বিনির্গত যে নদী চর্যাগীতি পদাবলীর মধ্যে ছোট ছোট স্রোতের সুষমা ভঙ্গিমায় ভরে ছিল, তুর্কী আক্রমণের ফলেই যেন তা সহসা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণবন্যার অজস্রতায় উর্মি-মুখর হয়ে উঠলো। এই পরিণতিকে আকস্মিক বলতে পারা যায় না। কেন এমন হলো তার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পাল ও সেন রাজবংশের শাসনকালে প্রায় চারশো

(অষ্টম-দ্বাদশ খ্রীঃ শতক) বছর ধরে বঙ্গসংস্কৃতি নানা বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয় লাভ করছিল। পাল রাজত্বের উদার নিরপেক্ষ ধর্মমত অবশ্য সেন রাজত্বে ব্যাঘাত লাভ করেছে; সেন রাজত্বে এই দেশের প্রায় সর্বস্তরে উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবের ফল ফলেছে লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের হাতে বাংলা ভাষা পরিচর্যিত হলেও সেন রাজত্বে তা যেন নিদ্রিত হয়ে পড়েছে। বৌদ্ধগুম্ফাতেই তা যেন সীমিত হয়ে আত্মগোপন করেছে। অনুমান করা যেতে পারে যে নিরক্ষর নিম্নবর্ণের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আর বাংলাদেশের উত্তর সীমায় বৌদ্ধ-কেন্দ্রে এক-আধটি চর্যা লিখিত হয়েছে এবং সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা হয়েছে। সেন রাজত্বে রাজানুকূল্যে সাহিত্যের বাহন হিসেবে বাংলাভাষা কোন স্থানই পায় নি। অবশ্য বাঙালীর ভাবসাধনা এই সময়ে যে একটি বিশিষ্টতা লাভ করে, তার প্রমাণ জয়দেব। জয়দেব একদিকে বাংলাদেশে বৈষ্ণবতার স্রোতকে প্রাণশক্তির পূর্ণতা দিয়েছেন, অন্যদিকে বাঙালীর রসচেতনার একটি বিশিষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে চর্যাগীতি পদাবলীর ধারাতেই 'গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কেননা, বাংলা কাব্যধারায় গীতগোবিন্দম্ গ্রন্থখানির দান অসামান্য। জয়দেব তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিষয় উপস্থাপিত করে এবং গীতিরসের মধ্য দিয়ে তা পরিবেশন করে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা কাব্যধারাকে সহায়তা করেছেন। জয়দেবের কৃষ্ণ, শাস্ত্র-স্বীকৃত গিরি গোবর্ধনধারী কংসারি কৃষ্ণ নন, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নন; তিনি পীতাম্বর, বংশীধারী, ব্রজ-বিলাসী, রাধাকান্ত, তিনি প্রেমময়। বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে জয়দেব ছড়িয়ে দিলেন মধুর রসের গীতিসুধা। বাঙালীর ভাব-মানস যেন আপন স্বরূপকে, আবেগপ্রবণ গীতিধর্মিতাকে জয়দেবের সৃষ্টি-দর্পণে স্পষ্টভাবে দেখে নিল। অন্যদিকে বাংলা কাব্যের অঙ্গসজ্জায় জয়দেব পরোক্ষ প্রভাব বিস্তৃত করলেন।

তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত বাংলা কাব্যধারার পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা প্রধানতঃ এবং মুখ্যতঃ চর্যাগীতিপদাবলীর উল্লেখ করবো এবং পরোক্ষতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দম্‌-এর কথা স্মরণ করবো। এর পরেই বাংলাসাহিত্যের অন্ধকার যুগ। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করে যখন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেব নিত্য নব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল ঠিক সেই সময় তাতার-তুর্কী খোরসানের মরুপ্রান্তর নিবাসী ইসলামধর্মাবলম্বী একদল অশ্বারোহী অতর্কিতে, বিদ্যুদ্‌গতিতে বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দেশের কিছুটা অংশ অধিকার করে বসলো। ধীর সমীরে তরঙ্গিত বাঙালী কবিচেতনার বংশীধ্বনি মুহূর্তের মধ্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। হতচকিত বিহ্বল বাঙালী আত্মরক্ষার তাগিদে আপন অন্তরের অন্ধকারেই যেন নিমজ্জিত হল। শুরু হলো আত্মসাধনার সংগুপ্ত প্রক্রিয়া। এই সাধনার ঐকান্তিকতায় প্রতিকূল কাল অবশেষে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করে বাঙালীর সাহিত্য-সাধনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক গতিপথ দান করলো। এই গতিপথের পরিচয় জানার জন্য আমাদের তৎকালীন সমাজধারাকে অনুসরণ করতে হবে।

ঐতিহাসিকদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালী সমাজে এক সংহতি এলো। তুর্কী আক্রমণের আগে বাংলাদেশের সামাজিক রূপ অনেক পরিমাণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, বলা যেতে পারে বাঙালিত্বের বনেদ তখন সৃজ্যমান অবস্থায় ছিল। একটি সম্পূর্ণ সুসংহত স্বতন্ত্র বাঙালী জাত তৈরির জন্যে তুর্কী আক্রমণের মত প্রবল আঘাতের প্রয়োজন ছিল, ঐতিহাসিক বিচারে এ সত্যও পরিস্ফুট হয়েছে। তুর্কী আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় রাজা লক্ষ্মণ সেন বহু রাজপুরুষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিসহ পূর্ববঙ্গে চলে যান; অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন; উত্তরবঙ্গ থেকে অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে কামতা কামরূপ অঞ্চলে যাত্রা করেন সত্য, কিন্তু এই সূত্রেই বাঙালীর সংস্কৃতি একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করে। অবশ্য তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে

সঙ্গেই বিহার ও পশ্চিম বাংলায় চলেছিল ধ্বংসের চণ্ডলীলা। ধ্বংসের এই রক্তক্ষয়ী রূপ থেমেছে শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজ্যলাভে (খ্রীঃ ১৩৪২-১৩৫৭)। তিনি বাংলাদেশে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে ১২০৫-১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চরম এক বিভীষিকার প্রেতনৃত্য চলেছিল, একথা ইতিহাস আমাদের জানায়। এই প্রেতঘোর শঙ্কাকম্পিত ছায়াময় পরিবেশে বাঙালী ধীরে ধীরে নিজেকে সংহত করে নিয়েছে। তাই অনুকূল অবস্থা লাভ করা মাত্রই বাঙালী আপন সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় বিলুপ্ত ধারায় জোয়ারের বেগ আনতে পেরেছিল। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যধারার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে তুর্কী আক্রমণের ফলে প্রধানতঃ বাংলাদেশে যে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল তার স্বরূপ জানা দরকার। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এই আক্রমণের ফলে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যোগাযোগ নিকটতর হলো, বিজিত হিন্দুসমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হলো এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপিত হলো। অবশ্য শেষেরটি ঘটেছে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর থেকে। এই সময় থেকেই বিজেতা মুসলমান বাঙালী হয়ে উঠলেন, তারা তাঁদের বিদেশীভাব যেন বিস্মৃত হলেন।

বাংলাদেশের এই সমাজ-সংহতির ফলে বাংলাসাহিত্য অভিনব এক ঐশ্বর্যসম্ভারে স্ফীত হয়ে উঠলো। এই ঐশ্বর্যভাণ্ডারে একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লোকায়ত ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যায়িকাগুলি সংযুক্ত হলো, অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ভাণ্ডার থেকে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, নানা পৌরাণিক আখ্যান অনুবাদের মধ্য দিয়ে সমাহৃত হলো। এরই অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ বাংলাকাব্যধারায় যেন ত্রিবেণী সংগমের সৃষ্টি হলো, লোকায়ত স্রোতে বইলো মঙ্গলকাব্য ধারা এবং পরে লোকগাথা গীতিকা, সংস্কৃত সাহিত্যের আনুকূল্যে লাভ হলো অনুবাদ সাহিত্য এবং তার পূর্বঐতিহ্যগত ধারায় এলো অসংখ্য, অজস্র

স্তবকিত পুষ্পের মত গীতিকবিতা। কাব্যের দেহে, আখ্যান, ধর্মের বলিষ্ঠতা এবং গীতিময়তার লাবণ্য যুগপৎ সংযোজিত হলো।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে আধুনিক-পূর্ব বঙ্গসাহিত্য ধর্মের ছায়াতলে রচিত, ধর্মের সুরসংযোগে এই সাহিত্য আপন পরিচয় তুলে ধরেছে। তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে চারটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল—(১) প্রাচীন ঐতিহ্য সূত্রে আগত বৈদিক এবং গ্রাম-দেবতা পূজা (২) মহাযান বৌদ্ধমতের স্থানীয় বিশিষ্ট একটি রূপ (৩) শৈবমত সংমিশ্রিত যোগী মতবাদ (৪) বিষ্ণু-শিব-চণ্ডীর উপাসনাকারী পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য মতবাদ। কিন্তু মুসলমান অধিকারে দু-তিনশো বছরের মধ্যেই এই চারটি ধারা মিলেমিশে প্রধান দুটি ধারায় পরিণত হলো—শাস্ত্র-লব্ধ পৌরাণিক মতবাদ এবং দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যসূত্রে আগত অ-পৌরাণিক মতবাদ। এই মিশ্রণের ফলে দেবতাদের মধ্যেকার পার্থক্যও বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। এই জন্যই বাংলাকাব্যে একই কৃষ্ণের দেহে আমরা পূতনা-বিনাশী, গোবর্ধনধারী কংসারি, মহাভারত-নাটক-সূত্রধারের পৌরাণিক রূপ দেখি এবং গোপী-কেলিকার, দুর্বিনীত গোপাল রূপও দেখি। শিবের মধ্যে যোগীশ্রেষ্ঠ সতীপতি উমাধর রূপও যেমন প্রকটিত; ভাববিলাসী, ধুস্তর-গঞ্জিকাসেবী, নীচ পরনারীলোভে হীনকমরত রূপ সমান পরিমাণেই পরিস্ফুট। চণ্ডীর মধ্যে চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, দনুজদলনা পরিচয় যেমন আছে, বনপশু পালিকা, মুখরা শিবপত্নী পরিচয়ও তেমনি আছে। ধর্মের এই বিমিশ্র উপাদান মধ্যযুগীয় বঙ্গকাব্যধারার বিশিষ্ট পরিচয় এবং এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই আমরা বাঙালীর ভাব-মানসের স্বরূপ দেখতে পাই। আবার তত্ত্বগত দিক থেকে ধর্মের পর্যালোচনা কালেও ধর্মভাব-চেতনার একটি দ্বিধাবিভক্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়; একদিকে রয়েছে, মন্ত্রতন্ত্রের আচার অনুষ্ঠানের যান্ত্রিক অনুবৃত্তি, অন্যদিকে সহজ সরল জীবনের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত ধর্মভাবনা। শেষের ধারাতেই মধ্যযুগের বাঙালীর ভাব চেতনার অমৃত-স্বরূপ চৈতন্যদেবের রাগানুগা ভক্তিধর্মের নীলাম্বুরাশি-সমতুল্য রূপ পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে আধুনিক-পূর্ব বাংলা কাব্যধারার পরিচয় লাভ কালে আমাদের এই বিরাট দেশকাল-ধারার কথা প্রতিনিয়ত মনে রাখতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আগে বাংলা কাব্যধারায় যদি বড় রকমের কোন রচনা থাকতো তাহলে তার স্মৃতির রেশ পরবর্তীকালে পাওয়া যেতো, এ অনুমান যুক্তিহীন নয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কবি জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে তিনজন প্রাচীন কবির নাম করেছেন—কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ এবং চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে স্থির হয়েছে যে মধ্যস্তরের বাংলাভাষার প্রাচীন রূপটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যতটা অবিকৃত আছে তা অন্য কোন বাংলাকাব্যে নেই। বস্তুতঃ চর্যাগীতিপদাবলীর পরেই বাংলাভাষার প্রাচীন নিদর্শন এই গ্রন্থে বহুল পরিমাণে লাভ করা যায়। এই বিচারে কাব্যখানির রচনা কাল চতুর্দশ শতক বলা চলে। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এই গ্রন্থের রচনাকাল ও রচয়িতা সম্পর্কে পণ্ডিতদেব মধ্যে বিতর্ক বিবাদ এখনও পূর্ণ মীমাংসা লাভ করেনি। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি আবিষ্কারের পর বাংলাসাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন জেগেছিল; সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ যেন একে অপরের মত খণ্ডন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই তর্ক-বিতর্কের স্মৃতি এখনও অনেকের মনেই অনুজ্জ্বল নয়। বিচারের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ এখনও জিজ্ঞাসা-চিহ্নের গণ্ডীতে বন্দী। কালের আনুকূল্যে সে বিচার সমাধা হোক, আমরা সে জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। বাংলা কাব্যের ধারায় এই গ্রন্থের কাব্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারলেই আমাদের প্রয়োজন মিটবে।

মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে চণ্ডীদাসের নাম ও তাঁর পদাবলী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। অবশ্য এই পদাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে, পদাবলীর কিছু পদ উচ্চ কবি প্রতিভার পরিচায়ক, আবার কিছু পদ অত্যন্ত নিম্ন মানের। এই সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত

হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাসের নাম। অর্থাৎ প্রশ্ন জাগলো পদাবলীকার চণ্ডীদাস একজনই কি না, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের লেখকের নাম। এই প্রশ্নের গ্রন্থি যতটুকু মিটেছে তারই আলোকে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করবো এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস বলে অন্য একজন চণ্ডীদাসকে মেনে নেবো।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হয়। এই পুঁথিখানি তিনিই আবিষ্কার করেন। বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে পুঁথিখানি পাওয়া যায়। পুঁথির গোড়ার দিক থেকে এবং শেষের দিক থেকে পাতা পাওয়া যায় নি, ফলে এর লিপিকাল বা নাম জানা সম্ভব হয়নি। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভই এ গ্রন্থের নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।' এখন এ গ্রন্থের নাম জানা গেছে; তৎকালে গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য বাংলাকাব্য ধারায় এই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থখানিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মথুরাগমন, মথুরা থেকে ক্ষণিকের জন্য প্রত্যাবর্তন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন এবং তারপরই কংসবধের জন্য কৃষ্ণের পুনরায় মথুরাগমন ও রাধার বিলাপ রয়েছে। রাধার বিলাপের পরই পুঁথি খণ্ডিত। অবশ্য প্রারম্ভের কয়েকখানি পাতাও নেই। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে বলা চলতে পারে যে, গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনে শেষ হয়েছিল। তবে অন্যদিক থেকেও বলা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস অলঙ্কার শাস্ত্রের নীতি-নিয়ম বড় একটা মেনে চলেন নি। মাঝে মাঝেই তিনি রুচিবোধ এবং শোভনতার সীমা এমনভাবেই লঙ্ঘন করেছেন যাতে মনে হয়েছে—এই বুঝি রসাভাস ঘটলো। এ দেখে জোর করে বলা চলে না, গ্রন্থখানি বিরহেই সমাপ্ত নয়। এ কাব্যের বিষয় এবং ভাব সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কবি

নানাদিক থেকেই দুঃসাহসিক, এ ক্ষেত্রেও যদি তাঁর অভিনবত্ব থাকে তা হলে তা অসঙ্গত হবে না।

কাব্যখানির কাহিনী-উপাদান বিপুল এবং বিচিত্র। গ্রন্থখানি তেরটি খণ্ডে বিভক্ত—জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ। 'রাধাবিরহের' সঙ্গে 'খণ্ড' নাম না থাকায় কেউ কেউ অনুমান করেন যে অংশটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়; সেই সঙ্গে তাঁরা দেখান যে এই অংশের বর্ণনা, রচনারীতি এবং রস অভিনব। এ অনুমানও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় নি। কাব্যের জন্মখণ্ডে দেবতাদের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার হরণের জন্য রাধা-কৃষ্ণের জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণরূপে বিষ্ণু বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্মেছে এবং নন্দালয়ে বর্ধিত হয়েছে। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তাম্বূলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ কামাচার-আমন্ত্রণসূচক তাম্বূল দিয়ে বড়াইকে রাধার কাছে দূতীরূপে পাঠিয়েছে। বলা যেতে পারে, এই-ই কৃষ্ণের পূর্বরাগ। কিন্তু স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার জন্য রাধা চন্দ্রাবলী, কৃষ্ণের দূতীকে অপমান করে কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দানখণ্ডে রাধাকে লাভ করার জন্য কৃষ্ণ ও বড়াই চক্রান্ত করেছে, দানী সেজে কৃষ্ণ রাধার দুধ দই নষ্ট করেছে এবং জোর করে তাকে সম্ভোগ করেছে। নৌকাখণ্ডে কাণ্ডারী বেশে কৃষ্ণ গোপীদের যমুনা পার করে দিয়েছে, কিন্তু রাধাকে পার করার সময়ে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে জলবিহার করেছে। ভারখণ্ডে ভারবাহী সেজে কৃষ্ণ রাধার দুধ দইএর পসরা বহন করেছে। ছত্রখণ্ডে রৌদ্র নিবারণের জন্য কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছাতা ধরেছে এবং এর জন্য রাধা কৃষ্ণকে 'রতিদানের' আশ্বাস দিয়েছে। বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বনবিহার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ মিলন সাধিত হয়েছে। এই খণ্ডে বস্তুতঃ রাসলীলাই রূপায়িত হয়েছে। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালিয়দমন, গোপীদের সঙ্গে জলবিহার এবং

গোপীদের বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ আছে। বাণখণ্ডে রাধার হার চুরি করার জন্য যশোদার কাছে রাধা কৃষ্ণের নামে নালিশ করেছে। বাণখণ্ডে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করেছে। তাতে রাধা মূর্ছিত হয়েছে এবং কৃষ্ণ অনুতপ্ত হয়ে সর্ব-প্রকার শাসন মেনে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ রাধার মূর্ছাভঙ্গ করেছে এবং রাধাকৃষ্ণ মিলন সাধিত হয়েছে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধা হয়েছে উৎকণ্ঠিতা। বড়াই র উপদেশে বংশী চুরি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের অনুনয়ে বংশী প্রত্যর্পণ করেছে। রাধাবিরহে রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন এবং রাধার শ্রান্তি ও নিদ্রা এবং নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রাব কথা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের কাহিনীর উৎস-সন্ধানে দেখা যায় যে, ভাগবতে হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার কথা উল্লিখিত আছে তা থেকে এই গ্রন্থের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্মকথা, তাদেব গোকুলে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন বিষয় গৃহীত হয়েছে। অবশ্য বৃন্দাবন খণ্ডের উপাদান ভাগবতের দশম স্কন্ধে রয়েছে। জয়দেব থেকে শুরু করে পদকার বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পর্যন্ত গোপবধূ প্রণয়ীর লীলারস কীর্তিত করেছেন। বস্তুতঃ চৈতন্যপূর্বযুগে বাংলাদেশে বৈষ্ণবতার যে স্রোত বইতো তাতেই গীতগোবিন্দম্ প্রস্ফুটিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিকশিত হয়েছে এবং অসংখ্য পদাবলী কুসুমিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কাহিনীগুলি স্থান পেয়েছে, যার সন্ধান পুরাণে কিম্বা অন্য কোথাও মেলে না, তা বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি, তা বাঙালীর প্রাকৃত-জীবনের দান। এই দানে আধ্যাত্মিকতার গভীর স্পর্শ লাগেনি, এ দানে ফুটে উঠেছে প্রাকৃত মানুষের স্থূল প্রণয়কাহিনীর রূপ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের এক প্রান্তে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিলব্ধ পৌরাণিক প্রভাব অন্য প্রান্তে দেখা যায় একটি গ্রামীন সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বভাব। কাব্যের অনুরোধে কবি গীতগোবিন্দম্ থেকে কিছু কিছু পংক্তি ও কাব্যবস্তু গ্রহণ করে তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সূত্রেই

বলা যায় যে, কবি পৌরাণিক কৃষ্ণ-কাহিনীর প্রতি খুব বেশী আনুগত্য দেখান নি। তৎকালীন গ্রামীন সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনীই কবিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। পুরাণে, কৃষ্ণ-গোপীলীলা প্রসঙ্গতঃ বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব-প্রকাশক লীলাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাই প্রধান। বাঙালীর মনে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কে পৌরাণিক এবং অপৌরাণিক—এই উভয়বিধ কৃষ্ণলীলারই ধারণা ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ধারণারই ফলশ্রুতি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গঠন সম্পর্কে আলোচনা কালে দেখা যায় যে, এ কাব্যের কাহিনী, ঘটনাবিবৃতি—নাট্যরস ও গীতিরস—এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত। অধিকতর সতর্ক হয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে ঘটনা-বিবৃতি ও গীতিরস অপেক্ষা এ কাব্যে নাট্যরসের প্রাধান্যই বেশী। এই কাব্যের অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে প্রধানতঃ কৃষ্ণ রাধা ও বড়াই-র উক্তি প্রত্যুক্তি। একের উক্তির সঙ্গে অপরের উক্তির সংযোগসূত্র রক্ষা করার জন্য এবং তার সাহায্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কবি যেন আপন অজ্ঞাতেই নাট্যকার-সুলভ বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এই জন্যই বোধহয় তিনি অতি অল্পস্থানে বিবৃতিকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গঠনের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কাব্যকাহিনী গতিবেগ-বহুল হয়েছে। তাম্বূলখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনা স্থলে কৃষ্ণের উক্তিতে গীতিরসের ছোঁয়া লেগেছে ; বাণখণ্ডে মূর্ছাতুর রাধাব দুর্দশায় পীড়িত কৃষ্ণের বিলাপে গীতিরস আভাসিত হয়ে উঠেছে এবং বংশীখণ্ডের দু এক স্থলে এবং রাধা-বিরহের বহু স্থলে বিরহবিধুরা বাধার বিলাপের মধ্যে অশ্রুতপ্ত গীতিরসধারার সার্থক সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেছে ঃ

> কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কূলে।
> কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
> আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
> বাঁশীর শবদে মো আউলাই লোঁ রান্ধন। ১ ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে কোন্ জনা।
দাসী হয়াঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
আবার ঝরএ বড়ায়ি নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি মো হাচালিয়োঁ পরাণী ॥ ২ ॥
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁওঁ ॥
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥ [বংশী খণ্ড]

কৃষ্ণের বিরহে রাধার এই আর্তি হৃদয়স্পর্শী। অথচ কাব্যের প্রথম দিকে রাধা, কৃষ্ণের প্রণয়-প্রস্তাবকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, পতিকুল ও পিতৃকুলের দম্ভে কৃষ্ণকে নিদারুণ অবহেলা দেখিয়েছেন। দানখণ্ডে কৃষ্ণের পাশব বর্বরতায় শ্রীরাধা নিশ্চয়ই ভয়ে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়েও বাধ্য হয়েই কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু নৌকা-খণ্ডের জলবিহারের পর রাধার মন ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি অনুকূল হল এবং বৃন্দাবন খণ্ডে তা গভীর প্রেমে পরিণত হল। বংশীখণ্ডে এবং রাধাবিরহ খণ্ডে এই প্রেমেরই সুগভীর সংবেদনা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দেহাসক্তির ভিত্তিতে কবি প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে নাটকীয় ক্রমপরিণতির ধারায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে একদিকে যেমন কবির গীতিধর্মিতার প্রতি আনুগত্য রয়েছে অন্যদিকে নাটকীয়তার দ্বারা তিনি পরিচালিত। এজন্য এই কাব্যে তিনটি চরিত্র (কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই) একটি ক্রমবর্ধমান পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য বড়ায়ি চরিত্র বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি, ভারতীয় সাহিত্যে যে কুট্টিনী চরিত্রের ধারা আছে তার ছায়ায় এই চরিত্র রচিত। তবে এ চরিত্র সৃষ্টিতে কবির কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয়। বড়ায়ির বাহ্যিক আচার আচরণ কামশাস্ত্রোক্ত দূতী বা কুট্টিনীর মত, এদিক দিয়ে কবি সম্ভবতঃ দামোদর গুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বা জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকরের' আদর্শে বড়াইচরিত্র অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু কবি

তাকে টাইপ করে তোলেন নি, তিনি তার মধ্যে মানবিক বোধ সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি একটি বিশেষত্ব লাভ করেছে। রাধা-চরিত্রে কবি নাটকীয় রূপটি সমধিক সৃষ্টি করেছেন—প্রথম অবস্থায় রাধা কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ, কৃষ্ণের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে মাতা যশোদার কাছে কৃষ্ণের কুকাজ সম্বন্ধে নালিশ করেছেন,

বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥
আমা বিগুলিত যে হেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুলিত এ সখিগণে ॥

কিন্তু এ নালিশের সুর রাধা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি, যেন আপন অজ্ঞাতেই দেহলোভী কাহ্নের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন। তাই কালিয়দমনে ব্রতী কৃষ্ণের জন্য তিনি বিলাপ করেন,

ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালী নাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে ॥

এই প্রেমবোধ কৃষ্ণ বিরহে পরিত্যক্তা রাধিকার সকরুণ আর্তিতে বিমণ্ডিত হয়েছে,

মুছিআঁ পেঁলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিঁদুর।
বাহুর বলয় মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
কাহ্ন বিনা সবখন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥

রাধিকার বুকফাটা আর্তনাদেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কৃষ্ণ এ কাব্যে ধূর্ত প্রণয়ী, ছলে বলে কৌশলে কিশোরী অনভিজ্ঞা গোপবধূ রাধার দেহ এবং মন জয় করেছেন। আবার রাধার দেহ মন সম্পূর্ণতঃ পেয়েও কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে মথুরায় যেতে বিন্দুমাত্র

কুণ্ঠিত হন নি, বরঞ্চ এই ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণস্বরূপ তিনি রাধার পূর্ব-ব্যবহারের কথা বারবার বলেছেন। ফলে দেখা যায় যে, এই চরিত্রটি আদ্যন্ত অসঙ্গতিতে ভরা। অন্যদিক থেকে এ কাব্যের সর্বত্রই কৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে, অথচ তাঁর ব্যবহারে অবতারত্বের মহিমা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে রাধাকে স্ব-সম্বিতে আত্মস্থ করতে গিয়ে প্রথমেই কৃষ্ণ, রাধার দেহকে বলপূর্বক সম্ভোগ করেছেন। বস্তুতঃ রাধার দেহসম্ভোগ ব্যতীত রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহ, করুণা, প্রেম প্রভৃতি জাগ্রত হয় নি। বস্তুতঃ জন্মখণ্ড এবং রাধাবিরহের একটি স্থান ছাড়া কৃষ্ণ এই কাব্যের কোথাও মানবিক চেতনা-সম্ভূত প্রেমিকরূপে রাধার কাছে ধরা দেন নি। যে কৃষ্ণ বড়াইর মুখে রাধিকার রূপ-বর্ণনা শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন (অবশ্য এ ব্যাকুলতা কামাবেগপ্রসূত, তাতে সন্দেহ নেই), যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন খণ্ডে এবং বাণখণ্ডে রাধার সঙ্গে মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছেন, যাঁকে রাধাও শেষ পর্যন্ত অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ করেছেন সেই কৃষ্ণ বংশী হরণের অপরাধে রাধাকে মেরে ফেলতে চান,

যবেঁ না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনি পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে॥

সেই কৃষ্ণ রাধাবিরহের কালে কুটিল কুৎসিৎ ভাষায় রাধাকে ব্যঙ্গ করেছেন,

এ বেসি জানিল ভৈল কলি অবতার।
সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার॥
...　　...　　....
এবে কেহ্ন গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন॥

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ যেন বড়ায়ির অনুরোধে রাধাকে পরিতৃপ্ত করেছেন,

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি
কৈলো মোএঁ রাধার সঙ্গ ল॥ ধ্রু॥

এরপর নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কৃষ্ণ চুপিসারে মথুরায় চলে গেছেন। স্বভাবতঃ এ কৃষ্ণ মহিমাবিমণ্ডিত নন, এ কৃষ্ণের রূপকে অতি গ্রাম্য বললে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই কাব্যের এই চরিত্রটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই চরিত্রটির জন্যই সমালোচকরা কবির প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করতে পারেন নি। এ চরিত্রে নাটকীয় বিকাশ নেই, নানা দিক থেকে এ চরিত্র রসাভাসে পরিপূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র পরিকল্পনায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে, বড়ু চণ্ডীদাস এ কাব্যের চরিত্র সৃষ্টি-গত দিক দিয়ে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলি স্থূলহস্তাবলেপের চিহ্ন-বহন করলেও সেগুলি প্রাণরসে অনুজ্জ্বল নয়। আদিম কামনা বাসনার স্তর থেকে তিনি যেন মূর্তি নির্মাণের প্রয়াস করেছেন ; গ্রামীন জীবনের স্থূল পরিবেশে কোন কোন চবিত্র কিছু পরিমাণে অশিষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর চরিত্র ভাব-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা নয়, দেশকালের স্রোতে গড়ে ওঠা শিল্পমূর্তি —এইখানেই কবির প্রশংসনীয় কৃতিত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যেব রূপ বিচারের কালে দেখা যায় যে, এই কাব্য গঠনগত দিক থেকে ঝুমুরের লক্ষণাক্রান্ত এবং এর রস মূলতঃ শৃঙ্গাব রস। ঝুমুরি বা ঝুমুব গানে শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকবে, তা মধুজাত সুরার মত মধুব ও মৃদু হবে, তাতে বর্ণাদি ও ছন্দাদির বাঁধা নিয়ম থাকবে না (প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদু। একৈব ঝুমুরীর্লোকে বর্ণাদি নিয়মোজঝিতা ॥ —দামোদর গুপ্ত), এই লক্ষণ ধরে বিচার করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে ঝুমুরের মিল আছে। এ ধরনের বিচারে অবশ্য এই কাব্যকে রাঢ়ের 'ঝুমুর', আসাম অঞ্চলের 'কুশল' এবং উত্তরবঙ্গের 'জাগের গান' প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সমগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি বিচার করলে একে গীতিসংলাপমূলক আখ্যান বলাই উচিত। মধ্যযুগে কাব্য গানের মাধ্যমে প্রচারিত হতো। সুতরাং এ কাব্যে পাঁচালীর গুণ

বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। কবি তাঁর কাব্যে শুধুমাত্র শৃঙ্গার রসেরই অবতারণা করেন নি, ব্যঙ্গবিদ্রুপের সমাবেশে, তির্যক বাদপ্রতিবাদে হাস্যরসও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে; করুণরসের দিকটিও এ কাব্যে উপেক্ষিত নয়। কবির বর্ণনাকৌশল, অলংকার সংযোজনা এবং শব্দ প্রয়োগ কাব্যখানিকে রসসমৃদ্ধ করার যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস এদিক দিয়ে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রভাব-পরিপুষ্ট হয়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারায় একটি অভিনব প্রবাহ এনে দিয়েছেন। তাঁর আগে কাব্যকলার এমন নিদর্শন মেলে না। রূপ-বিচারের কালে এ কাব্যের ছন্দবৈচিত্র্যের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই কাব্যে পয়ারের মোট সাত প্রকার প্রকরণ লাভ করা যায়ঃ

১) চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারঃ কোন সুখে কংশ তোর মুখে
উঠে হাস।
নাহিঁ জান এবেঁ তোঁ আপনার নাশ ॥

২) বিষম অক্ষরের পয়ার তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥

৩) দশ অক্ষরের পয়ার একদিন মনেব উল্লাসে।
সখী-সনে রস পরিহাসে ॥

৪) এগার অক্ষরের পয়ার আইলা দেবের সুমতি শুনী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥

৫) লঘুত্রিপদীঃ তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
আতর নব যৌবনে।
অহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥

৬) দীর্ঘ ত্রিপদী সর্বাঙ্গে সুন্দরী তোএঁ দেবমুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভাল জানে দেবগণ
ইতে কিছু নহিঁক সন্দেহা ॥

৭) ভঙ্গ ত্রিপদী : রামকাজে হনুমন্তা তেহেন আহ্মার দূতা
ভাঁগিল নেহা পুণী যোড়াইতেঁ শকতী।

ছন্দের এই বৈচিত্র্য পরবর্তী কালে বাংলাকাব্যের দেহধারণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এ কাব্যে ছন্দের ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও বলা যায় যে এ কাব্যে আবেগ ও আবেগ প্রকাশের ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এদিক থেকে বিচার করলে এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আধুনিক পাঠকের সমাদর লাভ করেনি, তার প্রথম কারণ গ্রন্থখানির প্রাচীন শব্দরাশি ও দুর্বোধ্য ভুল অজস্র বানান; দ্বিতীয় কারণ এ কাব্যের অশ্লীলতা। প্রথম কারণের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি নানাদিক দিয়েই আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় কাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে এই কাব্যের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদির কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রবাদের মতই সত্য যে শ্রীচৈতন্য কাব্যখানির রসাস্বাদন করতেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের জনসমাজে, বিশেষ করে বৈষ্ণবমহলে কাব্যখানির সমাদর ছিল। এই সত্যকে সামনে রেখে বলতেই হয় যে মধ্যযুগীয় রুচিতে এ কাব্য অশ্লীলতা দোষদুষ্ট ছিল না। শৃঙ্গার রসের যে বাহুল্য আধুনিক পাঠককে পীড়িত করে মধ্যযুগে তাই-ই পাঠক ও শ্রোতাচিত্তে আনন্দ দান করতো। তা ভিন্ন বাংলাদেশের সমাজ পরিবেশের বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে দেহজ কামনা বাসনার অত্যুগ্রতা এক সময়ে সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ তার লৌকিক দিককে অবলম্বন করেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন; ফলে এ কাব্যে দেশকালের একটি পরিচ্ছন্ন শিল্পমূর্তি প্রকটিত হয়েছে।

অন্যদিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই কাব্যে, বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণবতার রূপটি কিভাবে এসেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগের মানবতার প্রতিভূ চৈতন্যদেব যে

বৈষ্ণব ভাবকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার আগে বাংলা-দেশে তার কি রূপ ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের মধ্যে তাই বিষ্ণুশক্তির একটি রূপ (কংসারি কৃষ্ণ, কালিয়দমন কারী কৃষ্ণ) ফুটে ওঠে, এবং গোপীদের সঙ্গে প্রেমে প্রমত্ত আর একটি রূপও বিধৃত হয়েছে। অবশ্য রসগত বিচারে গোপীবল্লভ কৃষ্ণই প্রাধান্য পেয়েছেন। কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তির যে পরিকল্পনা পরবর্তী সাহিত্যে হয়েছে তারই আদিম রূপ এই কাব্যে লাভ করা যায়। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা কাব্যধারার বেগবান একটি স্রোতকে এই কাব্যের সাহায্যে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, এ কথা বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না।

কালানুক্রমিক ধারায় বাংলা কাব্য যে ভাবে প্রবাহিত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পর বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। বিদ্যাপতি মিথিলার শৈবব্রাহ্মণ রাজ-সভার সভাপণ্ডিত এবং সভাকবি। তিনি অবাঙালী, তবু তাঁকে বাদ দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারার, বিশেষ করে বৈষ্ণব শাখার আলোচনা সম্ভব নয়। যে কারণে সংস্কৃতে কাব্যরচনা সত্ত্বেও জয়দেব বাংলা কাব্যধারাকে প্রভাবিত করেছেন তার থেকেও জোরালো কারণে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভা বাংলা কাব্যধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। স্পষ্টতঃই ভাবের গভীর এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির পদাবলী মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য-ধারায় জোয়ার এনেছে। ভাষার দিক থেকে বৈষ্ণবপদাবলী এক অভিনব সম্পদ এই পদাবলীর কাছ থেকে লাভ করেছে। বিদ্যাপতির ভাষা মিথিলা অঞ্চলের, কিন্তু বাঙালী বৈষ্ণব কবি এই ভাষার অনুকৃতিতে এক কৃত্রিম সুন্দর ধ্বনিঝঙ্কার পূর্ণ ভাষা সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাপতির পদসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সবের যথাযথ পরিচয় লাভ করা যাবে।

পূর্বভারতের 'কবি সার্বভৌম' বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হয়েও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাঙালী

কাব্যরসিক সমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে কবি ও ভাবসাধক-রূপে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাপতি তাঁর কবিত্বশক্তিকে নানা দিকে প্রবাহিত করেছিলেন ; তিনি হরগৌরী বিষয়ক পদ রচনা করেছেন, 'কীর্তিলতা' লিখেছেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদই তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী কবি-খ্যাতি দান করেছে এবং বাঙালীই সশ্রদ্ধচিত্তে বিদ্যাপতির পদাবলী আপন অন্তরের চিরসুন্দর অম্লান রসলোকে রক্ষা করে কবির মৃত্যুঞ্জয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব বিদ্যাপতি বাঙালী না হয়েও বাঙালীর অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন এবং বাঙালী তাঁব সৃষ্ট রসধারায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে বিস্মৃতির ঘন অন্ধকার থেকে রক্ষা করেছে।

বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বাংলাদেশেব মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র ছিল। সে সময়ে অনেক মৈথিলী ছাত্র বাংলাদেশে এসে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং অনেক বাঙালী ছাত্র মিথিলায় গিয়ে পড়াশুনা করতেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছে। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদের ভাবরসাস্বাদন করতেন, এই সূত্রেই বিদ্যাপতির পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ; এ অনুমান প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিদ্যাপতিব উল্লেখ আছে ; পরবর্তীকালের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃত সমুদ্র', 'পদকল্প তরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদসংগ্রহে বিদ্যাপতির বহু পদ সঙ্কলিত হয়েছে। কবি গোবিন্দ দাস স্বয়ং বিদ্যাপতিকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন (কবি বিদ্যাপতি অতিমানে। যাক গীত জগতচিত রোয়ায়ল গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে।) এবং বিদ্যাপতির অনেক অসমাপ্ত পদ তিনি নিজেই পূরণ করেছিলেন। আর এর-ও আগে অদ্বৈতা-চার্য বিদ্যাপতির 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥' এবং 'দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল। হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল।' পদাংশ বলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে

অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি পদকর্তা বিদ্যাপতির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বিশেষভাবে বাংলাদেশের বৈষ্ণবসমাজে সুগভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বিদ্যাপতির পদ। বিদ্যাপতিব এই জনপ্রিয়তার জন্য বাঙালী পাঠক ভুলেই বসেছিল যে বিদ্যাপতি বাঙালী কবি নন। বাঙালী পাঠক বিদ্যাপতির পদের রসসম্ভারেই সন্তুষ্ট ছিল, তাঁর দেশকালের প্রতি কোন কৌতূহল তাব মনে জাগেনি। সে কৌতূহল জাগলো উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এবং তা জাগালেন বৈষ্ণব ভাব-সংস্কৃতিতে লালিত পালিত বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকায় 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে তিনি বৈষ্ণব কবিদের পরিচয় দান করেন এবং বিদ্যাপতিব পদ উদ্ধৃত করেন। এই থেকেই শুরু হল বিদ্যাপতির বৃত্তান্ত অনুসন্ধানের পালা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিদ্যাপতির পদের সংকলন প্রকাশিত হতে শুরু করলো। তারপর নানা প্রশ্ন ভীড় করলো নানা তথ্য উদ্ঘাটিত হলো। এখনও বিদ্যাপতির কালসম্পর্কে, তাঁর রচনা সম্পর্কে নিত্য নব অনুসন্ধান চলেছে। এখন পর্যন্ত সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে বলা চলে বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগ (১৩৮০ খ্রীঃ) থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের ও কিছু (১৪৬০ খ্রীঃ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মিথিলার রাজসভায় বিদ্যাপতি সভাপণ্ডিত এবং সভাকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তাঁর রচনার সঙ্গে মিথিলার এই রাজসভার যোগসূত্র অতি নিবিড়। মিথিলাপতি দেবসিংহের নির্দেশে কবি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে 'ভূপরিক্রমা' গ্রন্থখানি রচনা করেন। গ্রন্থখানিতে মিথিলা থেকে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত স্থানের যাবতীয় তীর্থের বর্ণনা আছে। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গ্রন্থখানি রচনা করেন। কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ অবহট্ট ভাষায় রচিত 'কীর্তিলতা'। গ্রন্থখানিতে কীর্তি-

সিংহের বীরত্বকাহিনী মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। অবশ্য কবি এই গ্রন্থে জৌনপুরের নাগরিক ঐশ্বর্যের নয়নাভিরাম বর্ণনা দিয়েছেন। কীর্তি ও প্রণয়ের ভিত্তিভূমিতে রাজা শিব সিংহকে স্থাপন করে বিদ্যাপতি 'কীর্তিপতাকা' নামে অন্য একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। বিদ্যাপতি ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক নানা গল্পকে ভিত্তি করে 'পুরুষ পরীক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি এই শতকের গোড়ার দিকেও এদেশে প্রচারিত ছিল। কবির 'লিখনাবলী' অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীর ভাবসৌকর্যের জন্য রচিত। এই গ্রন্থগুলি ভিন্ন সংস্কৃতে কবি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলি শাস্ত্র ও স্মৃতি-মূলক। অবশ্য এই গ্রন্থসমূহের জন্য যে বিদ্যাপতি বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে আসন লাভ করেন নি, তা বলাই বাহুল্য। কবির পদাবলীই তাঁকে সেই সিদ্ধি দান করেছে।

নানা অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলী হিসেবে মোট ৯৬৫টি পদ পাওয়া গেছে। অবশ্য এর মধ্যে সবগুলিই বিদ্যাপতির রচনা কিনা সে কথা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। এই পদগুলি বাংলাদেশ, মিথিলা এবং নেপাল থেকে পাওয়া গেছে, তবে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া পদগুলিতে যে কালের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার কোন কোন অজ্ঞাত-নামা পদকর্তা নিজের রচনা যে বিদ্যাপতির নামে চালিয়ে দেন নি, এ কথাও বলা যায় না। অবশ্য এ সমস্যা মধ্যযুগের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কোন কবির রচনার নির্ভুল সংগ্রহ ও সঙ্কলন লাভ করা তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

বিদ্যাপতির পদাবলীকে যথাক্রমে (ক) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, (খ) হর-গৌরী এবং কালী বিষয়ক, (গ) গঙ্গা বিষয়ক (ঘ) প্রহেলিকা জাতীয়, (ঙ) দেবতা সম্পর্ক বর্জিত বিভিন্ন বিষয়ক পদরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। বাংলাদেশে অবশ্য কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিই বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়, বিদ্যাপতির পদাবলীতে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকায় তাঁর

ধর্মমত কি ছিল এ নিয়ে জোর আলোচনার অবতারণা হয়েছে। কবি শৈব ছিলেন না শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না আর কিছু ছিলেন এ এক মহাসমস্যার সৃষ্টি করেছে। মৈথিলীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে বিদ্যাপতি শৈব এবং শাক্ত ছিলেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা কবির শৈব ও শাক্ত পদগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির জন্যই। স্বল্পসংখ্যক বিদগ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত সমস্ত বাঙালীই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব-পদাবলীকার হিসেবেই জানে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রূপসৌন্দর্য এবং অতি নিবিড় রসগভীরতা বিদ্যাপতি বাঙালী পাঠককে ডালি সাজিয়ে দিয়েছেন এবং বাঙালী পাঠক তাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদই বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য, তবু তাঁর হরগৌরী বিষয়ক পদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই শ্রেণীর পদগুলি একদিক থেকে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে। পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যধারায় আমরা শিবায়ণ কাব্য শাখাটিকে পাই। এই কাব্য শাখার কবিরা হরগৌরীর সাংসারিক একটি পরিচয় অঙ্কন করেছেন। বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদগুলির মধ্যে তার পদধ্বনি যেন শুনতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে হরগৌরীকে কেন্দ্র করে দরিদ্র সংসারের চিত্র অঙ্কনের ধারা বেশ কিছুদিন থেকেই প্রচলিত হয়েছিল। বিদ্যাপতিও সেই ধারাই অনুসরণ করেছেন বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না। বাংলাসাহিত্যে শিব চিরনিঃস্ব, পার্বতীর সঙ্গে শিবের যেন কোন তুলনাই হয় না। এই অবস্থার রূপায়ণ বিদ্যাপতির পদেও লভ্য :

চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউনি তোহ ন জোগ বর ॥
হর চাহ গুরু গোউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালা তোরী ॥

....

ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পট সসী॥
বড় সুখে সাসু চুমও বাহ মাথা।
ওঠ বুরত সুরসরিকে সথা॥
করব সখীজনে কেলি আলাপে।
বিলগ হোএত ফফু আএত সাপে॥

[হে দিগম্বর হর তুমি ফিবে যাও। আমার গোস্বামিনীর (ঈশ্বরীর) যোগ্য বর তুমি নও। গৌরী হব অপেক্ষা গৌরবে অধিক। তাহলে তোমার জপমালা দিয়ে কি হবে? তোমার কপালে নয়নানলরাশি জ্বলছে, (তাতে) গৌরীর মুকুট ঝলসে যাবে, পট্টবস্ত্র পুড়ে যাবে।

বড় সুখে শাশুড়া যখন স্ত্রাআচারেব উদ্দেশ্যে মাথায় হাত রাখতে চাইবেন তখন সুবধুনার স্রোতে ঠোঁট পর্যন্ত ডুবে যাবে। সখীরা যখন প্রেমরহস্যালাপের জন্য নিকটে যাবে তখন সাপ বার হয়ে ফোঁস ফোঁস করবে।] এই অংশটি নিঃসন্দেহে অন্নদামঙ্গল কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, সেখানেও গৌরীর বর নিয়ে পড়শীদের আক্ষেপ এমনিতর ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্য একটি পদে বিদ্যাপতির গৌরী সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যে পীড়িতা হয়ে শেষ পর্যন্ত শিবকে কৃষিকর্মের উপদেশ দিয়েছেন :

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষ করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পত্র মাগিঅ
গুণ গৌবব দূর জাই॥
খটগ কাটি হরে হরজে বঁধাওল ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হরলএ জোতিঅ পাটএ সুরসরি ধারে॥

[হে শিব! আমি তোমায় বারবার বলছি, মন দিয়ে কৃষিকাজ কর। তুমি লজ্জাশরম ত্যাগ করে ভিক্ষা কর, তাতে গুণগৌরব দূরে যায়। হে হর! খট্টাঙ্গ কেটে হাল বানাও, ত্রিশূল ভেঙে ফাল তৈরি

কর, তোমার ধুরন্ধর বৃষকে নিয়ে জুতে দাও, গঙ্গার ধারায় জমি পাট কর।] এ চিত্রও শিবায়ণ কাব্যে, শূন্যপুরাণে আমরা পাই। বিদ্যাপতি তাঁর রস-দৃষ্টির সাহায্যে হরপার্বতীর দাম্পত্য জীবনের, গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব রসসমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কবিপ্রতিভার এ এক স্বতন্ত্র পরিচয়। বাঙালী পাঠকের কাছে এ পরিচয়ের মূল্য যথেষ্ট। বিদ্যাপতির শাক্তপদ বাংলাদেশের শাক্ত-পদাবলীর সুরকেই যেন অঙ্কুরিত করেছে বলে মনে হয় ঃ

কজ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জ্বল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅএ গঙ্গা কহীএ পাণী ॥
ব্রহ্মাঘব ব্রহ্মাণী কহিএ হরঘর কহিঅএ গৌরী।
নারায়ণঘর কমলা কহিএ কে জাত উৎপতি তোরী ॥

[তুমি কজ্জলরূপে কালী নামে এবং উজ্জ্বল রূপে বাণী বা সরস্বতী নামে পরিচিতা। সূর্যমণ্ডলে তোমায় প্রচণ্ডা বলে, জলরূপে গঙ্গা বলে। তুমি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী, হরের গৌরী, নারায়ণের কমলা নামে কথিতা। তোমার উৎপত্তি কে জানে?] শক্তি সম্বন্ধে এই দৃষ্টি-ভঙ্গিই ত শাক্তপদাবলীর কবিরা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাপতির অন্য পদাবলী শৃঙ্গাররসাত্মক। সেগুলির মধ্যে কালোচিত রূপ যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট। সেখানে আছে প্রণয়ের নানা রূপ, অতিপরিচিত কুট্টিনী এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ। কিন্তু এ সমস্ত বাহ্য। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীই প্রত্যক্ষতঃ বাংলা কাব্যধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। এই পরিপুষ্টির মূল্য অপরিসীম।

জয়দেবের মত বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিলাসকলাকুতূহলের কবি, তাই তিনি অভিনব জয়দেব। এই রসে কবির কোন ক্লান্তি নেই, এই রসকে কেন্দ্র করে কবি নব নব সৌন্দর্যানুভূতি বিচ্ছুরিত করেছেন। বিদ্যাপতির রাধার ভাবমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে বিমুগ্ধ করেছিল, তাই রাধার রূপসৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে

যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড় চক্ষে দৃষ্টি। ··আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।···যৌবন সেও সবে আরম্ভ হইতেছে —তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ।' বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে যৌবনচেতনার প্রাথমিক স্তর থেকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইজন্যই তাঁর রাধা বয়ঃসন্ধিক্ষণের কৌতুকোচ্ছলতায় পরিবৃত, এই কৌতুকোচ্ছলতা যতই রহস্যঘন হয়ে উঠেছে ততই রাধার রূপ দীপ্ত, প্রোজ্জ্বল হয়েছে। বিদ্যাপতি যেন নবীনা নবস্ফুটা রাধার প্রথম প্রণয়ের প্রদীপ্তি বৃদ্ধি করার জন্যই তিলে তিলে আপন কবিপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। বাংলা কাব্যধারায় সৌন্দর্য-সংযোজনায় বিদ্যাপতি ক্লান্তিহীন সার্থক শিল্পী—'এইজন্য ছন্দ,' সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।'

বিদ্যাপতির রাধাচরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভকালে এই চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—বয়ঃসন্ধি বা মুগ্ধাভাব, অভিসার-মিলন, সম্ভোগ-মান, মাথুর বা বিরহ। বিদ্যাপতি অবশ্য বিরহের পর ভাবসম্মিলন দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর রাধার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বিরহের মধ্যেই। কবি তাঁর রসপিপাসু মন এবং সৌন্দর্য-সমুজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে বালিকা রাধিকার কৈশোর থেকে যৌবনের শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সার্বিক রূপ চিত্রিত করেছেন। এইজন্যই তাঁর রাধার মধ্যে বালিকার চাঞ্চল্য, নব যৌবনের মৃদু-মাদকতার আচ্ছন্নভাব এবং এই মাদকতাজনিত রূপচেতনা, অনাবৃত বাল্য এবং আত্মগোপনচারী নবযৌবনের বিমিশ্র দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। এই পরিস্ফুটনায় কবি একদিকে চিত্রশিল্পীর রীতি এবং অন্যদিকে

ভাস্করের দক্ষতা অবলম্বন করেছেন। কবি বালিকা রাধার কায়া-পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা রাধা নিজেই সভয়ে এবং সকৌতুকে লক্ষ্য করেছেন ; তাঁর সখীরা তাঁর আচার আচরণের মধ্যে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করে কৌতুক বোধ করেছেন এবং কৃষ্ণ এই অর্ধমুকুলিত দেহ চাঞ্চল্যময়ী রাধার দেহসীমায় অনঙ্গের আকস্মিক আবির্ভাবে আনন্দ উল্লাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণের এই আনন্দ উল্লাস রাধার মনেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং তারই ফল স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা তরঙ্গিত হয়েছে।

কবি প্রথমে বালিকা রাধার প্রথম কৈশোর চিত্রিত করেছেন। এতদিন রাধা সখীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে খেলাধূলা করেছেন, কিন্তু দেহে কৈশোরের প্রথম কিরণপাতে শ্রীরাধা কস্তুরীমৃগের মত আপন গন্ধে চঞ্চলা হয়ে ওঠেন :

খেলত ন খেলত, লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরিমাঝ॥
... ...
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়য়ি না পার॥

কবি এখানে সহচরীদের সঙ্গে খেলাধূলায় রত রাধিকার মধ্যে বালিকার চাঞ্চল্যের সঙ্গে কৈশোরজনিত দৈহিক পরিবর্তনের লাজলজ্জা মিশিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্যই তাব 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধুমাতল কিয়ে উড়য়ি না পার॥' (মধুমত্ত ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, চোখদুটিও তেমনি স্থির হয়ে আছে)। রাধার এই পরিবর্তনকে কবি আরও সুন্দরভাবে অন্য একটি পদে চিত্রিত করেছেন :

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরঈ॥

খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি ঘোর।
খনে আঁচর দেই খনে হয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই ন পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥

[ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্ত দ্বারা অনুসরণ করে, ক্ষণে ক্ষণে বসন ভূলুণ্ঠিত হয়ে তনুকে ধূলিধূসরিত করছে। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করায় দশনের ছটা বিকীর্ণ হয়, ক্ষণে ক্ষণে অধরের সম্মুখে কাপড় টেনে দেয়। কখনও চমকে চলে কখনও বা ধীর মন্থর-গতিতে চলে, মন্মথের পাঠ শিক্ষার এই প্রথম চেষ্টা। মুকুলিত স্তনযুগল অল্প অল্প দেখে, কখনও বুকে আঁচল টেনে দেয়, কখনও তা দেখে বিভোর হয়ে যায়। বালার শৈশব ও তারুণ্যের মিলন ঘটেছে—এদের মধ্যে কে বড় কে ছোট লক্ষ্য করা যায় না।] বিদ্যাপতি রাধার দৈহিক পরিবর্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগুলি যেন ভাস্কর্যের লালিত্যে পরিপূর্ণ করেছেন, 'পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥' পদটির মধ্যে কবির সেই অনুপম সৌন্দর্য-সৃষ্টির রূপটি নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কবি শুধু মাত্র শ্রীরাধার বাহ্যিক পরিবর্তনের রূপই সৃষ্টি করেন নি, এই পরিবর্তন শ্রীরাধা কি অভিনব ভাব-রূপের ভেতর দিয়েই না ফুটিয়ে তুলছেন। উদ্ধৃত পদটি থেকে দেহে মনে অভিনব রাধিকার ভাব-রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনকি রাজ পহিল পরচার।
ভিনজনে দেয়ল ভিন অধিকার॥

কটিক গৌরব পাঅল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তন্থিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

[শৈশবের সঙ্গে যৌবনের সাক্ষাৎ হলো, মদন দুই পথই দখতে গেল। মদনের অধিকার প্রথমে প্রচারিত হলো, ভিন্ন জনে ভিন্ন অধিকার দিল। নিতম্ব কটির অধিকার পেল, একের ক্ষীণতা অন্যের অবলম্বন। প্রকাশ্য হাসি লুকিয়ে গেল, উরজ তার প্রকটতা নিল। চক্ষুদ্বয় চরণের চঞ্চলতা পেল, চোখের ধৈর্য পদতলে গেল।] রাধিকার এই বয়ঃসন্ধির চাঞ্চল্য ও স্থৈর্য যুগপৎ রূপায়িত হওয়ায় তার মধ্যে রহস্যময় এক অপূর্বতা সৃষ্টি হয়েছে। এই অপূর্বতাকে কবি যেন তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে ফুটিযে তুলেছেন:

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তহি তঁহি সরোরুহ ভরই।
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী তরঙ্গ॥
.. ....
হেরইতে সো ধনি ঘোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥

শ্রীরাধার এই রূপমাধুর্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে প্রেমের পরশ-মণির স্পর্শে। কৃষ্ণ রাধিকার রূপে বিভোর হয়ে তাঁর প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল, রাধিকার দেহকান্তি কৃষ্ণের মনে রূপের উল্লাস এবং না পাওয়ার বেদনা সঞ্চারিত করেছে। শ্রীরাধাও কৃষ্ণের বাসনালোক উদ্দীপ্ত করার জন্য 'ঈষত হাসনি সনে' নয়নবাণের আঘাত হানেন। কিন্তু সে আঘাত আবার তাঁর কাছেই ফিরে আসে, কৃষ্ণের রূপ তাঁকেও চঞ্চল করে দেয়:

এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন স্বরূপ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেড়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥ ইত্যাদি।

[ওগো সখী, এক অপরূপ দেখলাম, শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হবে। দুটি পদ্মের (পায়ের) ওপর চাঁদের (নখের পংক্তির) মালা। তার ওপর তরুণ তমাল (দেহ), তার ওপর বিজলীলতা (পীতাম্বর), সেই তমালতরু কালিন্দী তীর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।]

এর পরে উভয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বর্ধিত হয়েছে, দূতী উভয়ের মনোভাবের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। প্রথমে কৃষ্ণ রাধার জন্য অভিসার করেছেন, পরে কুলমানভয় ত্যাগ করে নব-অনুরাগিণী রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার করেছেন ঃ

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥

অন্ধকার রাত্রে সকলের অগোচরে অন্তরের আকুলতায় চঞ্চলা রাধা কৃষ্ণের জন্য অভিসার করেছেন। প্রেমের তীব্রতা যত বেড়েছে ততই রাধা বেপরোয়া হয়েছেন ; তাই তিনি ছদ্মবেশে অভিসারও করেছেন 'নৌতুন নেহের' জন্য। পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই মিলন যৌবনরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে লাখগুণ আনন্দ বিকীর্ণ করেছে ঃ

জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ।
তবে জৌবন জব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কভু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দকলা সম বাঢ়॥

রাধিকার প্রেম চন্দ্রকলার মত বেড়ে বেড়ে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-শোভা লাভ করেছে। কিন্তু এই প্রেম অনুপম হয়েছে মানে-অভিমানে ঃ

কাঞ্চন-কুসুম জোতি পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়লুঁ আশ॥
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার॥ ইত্যাদি।

কিন্তু মিলন এবং মিলন জনিত আনন্দ, মান অভিমান এবং প্রেমের তীব্রতা সমস্তই যেন বিরহের কূলে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বিদ্যাপতি রাধিকার অম্লান সুন্দর পূর্ণপ্রস্ফুটিত রূপ সৃষ্টি করেছেন, রাধিকার দেহমনের সার্বিক পরিপূর্ণতা সাধিত করেছেন, রাধিকার প্রেমের আকাশকে প্রসারিত করেছেন, বিরহের অবস্থা এনে তার মধ্যে এক অসীম গভীরতা সংযুক্ত করেছেন। কৃষ্ণের মথুরা গমনে প্রথমে রাধিকার 'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥' তারপর এই শূন্যতা তাঁর প্রাণরসকে যেন শোষণ করে নিয়েছে, 'নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হম পাস॥' এই দুঃখের তীব্রতম অনুভূতিতে রাধিকা বলেন ঃ

বিরহ ..হাইঅ নাবি।
জৈবক কে ন হানিঅ মারি॥

[বিরহ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা দিচ্ছে, এর চেয়ে যদি নারীকে প্রাণে মারতে তাহলেও ভাল ছিল।]

বিরহের তীব্রদহনে রাধিকার অন্তর্লোক যেন আপনার সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছে। বিরহিণী রাধিকার মধ্যেই বিদ্যাপতি প্রাণের সুপরিব্যাপ্তি এবং প্রেমের সুগভীরতা ফুটিয়ে তুলেছেন। এইখানেই বিদ্যাপতির কবিকৃতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, রাধা-চরিত্রও পূর্ণতা পেয়েছে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর অন্যান্য পদে বিলাস-কুতূহল, চঞ্চলতা এবং জীবনযৌবন সম্ভোগের

অজস্র উচ্ছ্বাস ও তজ্জনিত আনন্দ আছে; কিন্তু মাথুরের পদগুলিতে বেদনাবিমন্থিতা আশাহতা রাধিকার যে আর্তি ধ্বনিত হয়েছে তা যেন মানবচিত্তের অতি গভীরের অলক্ষ্যে এক চিরন্তন বেদনাকে বাণীমূর্তি দান করেছে। এই বিরহের ঘনীভূত অবস্থার মধ্যেই কবি সুনিপুণভাবে ভাবসম্মিলনের পর্বটি এনে রাধাচরিত্রটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। বিচ্ছেদের মর্মজ্বালা প্রতিক্ষণে রাধিকার মনে কৃষ্ণের স্মৃতি উজ্জ্বল করে তুলছে, এই উজ্জ্বলতা শেষপর্যন্ত তাঁর অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সেই জন্য :

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবুধাঈ॥

[অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করতে করতে সুন্দরী নিজেই মাধব হলো। আপন গুণে মুগ্ধ হয়ে সে নিজের স্বভাব ও ভাব ভুলে গেল।]

বিদ্যাপতি রাধিকার প্রেমকে শেষ পর্যন্ত আত্মবোধশূন্য চিত্ত-সম্পূর্ণতার অভ্যন্তরে নিয়ে গেছেন। এ শিল্প-দর্শন অতুলনীয়। কবি আবার এই রাধিকাকেই মিলনের আনন্দে উচ্ছ্বলিতা করে তুলেছেন :

আজু রজনী হম ভাগে পোহয়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥

কিম্বা,

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥ ইত্যাদি।

অথবা,

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥ ইত্যাদি।

এ যেন বাঁধ ভাঙা আনন্দ; দুঃখের অসীমদাহনের পর এ যেন

আনন্দের জোয়ার ভাঙা কল্লোল। এখানে বিলাসকলার চাঞ্চল্য নেই, এখানে আছে প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা। কতদিন কতভাবে রাধা অন্বেষণ করে ফিরেছেন তাঁর প্রেমাস্পদকে ; বিরহের ব্যথায় মৃত্যুকে শান্তির আশ্রয় বলেও মনে করেছেন ; এখন রাধার সব অন্বেষণ, সকল আক্ষেপ পরিপূর্ণ প্রাপ্তির মধ্যে তার শান্তিময় সমাপ্তি খুঁজে পেয়েছে। কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে না পেয়েও আর তাঁর কোন দুঃখ নেই, আপন সাধনলোকে আনন্দের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে তাঁর নিত্য আরতি। রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিরহের মধ্যেই বিদ্যাপতি তাঁর কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিয়েছেন সত্য, তবু তাঁর ভাবসম্মিলনের পদগুলি রস এবং ভাবগত দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

এই প্রসঙ্গেই বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলির কথা মনে হতে পারে। জীবনের নিঃসীম আর্তি যেন পদগুলিতে আবর্তিত সুরপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। যেমন,

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মোএঞ ছার॥

অথবা, তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥ ইত্যাদি।

প্রার্থনার পদগুলিতে কবি যেন আপন ভাব-চেতনার মন্থিত বেদনাকে রূপায়িত করেছেন। এই পদগুলির সঙ্গে চৈতন্য পরবর্তী

পদাবলী সাহিত্যের একটি নিবিড় ভাব-ঐক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বিদ্যাপতির এই ভাব-গভীরতার ধারা বঙ্গ সাহিত্যের পদাবলী শাখাকে পরিপুষ্ট করেছে।

বিদ্যাপতি তাঁর শিল্প সৌন্দর্যের সাহায্যে, ভাবরস বোধের সাহায্যে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বৈচিত্র এবং ব্যাপ্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষত বাংলা কাব্যধারাকে অজস্র দানে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর ছন্দের মঞ্জীরধ্বনি, তাঁর ভাষার সুরঝঙ্কার গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর ভাষার প্রভাবেই বাংলা কাব্যের বৈষ্ণব পদাবলী শাখার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রজ বুলি, এ এক কৃত্রিম ভাষা কিন্তু এ ভাষার ধ্বনিপ্রবাহ কবিতার মর্মবাণীকে যেন নতুন ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বিদ্যাপতি অবাঙালী, তথাপি তাঁর দানে বাংলা কাব্য পরিপূর্ণ, বাঙালী সেকথা ভোলে নি, কোন দিন ভুলতে পারবেও না। চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির নাম চির উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান থাকবে। বিদ্যাপতির কালজয়ী প্রতিভা তাকে দেশকাল গণ্ডীর সংকীর্ণ সীমা রেখা ভেঙে ফেলে সর্ব মানবের সাহিত্যিকে পরিণত করেছে।

এ পর্যন্ত বাংলা কাব্য পদাবলী জাতীয় রচনায় এবং কৃষ্ণ-কীর্তনের মত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক কাহিনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু বাংলা কাব্যধারায় কৃত্তিবাস এলেন অনুবাদকের নতুন এক ভূমিকা নিয়ে। দেশকালের পটভূমিতে রামায়ণের মত গ্রন্থের অনুবাদ যে অবিস্মরণীয় কীর্তি এ কথা বর্তমান কালে ঠিক মত উপলব্ধি করা যাবে না, কিন্তু রামায়ণ যে প্রত্যক্ষতঃ এবং পরোক্ষতঃ সুদীর্ঘ কাল ধরে বাংলা সাহিত্যকে এবং বাঙালীর চেতনাকে প্রচুর রসদ জুগিয়েছে, এ সত্য প্রমাণ করতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় দেশীয় ভাষায় শাস্ত্র আলোচনার কিম্বা রামায়ণ মহাভারতের মত গ্রন্থ অনুবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন,

যাঁরা এ কাজ করতেন তাঁদের জন্য পণ্ডিতগণ রৌরব নরকের ব্যবস্থা পত্র দিয়েছিলেন। এই প্রতিকূলতাকে ভেদ করেই কৃত্তিবাস সংস্কৃতের হ্রদে আবদ্ধ রামায়ণ-রস যাতে বাঙালী গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বাংলা ভাষার খাদে তাকে প্রবাহিত করলেন :

সাধারণ বিচারে কৃত্তিবাসকে অনুবাদক বলাই সঙ্গত, কিন্তু বর্তমানে অনুবাদ বলতে যা বোঝায় মধ্যযুগে তার নিদর্শন মেলা ভার। মধ্যযুগে অনুবাদক নিজের সৃজনীশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতেন, ফলে মূল গ্রন্থের সঙ্গে অনুবাদের প্রচুর পার্থক্য থাকতো, ভাব এবং বিষয় উভয়ক্ষেত্রেই এই পার্থক্য দেখা যেত। কিন্তু এই স্বাধীন অনুবাদ কবিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য একে স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব। সেদিক থেকে কৃত্তিবাস মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-জগতের একজন বিশিষ্ট সেবক। বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত একটি সুস্পষ্ট রূপ তাঁর কাব্য থেকে লাভ করা যায়। বাঙালীর কাব্য-চেতনার, ভাবচেতনার ও জীবনবোধের একটি সুসংহত সুসম্পূর্ণ পরিচয় আমরা অতি সহজ প্রকাশরীতির মাধ্যমে কৃত্তিবাসের রচনায় লাভ করি। এই জন্যই তিনি যুগে যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি।

কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ কি, তিনি রামায়ণ কাব্যের কোন্ কোন্ অংশ অনুবাদ করেছিলেন, এসব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের সীমা পরিসীমা নেই। কবির কাব্যের যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে কোন্টার কোন্ অংশ আসল তা স্থির করাও মহা সমস্যা। অন্যদিকে প্রামাণ্য পুঁথিতে কবির লেখা আত্মজীবনীও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই আত্মজীবনীতে উল্লিখিত তারিখে কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন কিনা এ প্রশ্নও অনেকের মনে জেগেছে। সুতরাং কৃত্তিবাস এবং তাঁর কাল, কৃত্তিবাস এবং তাঁর কাব্য—এই সমস্ত ব্যাপারই যে অতি জটিল তাতে সন্দেহ নেই। এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা কবির আত্মজীবনী থেকেই কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এবং কবি সম্বন্ধে অবহিত হবো, কেননা নানা বিচার বিবেচনার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এই আত্মজীবনীকে অলীক বলে বর্জন করা

সম্পূর্ণতঃ যুক্তিযুক্ত হবে না। এই আত্মবিবরণী কৃত্তিবাস নিজে লিখেছেন কিনা এ নিয়েও মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, তবু এই আত্মবিবরণীই কৃত্তিবাস সম্পর্কে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয় এবং এই ধারণার স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও পাওয়া যায়। তাঁর আত্মবিবরণীতে কবি নিজের বংশধারার, পারিপার্শ্বিক অবস্থার খুঁটিনাটি তথ্য নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। এই বিবরণীর কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গদেশ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দিকে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি॥
কুক্কুরের ধ্বনি শুনি চতুর্দিকে চাহে।
আকাশবাণী হয়্যা তথা ব্রাহ্মণ যে রহে॥
মালীজাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন জগতে যে ফুলিয়া বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহেন গঙ্গাসোনী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়এ সন্ততি॥

... ...

সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
কুলেশীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারীর পুত্র বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে আনন্দ লয়্যা আইল কৃত্তিবাস।

....

মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয়ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥

....

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (?) মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

....

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥

....

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানাছন্দে নানা ভাষা বিদ্যার প্রসর ॥
আকাশ বাণী হৈল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বেসেন ভারথী ॥
বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥

... ...

সপ্তশ্লোকে ভেটিলাম [illegible] গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধায়া আইল দূত হাতে সুবর্ণ লাটি ॥

ক্বাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সন্তোষ॥

... .

দাঁড়াইনু আমি গিয়া রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈস্বরে।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারি হাত আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর॥

... .

নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া;
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥

... ...

আকৃতি প্রকৃতি আদি যত অবস্থিতি।
পাটপাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূসিতি॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥

... ...

বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥

কবির এই আত্মবিবরণীর উদ্ধৃতি থেকে আমরা অনেক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হই, কবির পূর্বপুরুষ কি ভাবে ফুলিয়ায় এসে বসবাস

শুরু করেন, কবির পিতামাতার পরিচয় কি, কবি কোথায় বিদ্যাভ্যাস করেন, কোন্ অবস্থায় তিনি রামায়ণ রচনা করেন—সব কিছুই তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়। কিন্তু এই আত্মবিবরণীতে কবি নিজের জন্মবার ও তিথির উল্লেখ করেও সনের উল্লেখ করেন নি। এ জন্য তাঁর কাল নির্ণয় জটিলতা সৃষ্টি করেছে; গৌড়েশ্বরের উল্লেখে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নিয়ে বিচার বিতর্কও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, সমস্ত বিচারই পার্শ্ব উপাদান ও প্রসঙ্গের সাহায্যে পরিচালিত। সুতরাং বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তিনি বাস্তব-নিরীখে এখনো কল্পলোকচারী। তাঁর অস্তিত্ব যে ছিল, তিনি যে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে রামায়ণ বর্তমানে তাঁর নামে প্রচলিত তার কতখানি তিনি লিখেছিলেন, সে এক প্রশ্ন। আমরা তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি হিসেবেই গ্রহণ করছি, কারণ আত্মবিবরণী কৃত্তিবাসের রচিত হোক আর না-ই হোক, কৃত্তিবাসের বংশলতিকা এবং কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে আত্মবিবরণীর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী। তদনুযায়ী কৃত্তিবাস খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কোন এক সময়ে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব বিতর্কের পরিবর্তে বাংলা কাব্যধারা কি ভাবে কৃত্তিবাসের দানে বেগবতী হয়েছে সেই দিকটা দেখাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আমরা সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখবো।

মধুসূদন তাঁর একটি সনেটে কৃত্তিবাসকে 'কীর্তিবাস তুমি' বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই শ্রদ্ধা নিবেদন অহেতুক নয়। যুগে যুগে বাঙালীচিত্ত কৃত্তিবাসের কাব্যরসধারায় পরিতৃপ্ত হয়েছে, এই শ্রদ্ধা নিবেদন তারই ফলশ্রুতি। কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য কৃত্তিবাস বাঙালীর মনোভূমিতে চিরস্থায়ী একটি উজ্জ্বল স্থান লাভ করেছেন তার উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে তাঁর রামায়ণের মধ্যে গার্হস্থ্যরূপের একটি স্নিগ্ধ সুন্দর ভাবগভীর এবং সহানুভূতি বিমণ্ডিত সাক্ষ্য বিদ্যমান। কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রতিফলিত দাম্পত্য-প্রেম,

ভ্রাতৃ-প্রেম, ন্যায়বোধ, আদর্শপ্রিয়তা প্রভৃতি বাঙালীর চেতনালোকে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা ভিন্ন এই কাব্যে বাঙালীর জীবনধর্মের স্বচ্ছ সুন্দর পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে বাল্মীকির রামায়ণের ছায়া মাত্র গ্রহণ করেছেন, সেই জন্যই বাল্মীকির অমিত বীর্যশালী, দেবোপম চরিত্র বিশিষ্ট রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের হাতে অবতারত্ব লাভ করেছেন। এখানে মধ্যযুগের একটি স্বভাব-ধর্ম যেমন সক্রিয় ঠিক তেমনি সক্রিয় বাঙালীর বিশ্বাস-ধর্মিতা। যা কিছু মহান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ, বাঙালী তাকেই দেবত্ব মণ্ডিত করতে চায়। এই প্রক্রিয়া ভালো না মন্দ সে বিচারের দায়িত্ব জাতিচরিত্র বিশ্লেষণকারীর, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বাঙালীর ভাবপ্রবণতা, আবেগধর্মিতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার বাঙালী কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে দেবত্বে উন্নীত করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁকে আবার আমাদের ঘরের মানুষেও পরিণত করেছেন। প্রিয়কে দেবতা এবং দেবতাকে প্রিয় করায় বাঙালী ভাব-মানসের একটি স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য আছে। রামায়ণের মধ্যেই, কৃত্তিবাস পরিকল্পিত রামচন্দ্রের মধ্যেই তার রূপ যেন সুন্দর, সার্থক এবং স্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের নায়ক রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু তিনি বাঙালী গৃহস্থের আদর্শ, তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ পত্নী-প্রেমিক, তিনি আদর্শ ভ্রাতৃ-প্রেমিক, তিনি প্রজানুরঞ্জক রাজা। তাঁর শক্তির সীমা নেই, অথচ তিনি অত্যন্ত কোমল, তিনি ইচ্ছা করলেই সুখ ভোগে নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে পারতেন, অথচ তিনি ন্যায়পরায়ণতার জন্য দুঃখের শিখায় দগ্ধ হয়েছেন, তিনি রাজপুত্র, রাজসুখে তাঁর প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য কঠোর দুঃখময় বনবাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন। এমন আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রকে বাঙালী কবির ভাবকল্পনা অবতার হিসেবে গ্রহণ না করে পারে নি, কিন্তু সেখানে আত্মীয়তার একটি নিবিড় বন্ধনও লক্ষ্য করি। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হয়েও বাঙালী হিসেবে চিত্রিত

হয়েছেন। এই খানেই বাঙালী কবির কৃতিত্ব, এই জন্যই কৃত্তিবাস বাঙালীর স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল। তাঁর রামায়ণই বাঙালীর ভাবলোকে রামচন্দ্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে এ কথা প্রবাদতুল্য। রামচন্দ্রের অনুপম চরিত্র ব্যতীত কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতা, লক্ষ্মণ, ভক্ত হনুমান প্রভৃতি চরিত্রগুলিও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং এই সব চরিত্রও বাঙালীর রস পিপাসাকে নিবৃত্ত করেছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে শুধুমাত্র ভক্তির কলকলনাদী প্রবাহ এবং চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যই নেই, এই গ্রন্থে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রতিফলন জীবনরসের সংযোগে যথার্থ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাঙালী ভোজন রসিক, সেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর কাব্যে-সাহিত্যে রসনা-পরিতৃপ্তিকারী ভোজ্য বস্তু সম্ভারের বিপুল তালিকা পরিবেশিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী, কিন্তু কৃত্তিবাস রামায়ণে যে খাদ্যতালিকার উল্লেখ করেছেন তা একান্তই বাঙালীর ঃ

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে ভোকার কৈল বিতরণ॥
শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।
দধিপরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত॥

[উত্তর কাণ্ড]

চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সাম্লী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারকেল পুলি॥
নির্মল কোমল অন্ন যেন যূঁথিফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল॥

অথবা, ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ গাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল লাড়ু॥

কৃত্তিবাসের আয়োজিত খাদ্য সম্ভারে দধি দুগ্ধ, নারিকেল গুবাক, কদলী আম্র পনস স্থান পেয়েছে, এমন কি রোহিত, চিতল প্রভৃতি মাছও মর্যাদার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। ভরদ্বাজের আশ্রমে রামচন্দ্রের কপি সৈন্যদের জন্য যে বিপুল খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন হয়েছিল সেখানে মতিচুর, মোণ্ডা, রসকরা, মনোহরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠে, রুটি, লুচি, খুরসা, কচুরী, ক্ষীর, ক্ষীরসা, ক্ষীর লাড়ু, মুগের সাউলি, অমৃতা, চিতুই পুলি, নারিকেল পুলি, কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া, ছানা ভাজা, খাজা, গজা, জিলাপি, পাঁপড়, অন্ন, পায়েস, পিষ্টক প্রভৃতির বিপুল সংগ্রহ ছিল। বাঙালীর ভোজন রসিকতার যে পরিচয় পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, অবহট্টে রচিত টুকরা পদে যার পরিচয় পরিস্ফুট, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বাঙালী জীবনের উপাদানকেই শিল্পরূপ দান করেছেন। এই জন্যই তাঁর রচিত সীতা মুনিপত্নীদের কাছে রামচন্দ্রের পরিচয় উদঘাটিত করার জন্য :

লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥

—সীতার এই ভঙ্গি বাঙালী বধূর লাজবিনম্র ভাবটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সব ভিন্ন কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে জন্ম সংস্কার, ঘরোয়াজীবন প্রভৃতির যে রূপ অঙ্কন করেছেন তা একান্তভাবে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবির ভৌগোলিক জ্ঞানও কেবলমাত্র পুর্বভারতকে কেন্দ্র করেই সীমিত। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে রামচন্দ্রকে অনিতবার্যসম্পন্ন হিসেবে চিত্রিত করেননি সত্য, তাঁর রামচন্দ্র অত্যন্ত কোমল স্বভাবযুক্ত, হয়ত বা এই অতিকোমলতা নারীসুলভ,

কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁর হৃদয়ের ভক্তিরসধারায় রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছেন বলেই রামচন্দ্র ভক্তচিত্তের অশেষ শ্রদ্ধার্ঘ লাভ করেছেন। এই ভক্তিস্রোত একান্ত বাঙালী-ধর্মী। কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ যেন বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। এইজন্যই কবি নিঃসংশয়ে প্রচার করেছেন :

রামনাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসারে তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা॥
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়॥

কবির ভক্তি-ধর্ম এতই প্রবল যে কবি একবার রাম নাম উচ্চারণেই সর্বপাপনাশের কথা বলেছেন :

এক রাম নামে কোটি ব্রহ্ম হত্যা হরে।

কবির এই ভক্তি প্রাবল্য বাংলাদেশের সরস মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত হয়েই সতেজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এখানে কবি বাঙালী-স্বভাবের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এই জন্যই বাঙালী কবির সৃষ্টিতে বাল্মীকির পুরুষোত্তম রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতারে পরিণত হয়েছেন।

বাংলাদেশ চিরদিনই রঙ্গে ভরা। বাঙালীর কথায় বার্তায় হাস্যপরিহাসের ছোঁয়া লেগেই থাকে। অবশ্য যুগ ভেদে এই হাস্য পরিহাসের রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে প্রচলিত হাস্যরসধারার একটি সার্থক পরিচয় লাভ করা যায়। আধুনিক রুচিতে এই হাস্যপরিহাস গ্রাম্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেই হাস্যরসধারার মধ্যে যে বাঙালীর একটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়েছে একথা না মেনে উপায় নেই। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত হাস্যরস আধুনিক বাঙালীর রসবোধকে যদি নিয়ন্ত্রিত না করতো তা হলে বাংলাদেশে মধ্যযুগের ধারায় বয়ে আসা হাস্যপরিহাস রীতিই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতো। এখানে কৃত্তিবাসের রামায়ণে পরিবেশিত হাস্যরসের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

(ক) **হরধনু উত্তোলনে ব্যর্থ, জনকরাজার সভায় বিড়ম্বিত রাবণের হাস্যকর অথচ স্পষ্ট রূপ ঃ**

কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥

(খ) **সুন্দর কাণ্ডে দেখা যায় যে রাবণের অনুচর রাক্ষসগণ হনুমানকে বেঁধে ফেলে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং হনুমান এই অপূর্ব সুযোগ হারালো না ঃ**

মনে মনে হাসে তবে পবন কুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে ॥

এই বিসদৃশ অবস্থায় রাক্ষসরা হনুমানকে ফেলে পালালো, যাতে ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াতে না পারে। তখন বন্দী হনুমানকে দেখে রাক্ষসীরা রসিকতা আরম্ভ করলে হনুমানও তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে ঃ

পরম কুলীন আমি মৌলিক রাবণ।
কুলীনে মৌলিকে বিভা কিবা সুশোভন ॥
রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী।
সুন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী ॥
ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর।
আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর ॥
প্রমীলা শালাজ পাব পরম রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবা নিশি ॥
কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর।
ইহা জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর ॥

আশা করা যায় হনুমানের এই জবাবে রাক্ষসীরা মুখে কাপড় চেপে পালাতে পথ পায় নি।

(গ) উত্তরাকাণ্ডে লক্ষ্মণ সীতাকে নির্বাসন দণ্ড জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন, সীতা এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, তিনি দীর্ঘদিন পরে স্নেহের দেবরকে দেখে পরিহাস রসিকতায় রত হলেন ঃ

আইস দেবর আজি বড় শুভ দিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ॥
চৌদ্দ বৎসর একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সে কারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয় ॥
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে ॥
তোমা না দেখিয়া মম সদা পোড়ে মন।
উত্তর না দেন কেন বিরস বদন ॥

এই হাস্য পরিহাস একেবারে বাঙালী ঘরের। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা যায়, আগামী সঙ্কটের প্রাক্‌মুহূর্তে এই হাস্য পরিহাসের অবতারণা করে কবি তাঁর শিল্পজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন। এই রসিকতার লঘুতার পরেই নির্বাসনদণ্ড যেন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই অনিবার্যভাবে পাঠক চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে।

রামায়ণে হাস্যপরিহাস ভিড় জমিয়েছে 'অঙ্গদের রায়বার' অংশটিতে। এই অংশটি আদৌ কৃত্তিবাসের লেখা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এই অংশের হাস্যরস মূলতঃ গ্রাম্য, এখানে যেন অঙ্গদ রাবণসভায় প্রবল প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করার জন্যে মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তবে হাস্যরসিকতায় যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিমেয় তা এই অংশে যথার্থই প্রতীয়মান হয়েছে। এখানে দর্শক-মাতানো কবির লড়াই-এর একটি রূপ পরিবেশিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস একান্তই বাঙালী কবি, তাঁর রামায়ণও তাই বাঙালীর রামায়ণ ; বাল্মীকির রামায়ণের বিশালতা ও গাম্ভীর্য, ব্যাপ্তি ও ঔদার্য কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে যা আছে তার মূল্য বাঙালীর কাছে অপরিসীম। এই কাব্যের বিষয়, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার সমস্তই বাঙালীর কাব্য সাধনার ফলশ্রুতি। কবি

কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যখ্যাতি যথেষ্ট, তাঁর কাব্যে সেইজন্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের এক অপূর্ব রাখীবন্ধন রচিত হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুকে সংস্কৃত ও দেশীয় অলঙ্কার দ্বারা পরিমণ্ডিত করে সর্বসাধারণের বোধের উপযুক্ত করে তুলেছেন। কৃত্তিবাসের অলঙ্কার প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হলো :

১। চরণে নূপুর বাজে রুণুঝুণ শুনি।
নীল পদ্মকোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥
২। তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
৩। বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।
৪। ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে।
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায় ॥
৫। কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে।
৬। কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥

কৃত্তিবাস ব্যবহৃত এই সব অলঙ্কার বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনচিত্রের ভিত্তিতেই সৃষ্ট। কবি এই অলঙ্কার প্রকরণকে সংস্কৃত কাব্যরীতির সঙ্গে নিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। এতে তাঁর রচনাদক্ষতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে কল্পনা-সামর্থ্যের যে পরিচয় আছে তা থেকে সহজেই মনে হয় যে কবি আপন গৃহসীমা এবং ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁর কাব্যের নৈসর্গিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, ভাবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশকালের আদর্শ চেতনার সাহায্যে, চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ভাবাদর্শের সহায়তায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে। কবির কল্পনা, যুদ্ধ, সমুদ্র-নীলাম্বুরাশির উন্মত্ত উচ্ছলতা, দণ্ডকারণ্যের অরণ্যগভীর স্তব্ধতায় বিধৃত নয়, কবির কল্পনা যেন বাঙালীর আট-চালা ও পাঁচিলের আবেষ্টনীতে সীমিত। কিন্তু এই সীমিত কল্পনা বাঙালীর স্বভাব-চেতনাকেই শিল্পরূপ দিয়েছে। বাংলা দেশের আকাশ বাতাস, খালবিল, নদনদী, বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের

প্রভূত সঞ্চয়, বাঙালীর প্রাণরসধারার বিশিষ্ট সুর কৃত্তিবাসের কল্পনা স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে তাঁর রচিত রামায়ণে স্থান লাভ করেছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ যুগ যুগ ধরে বাঙালীর রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেছে, তার কারণস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে যে গ্রন্থখানিতে বাঙালীর আদর্শ চেতনা বহুল পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই সঙ্গে অন্য একটি দিকেও আমাদের দৃষ্টি না পড়ে পারে না। কৃত্তিবাসের সহজ সরল রসসমুজ্জ্বল ভাষা তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর পয়ার লাচাড়ী ছন্দ, তাঁর কাব্যের বিষয়কে অনায়াসে বহন করেছে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে জনমানসে অনুপ্রবেশ করেছে। অবশ্য মধ্যযুগের বাঙালী কবিমাত্রই ছন্দের এই সহজ প্রকরণকে গ্রহণ করেছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক-আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' এই মন্তব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্তর্রূপকেই পরিস্ফুট করেছে। বাল্মীকির মহাকাব্যের রূপ ও রস কৃত্তিবাস অটুট রাখেন নি সত্য, তবে তিনি যে বাংলাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনা দান করেছেন এ কথা অধিকতর সত্য। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারা প্রাদেশিক সাহিত্যের গণ্ডীতে মহাকবি বাল্মীকির সৃষ্টিকে নবরূপ ও সৌন্দর্য দান করেছেন।

কবি কৃত্তিবাসের আলোচনা সূত্রেই বাংলা কাব্যধারার অন্য একজন কবির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তিনি হলেন গুণরাজ উপাধিক মালাধর বসু। বর্তমানে এই কবি শুধুমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসের গৃহকোণে আশ্রয়লাভ করেছেন। অথচ একাদন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাব্য সমাদরের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, বিভিন্ন বৈষ্ণব কবি তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, মধ্যযুগের বৈষ্ণবসমাজে তাঁর কাব্য সশ্রদ্ধ আসন লাভ করেছিল। তাঁর কাব্যের পুঁথির একাধিক অনুলিপি কাব্যখানির জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্যবাহী।

মালাধর বসুর কাব্যখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। এই কাব্য কোন কোন ক্ষেত্রে গোবিন্দবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল নামেও উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচ ছয় বছর আগে এই কাব্য সম্পূর্ণ হয় :

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

অবশ্য কালজ্ঞাপক এই পংক্তিদ্বয়ের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সমস্ত সন্দেহেব অবকাশ সত্ত্বেও বলা যেতে পাবে যে গ্রন্থখানি উক্ত কালের অতি নিকটবর্তী সীমায় রচিত হয়েছিল। এই অভিমতকে গ্রহণ করলে বলতে হয় যে খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে কবিব জন্ম হয়েছিল। আমরা গ্রন্থখানিকে পঞ্চদশ শতাব্দীব রচনা হিসেবে গ্রহণ করেই এর পরিচয় বিবৃত করবো।

কবি মালাধর বসু কুলীনগ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রাম সম্পর্কে মহাপ্রভু বলেছেন :

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুব।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদূব॥

মহাপ্রভুর কাছে কুলীন গ্রামের এত সমাদর শুধুমাত্র কবি মালাধরের জন্য। এই কবিকে 'গৌড়েশ্বব দিলা নাম গুণরাজ খান'। কিন্তু কোন্ গৌড়েশ্বব কবিকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। কবি এই উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। মালাধর বসুও অনুবাদকেব কাজই করেছেন :

ভাগবত অর্থ যত পয়ার বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাহি॥
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর॥
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥

গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে লোকহিতের উদ্দেশ্য নিয়ে কবি অনুবাদে মনোনিবেশ করেছিলেন। কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্রের ওপর নির্ভর করে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, অবশ্য কাব্যে বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনীর ছায়াপাতও ঘটেছে। তৎকালে দেশে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণ কথা বেশ প্রচার লাভ করেছিল। তৎকালীন দিনে কথক, পাঁচালীকার এবং গায়কগণ বিভিন্ন পুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে লোক-সমাজে প্রচার করতেন। কবি সম্ভবতঃ এ গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এই সূত্রেই সম্ভবতঃ তিনি পাঁচালী শ্রেণীর কাহিনা রচনায় উদ্যোগী হন :

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥

এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে কবি বোধ হয় সংস্কৃত জানতেন না, কিন্তু তা সত্য নয়। কবির শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্য পাঁচালী আকারে রচিত হলেও এ কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ। অবশ্য সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে এই অনুবাদকে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত স্বাধীন ও ভাবাশ্রয়ী অনুবাদই বলা উচিত। কবি এই কাব্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলাই প্র-টিত করেছেন। কাব্যখানির বৃন্দাবনলীলায় আদিরসের প্রাধান্য আছে—এই অংশে রাধাকৃষ্ণের রাস, নৌকালীলা, দানলীলা প্রভৃতি আছে। এই অংশটি বাদে কাব্যের বাকি অংশদ্বয়ে কৃষ্ণের বীরত্বই পরিস্ফুট হয়েছে। সামগ্রিক-ভাবে বিচাব করলে কাব্যখানিকে [illegible]রসাত্মক বলা ভুল হবে না। অবশ্য 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' পংক্তিটি মহাপ্রভুর ভাবকে উদ্দীপ্ত করেছিল বলে মহাপ্রভু এই অনুযায়ীই কাব্যখানি গ্রহণ করেছিলেন এবং চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে এই ভাবেই কাব্যখানি প্রচার লাভ করেছিল।

কবি ভাগবত পুরাণের সমস্ত কাহিনী গ্রহণ করেন নি। কাব্য-খানিকে সমৃদ্ধ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ভাগবত থেকে কবি ততটুকু কাহিনীই নিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনার গুণে এই কাব্য মহাকাব্যের নীতি নির্দেশ অনুসরণ করেছে। মনে হয় কবি শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়কাব্যের রূপ দিতে গিয়ে মহাকাব্যের অনুরূপ আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত একটি সর্বাবয়বযুক্ত কাহিনী গঠন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্যের আদি কাহিনী কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা গমন পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যকাহিনী মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকা গমনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্তকাহিনী আত্মীয় স্বজন নিয়ে কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা, দ্বারকা ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। কাহিনীর উপাদান সংগ্রহে কবি নিষ্ঠাভরে ভাগবতের অনুসরণ করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে মধ্যযুগের কোন কবিই মূলানুসরণে এত নিষ্ঠা দেখান নি। তাই তাঁর কাব্য স্বাধীন অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাব-কল্পনা-বিকাশের আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে নি। এইখানেই কৃত্তিবাসের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানি বর্ণনাময় গেয়-কাব্য। এই কাব্যে বিবিধ রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের সঙ্গীত প্রবাহের ইতিহাস জানার পক্ষে সেগুলি মূল্যবান। কাব্যখানি বর্ণনাময় হলেও কবি যেন কবিত্ব প্রকাশের কোন সুযোগই গ্রহণ করেন নি। মনে হয় যেন কবি ভাগবতের কাহিনীকে তাঁর শান্তরসাশ্রিত চিত্তে গ্রহণ করে তাকে বাংলায় রূপান্তরিত করতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেই কবির বর্ণনা শক্তির, রসবোধের এবং ভাবানুভূতির পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে মালাধরের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেওয়া যাক ঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা ঃ

বিকচ কুসুম পদ্ম সুগন্ধি বহুলে।
নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে ॥

তার মাঝে বসি সব রাজ হংস মেলা।
ভুঞ্জিয়া মৃণাল দণ্ড করে নানা খেলা॥

বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা :

তুলসী মালতী জাতি আমলকী কুরুজ্জতি
কুব্বক চাঁপা নাগেশ্বর।
আওলা বকুল মালি মধুকর করে কোল
গন্ধঝিঁটি কেতকী কেসর॥
অসোক·বাসক কিয়া কিস্তুক রাঙ্গন চুয়া
সেফালিকা বৃক্ষের উপর।
অসোক পাকুড়ি তাল নারিকেল তমাল
রামগুয়া দেখিতে সুন্দর॥

... ...

নানা বর্ন্নে বৃক্ষলতা কড়িলু মাধবীলতা
নানা পক্ষ নাদ মনোহর।
সারি শুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে
নানা জন্তু দেখিতে সুন্দর॥

... ...

কবি এইভাবে নানা বৃক্ষলতার, পুষ্পপল্লবের এবং জীবজন্তুর সমাবেশে বৃন্দাবনকে মনোহর করে তুলেছেন। তবে এ কথাও সত্য যে এই বর্ণনায় গতানুগতিক রীতিই অবলম্বিত হয়েছে, কবি এই প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি।

অরিষ্টাসুরকে কেন্দ্র করে কবি ভয়ঙ্কর রসের সৃষ্টি করেছেন :

পাত্র পাত্র ভূঞিকম্প অরিষ্ট গমনে।
ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গে অঙ্গর হেলনে॥
অতি ভয়ঙ্কর রূপ আইসে গোকুলে।
দেখিয়াত ত্রাস পাইল সকল গোওালে॥
বিপরিত রাউ কাড়ে সিয়রে দুই কান।
তার ডাকে ত্রাসে গরু ছড়িএ পরাণ॥

দ্বাদশবর্ষের কিশোর কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবি যেন তাঁর প্রাণরসকে উজাড় করে দিয়েছেন :

হেন কালে হৈল কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর।
সর্বাঙ্গ স্নুন্দর রূপ অতি মনোহর॥
পুর্ন্নিমার চাঁদ জিনি বদন কমল।
খঞ্জন জিনিঞা সোভে নয়ান জুগল॥
হিরামন মাণিক্য সোভে কর্ন্নের কুণ্ডল।
মউরের পুৎস সোভে কুটিল কুন্তল॥
নানা বন্নের পুষ্পমালা হৃদয় উপরে।
স্নুবন্ন অঙ্গুরি সোভে বলয়া দুই করে॥
পাএতে নুপুর সাজে শ্রীবৎসাদি পতি।
কটিতে কীঙ্কিনি বাজে চলে মন্দ গতি॥
নর্ত্তকের বেস ধরে মুকুট সোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগন্নাথে॥
পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালী।
নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।
তার মাঝে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া জুবতিগণ স্থির নহে মন॥

কবির অন্তঃস্থিত রসস্পর্শে কিশোর কৃষ্ণ অপরূপ রূপ-সৌন্দর্যে, অম্লান লালিত্যে বিমণ্ডিত হয়েছে। গীতিময়তার স্পর্শে এই বর্ণনা উদ্দীপ্ত, কান্তিময়।

রাসবর্ণনার প্রাক্কালে কবি রীতিমত একটি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই পরিবেশে কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের আর্তির মর্মস্পর্শী ভাব রূপায়িত করেছেন। বৃন্দাবনে বংশীবাদন-রত কৃষ্ণের পাশে গোপীগণ 'কৃষ্ণ বেড়ি দণ্ডাইল মণ্ডল করিয়া।' কিন্তু কৃষ্ণ এই নারীদের মনোভাব জানবার জন্যই বোধ হয় বললেন :

রাত্রিকালে ঘোরতর কানন ভিতরে।
সিবা সত সঙ্কট গহন গভিরে ॥
স্বামি এড়ি নারি আইলে কেমন সাহসে।
এতরাত্রে বৃন্দাবন কাহার উদ্দেশে ॥

....

এড়িয়াত স্বামি পুত্র তেজি বন্ধুজন।
আমার ঠাঞি গোপবধু আইলা কি কারণ ॥
ঝাঁট করি চল গোপি আপন ভবনে।
স্বামির সেবা কর গিয়া পুত্রের পালনে ॥

কৃষ্ণের এই নির্দয় উক্তি গোপীদের হৃদয়ে যেন শতবজ্র আঘাতে প্রবেশ করেছে, অথচ এই বিদার্ণরূপকে কবি অত্যন্ত সংহতভাবে এবং গভীর ভাবব্যঞ্জনায় পূর্ণ করে প্রকাশ করেছেন :

এতেক বিপ্রীয় জনে গোবিন্দ বলিল।
হেট মাথা করি গোপি কান্দিতে লাগিল ॥
স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে ॥
কি করিব কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিরি ॥

... ...

ছাড়িয়াত স্বামি পুত্র তেজি বন্ধুজন।
তোমাকে দেখিতে প্রাণ জাউক এখন ॥
ছাড়ে ছাড়ুক স্বামি তাবে নাহি যেথা।
তোমার বিপ্রিয় বোল শুনিমন কথা ॥
কি লাগি নিঠুর এত বল চক্রপাণি।
তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরাণি ॥
জন্মে জন্মে পাই জেন তোমার চরণ।
তুমি স্বামি তুমি পুত্র তুমি বন্ধুজন ॥

গোপীদের এই কাতরতায় কৃষ্ণের মন দ্রব হলো, তিনি তাদের সঙ্গে রাসবিলাসে সম্মত হলেন ঃ

রমণি মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ণ।
রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন॥

এর পর আদিরসের প্রবাহ বয়েছে কূলপ্লাবী হয়ে, একদিকে 'রসিক নাগর কৃষ্ণ' অন্যদিকে 'বড় বিদগদ সেই সব নারি', 'রসের চাতুরিতে' বৃন্দাবনের সেই রাত্রি 'ব্রহ্মরাত্'তে পরিণত হলো। এর পরেই কৃষ্ণ গোপীদের ছলনা করে দূরে চলে গেছেন, শুরু হয়েছে বিরহযন্ত্রণা, গোপীরা বৃন্দাবনের দিকে দিকে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, তাদের বেশ বাস অবিন্যস্ত, দুনয়ন অশ্রুস্রোতে প্লাবিত ঃ

আর কথো দুরে দেখিল কদম্ব তরুবর।
তোমার তলায় সদাই থাকে দামোদর॥
গলায় তোমার মালা মাথায় মউর পাখা।
কালা মেঘে চিকুর জেন আকাসেতে দেয় দেখা॥
হেন প্রাণনাথ মোর কোন দিসে গেল।
অভাগিনি নারি আনি গোসাঞি বঞ্চিল॥
কে নে বা উদ্দেস না বল তরুবর।
বিরহ সন্তাপে পোড়ে মোর কলেবর॥

গোপীদের এই বিরহ-সন্তাপ কাব্যখানির রসগৌরব বৃদ্ধি করেছে, কবির মানসিক রূপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ বিধৃত হয়েছে সত্য কিন্তু বৃন্দাবনলীলার রাস পরিবেশে কবি মধুররসপ্রিয় বাঙালীর মনোধর্মের কাছে আপন অজ্ঞাতেই আত্মসমর্পণ করেছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানিতে বৃন্দাবনলীলাই রসসমুজ্জ্বল, মথুরা লীলা এবং দ্বাপর লীলা পাঠকের কাছে এক ঘেয়ে বলেই মনে হবে। অবশ্য ভক্ত পাঠকের কথা স্বতন্ত্র। শেষের লীলাদুটিতে যেন মালাধর বসুর কবিপ্রতিভা ম্লান, অস্তায়মান।

মালাধরের কবিত্বশক্তি সীমিত, কবি ছন্দের ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে

নিপুণ রচনা কৌশল দেখাতে পারেন নি। তবে তাঁর অলঙ্কারপ্রয়োগ কিছু পরিমাণে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে ঃ

১। চিয়াইয়া জসোদা পুত্র দেখি পাশে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন উদয় আকাসে॥

২। পিতবস্ত্র পবিধান দেব বনমালি।
নুতন মেঘেতে জেন্ন পড়িছে বিজুরি॥

৩। পুতনার বর্ণনায় ঃ
লাঙ্গলেব ইস জেন দন্ত সাবি সাবি।
গিরি সম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি॥

৪। রুক্মিণীপ্রসঙ্গে ঃ
অচেতন হৈয়া দেবি পৃথুবিতে পড়ে।
কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে॥

কবিব কাব্যে মানবিকতাব রূপও বেশ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, অবশ্য এই রূপ-পবিস্ফুটনাব অবকাশ বড কম। বালক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে মাতা যশোদার এবং প্রেমিক কৃষ্ণকে কেন্দ্র কবে গোপীদের যে হৃদয়ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে তাব মধ্যে কবি মানবপ্রীতির সুরটি ধ্বনিত করে তুলেছেন।

তবে আসি জসোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি॥
কেমতে পাসবিলে বাপ সেই বৃন্দাবন।
কেমতে পাসবিলে তুমি গোপগুপিগণ॥
কেমতে পাসরিলে তুমি গোকল নগরী।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিবি॥
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আমা দুইজনা॥

মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনা শেষের পংক্তিতে সরল অনাড়ম্বর রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। কবি কোন কৌশল অবলম্বন করেন নি, কিন্তু অনায়াসেই যশোদার উক্তি পাঠক হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি অধিকার

করে বসে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্বে গোপীদের মর্মান্তিক হাহাকার, আসন্ন বিরহের দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত বেদনা যে ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে তাতেও কবির গভীর ভাবদক্ষতার সার্থক পরিচয় মেলে ঃ

আর না জাইব সখি চিন্তামনি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না কবিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥
আব না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণেব সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অল্প ধনলোভ লোক এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

এই আর্তির মধ্যে সংযত অথচ স্পষ্টভাবে হৃদয়ের অতলান্ত বিরহবোধ রূপ লাভ কবেছে। কবি তাঁব রচনায় এমন মানবীয় ভাব প্রকাশের সুযোগ অনেক পেয়েছেন, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই তা যে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এমন নয়। তাব কাব্যধারায় মানবীয় ভাব-রূপ ফল্গু স্রোতের মত প্রবাহিত হয়েছে, মাঝে মাঝে সেই স্রোত উচ্চকিত ঊর্মিশোভায় বিকশিত হয়ে ভাব-সৌন্দর্যের চমৎকারিত্ব দেখিয়েছে।

পরিশেষে মালাধব বসুর ভক্তিপরিপ্লুত ভাবানুভূতির কথা আলোচনা করতে হয়। কবি তাঁব কাব্যে মধুব রস অপেক্ষা বীর-রসকেই অগ্রাধিকাব দিয়েছেন; তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবিলাসী অপেক্ষা কালীয়দমনকারী, গিরি গোবর্ধনধারী, কংসবিনাশী হিসেবেই প্রাধান্য লাভ করেছেন। কবি তাঁর রত্নহৃদয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপের আরতি করেছেন। তাঁর এই ভক্তিশিখার আলোকেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব সমাজের প্রধান গ্রন্থ ভাগবতের দীপ্তি

বিচ্ছুরিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের মধ্যে বাংলাদেশে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবতার স্রোতটি কি ভাবে বয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির চেতনালোকে রাগানুগা ভক্তি নয়, ঐশ্বর্য-জ্ঞানাশ্রিত ভক্তিভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই ভক্তি দর্শনগত দিক থেকে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করেছে। কবির এই ভক্তিবাদ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাংলাদেশে কি ধরনের বৈষ্ণবতা প্রচলিত ছিল তার স্বরূপ অভিব্যক্ত করে। মালাধর সৃষ্ট ঐশ্বর্যগুণমণ্ডিত কৃষ্ণের স্বপক্ষে কেউ কেউ বলেন যে, তুর্কী আক্রমণে বিহ্বল বাংলাদেশ এক বীর্যবান, পৌরুষপূর্ণ দেবতার দাক্ষিণ্য কামনা করেছিল, মালাধরের কৃষ্ণ সেই বাঞ্ছা মিটিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করা যায় না। আসলে মালাধর ভাগবতের অনুসরণেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, সুতরাং ভাগবতের কৃষ্ণই তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই জন্যই মালাধরের ভক্তিবাদের মধ্যে ভাগবতের বৈধী-ভক্তিকে সক্রিয় দেখা যায় ঃ

কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন একমনে।
কলিঘোর তিমির করিতে বিমোচনে॥
হেন কথা শুনিবারে না করিহ হেলা।
ভব সিন্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা॥

এই ভক্তি, শাস্ত্রের নি[illegible]শই প্রকাশিত হয়েছে, এই ভক্তিতে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই কাব্যের উপসংহার থেকে কবির আন্তরিকতা ও সরল ভক্তিভাব, ভাবুকতা ও স্নিগ্ধ ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোসাঞি রণ তনু ধরি॥
গোসাঞির তনু চিন্তি পা[illegible] ব্রহ্ম জ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে॥
সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥

নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে ॥
কর্ণধাব বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায় ॥
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমল লোচন ॥

উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে ভারতীয় দর্শনের, ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সার কথা সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবির গভীর প্রত্যয়বোধ এবং উপলব্ধিব জন্যই এমনটা সম্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই মহাপ্রভু গ্রন্থখানির গৌরব জ্ঞাপন করেছেন, এইজন্যই মহাপ্রভুর কাছে কুলীন গ্রাম প্রাতঃস্মরণীয়।

ত্রয়োদশ শতকের বাংলা দেশ তুর্কী আক্রমণের ঝঞ্চাবাতে অব্যবস্থিত হয়ে পড়েছিল। ক্রমে বাঙালী সমাজ এই প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষা করে এবং তার অধিমানসিক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু হয়। চৈতন্যদেবের জন্মের পরে হুসেনশাহী আমলেই বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিবে এসেছে, বাংলার আকাশ বাতাস আবার মধুক্ষরা হয়েছে, বাঙালী আবার আত্মস্থ হয়ে শিল্প সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বাঙালী যে নিষ্ক্রিয় ছিল না তাব প্রমাণ আমরা তার সাহিত্য-সম্ভাব থেকে পেয়েছি। এই সময়েব মধ্যে আমবা বাংলা কাব্যধারায় বড়ু চণ্ডীদাসেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিদ্যাপতির 'পদাবলী', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' এবং মালাধর বসুব 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য পেয়েছি। এই কাব্য-সম্ভারের একদিকে বাংলাদেশের ধাতুপ্রকৃতি কামনা বাসনাময় জীবনকে ভিত্তি কবে প্রকাশিত হয়েছে, অন্য দিকে সম্ভবতঃ ইসলাম আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে পুরাণ-কেন্দ্রিক, স্মৃতি-শাসিত চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু অন্য এক স্বতন্ত্র জাতের কাব্য-

স্রোত এই সময় থেকেই বাংলা কাব্য ধারায় উজান বইতে শুরু করেছে। এই কাব্যস্রোতকে বলা হয় 'মঙ্গলকাব্য'।

মঙ্গলকাব্য বাঙালী সমাজ মানসের পূর্ণাঙ্গ দর্পণ। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলাদেশে যে সমাজ-সংহৃতি সংঘটিত হয়েছিল, যে ভাব-সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলাদেশের মৃত্তিকা উপাদানের সঙ্গে পৌরাণিক ও শাস্ত্রানুগ বোধবুদ্ধির যে মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এই মিশ্রণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বাংলা কাব্যধারায় যে প্রবল উচ্ছ্বাসময়, প্রচণ্ড বেগ সমন্বিত বন্যা প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য তারই সার্থক সাক্ষ্যবাহী। দেশ-প্রকৃতির এবং জন-প্রকৃতির এমন যথার্থ পরিচয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যশাখা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এই কাব্যশাখার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি বাংলা কাব্যের ইতিহাসের অজস্র সম্পদকে আপন বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। এই কাব্যশাখার আবার কয়েকটি উপশাখা বর্তমান, এগুলি লেখা হয়েছে প্রায় চারশো বছর ধরে, সমগ্র কাব্যশাখার কবিরা ছড়িয়ে রয়েছেন বাংলা দেশের সমগ্র অঞ্চলে। এই কাব্যশাখার কাহিনী-ধারার একদিকে রয়েছে বাংলাদেশের লৌকিক জীবনযাত্রার রূপ, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের শিল্পগত পরিণতি এবং অন্যদিকে রয়েছে সংস্কৃত ভাবাদর্শের, কাব্যরীতির এবং পৌরাণিক চেতনার অনুসৃতি। বিষয়গত দিক থেকে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয় এবং সংস্কৃত ধারায় আগত বিষয় মঙ্গল কাব্য শাখায় একত্রিত হয়েছে।

দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। তবে এই কাব্যশাখার দেবতারা কোনক্রমেই বৈদিক দেবতার স্বগোত্রীয় নন, পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের আপাত-দৃষ্টিতে যোগসূত্র থাকলেও তাঁরা পৌরাণিক দেবতার মহিমা এবং সমুন্নতি লাভ করেন নি। মঙ্গলকাব্যের দেবতা মুখ্যতঃ বাংলার মাটি দিয়েই গঠিত, তাই এই কাব্যের দেবকুল বিশেষভাবে মানব-স্বভাব যুক্ত। আপন শক্তি এবং দম্ভ প্রকাশে দেবতার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা

নেই। এই কাব্যশাখার দেবতা বর দেওয়ার জন্য যেন হাত বাড়িয়েই আছেন, তবে সেখানে একটি শর্ত আছে, দেবতা যদি ভক্তের পূজা কড়ায় গণ্ডায় পান তবেই তিনি বর দেন, না হলে দেবতার প্রতিকূলতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। মূলতঃ মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবতা, পরবর্তীকালে ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করেছেন। অবশ্য মঙ্গলকাব্য বললে সাধারণতঃ মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গলের জগৎকেই বিশেষভাবে বোঝায়।

মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের পরিচয় বিচিত্র, কৌতূহলপ্রদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়কর। তাঁদের ঠিকুজি কোষ্ঠী বিচার কালে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে তাঁরা বাংলাদেশের লোকসমাজেই সযত্নে পরিবর্ধিত। ব্রাহ্মণ্যধর্মসংস্কৃতির অনুমোদন তাঁরা লাভ করেছেন বটে কিন্তু কোনক্রমেই কৌলীন্য অর্জন করতে পরেন নি। কবিরা অবশ্য এই দেবতাদের দেবভূমি স্বর্গে নির্দিষ্ট আসন দিয়েছেন, কিন্তু পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতার সঙ্গে তুলনায় মঙ্গলকাব্যের দেবতা যে নিতান্ত বেমানান সে কথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। মনসামঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা সর্পদেবতা। সর্পদেবতার উল্লেখ বেদে আছে, পুরাণে আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, কিন্তু মনসা মঙ্গলকাব্যের দেবী যেন আপনাতে আপনি বিকশিতা। তাঁর দাপট সাংঘাতিক এবং সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে তা হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি খুশি হলে সুখে সম্পদে, ঐশ্বর্যে প্রতিপত্তিতে ভক্ত ফেঁপে ওঠে, আর তাঁর কোপদৃষ্টিতে রাজার ঐশ্বর্য মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। চণ্ডী-মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী মূলতঃ বনপশু পালিকা দেবী, এই দেবীর গায়ে কবিরা পুরাণের চণ্ডীর রং ধরিয়েছেন তাই এই দেবী কিছুটা শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট, তবে এঁর-ও খামখেয়াল যথেষ্ট। ইনিও পুজো পেলে সুখদা বরদা মূর্তি ধারণ করেন এবং না পেলে প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠেন। ধর্মঠাকুর ধর্মমঙ্গলের দেবতা, এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ যে কি তা এখনও পণ্ডিত গবেষকদের আলোচ্য বিষয়। এক কথায়

বলতে গেলে বলতে হয় যে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের স্বরূপ নির্ধারণ করা বড় কঠিন; সাধারণতঃ দেবতার যে আদর্শ প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতার মিল নেই। মঙ্গলকাব্যের দেবতা জোর করে, ছলে বলে কৌশলে আপনার আসন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ভক্তের পূজা লাভ করেছেন। তাঁদের এই পূজালাভ কি করে সম্ভব হল তার অবশ্য যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আছে।

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবতারা মেয়েলী ছড়ায়, ব্রত কথায় বা পাঁচালীতে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সংস্কৃতির বাইরে অবস্থিত লোক সমাজেই আবদ্ধ ছিল। তুর্কী আক্রমণের সময় বিজয়ী জাতির ধর্ম, ইসলাম, হিন্দুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা আত্মরক্ষার তাগিদে বর্ণ-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই সূত্রেই লৌকিক সমাজের দেবতারা পূজা লাভের সুযোগ পান। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে রীতিমত সাহিত্য সৃষ্টি হয়, মঙ্গলকাব্য স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে। ব্রতকথা ও পাঁচালীর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে এই ভাবে এক জাতের দেবতা ও তৎসম্পর্কিত কাহিনী শিল্পসম্মত কাব্যরূপ লাভের অনুকূলতা পায়। এই প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য: 'পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পক্ষে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য, তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লী সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস।' অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলির শিল্পসম্মত কাব্যরূপের অন্তরালে যুগযুগান্তের জাতীয় ঐতিহ্য রয়েছে, আদিম মানবজাতির ধর্মবোধের পরিচয় এই ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। মনসা, চণ্ডী, দক্ষিণরায় জাতীয় দেবতাকে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়ার পেছনে

রয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতা। সাপের ভয়, বাঘের ভয় ইত্যাদি অশিক্ষিত, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন কৃষক সমাজে ও স্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। এই ত্রাসের পথেই দেবতার আবির্ভাব এবং এই ভাবেই ছোট ছোট পল্লীসাহিত্য কালানুকূল্যে শিল্পরূপবিমণ্ডিত কাব্যদেহ লাভ করেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মানব জীবনধারার অখণ্ড পরিপূর্ণ একটি রূপও কাব্যগুলিতে সসম্মান আসন লাভ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে মঙ্গলকাব্যের মূল বক্তব্য হিসেবে আমরা দেবতার লীলা এবং নরলীলাকেই পাই। মঙ্গলকাব্যের কবি এই দুই লীলার মধ্যে নিপুণ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন, তাঁদের এই নৈপুণ্যের জন্যই স্বর্গ ও মর্ত একটি সুদৃঢ় সেতুবন্ধের সাহায্যে সংযোজিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের স্বর্গ সুদূর অন্তরীক্ষস্থিত ভাব-কল্পনার কোন রহস্যময় লোকে অবস্থিত নয়, সে স্বর্গ যেন কোন গৃহেরই দ্বিতল মাত্র। দ্বিতলে স্থিত স্বর্গের সঙ্গে একতলার মর্তের যোগাযোগ ঘটছে অহরহ। মঙ্গলকাব্যের কবির কল্পনা মর্তলোকে স্বর্গের ধোপানিকে নিয়ে এসেছে, স্বর্গলোকে নিয়ে গেছে মর্ত দুহিতাকে, স্বর্গরাজ ইন্দ্রের পুত্র মর্তে এসেছে দেবপূজার জন্য পুষ্প আহরণে। এই নৈকট্যের জন্যই দেবতারাও মানুষেরই যাবতীয় বৃত্তিতে ভূষিত হয়েছেন। বিশেষ করে মনসা ও চণ্ডী নিজেদের পূজা লাভের জন্য যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে তাদের চরিত্রে দেবতার মহিমা পরিস্ফুট তো হয়ই নি, বরঞ্চ মনে হয় মর্তের ক্রুর প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই তাদের মধ্যে সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের, বিশেষতঃ মনসাকে স্বার্থবোধের প্রকৃষ্ট প্রতিমূর্তি বলে চিহ্নিত করলে ভুল হয় না। এই দেবতাদের উদ্দেশ্যই হলো যে কোন প্রকারেই হোক নিজের পূজোটা পাওয়া। এই পূজো পাওয়ার জন্য দেবতা মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাতও সৃষ্টি হয়েছে এবং ঘাতপ্রতিঘাতে দেবতার রূপ যা ফুটেছে তাকে কোন ভাবেই দেবোচিত বলা যায় না। সে রূপ ক্রুরতায়

পরিপূর্ণ, তার মধ্যে আদিম মানুষের হিংসাবৃত্তি, স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতা লোলুপতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এরই পাশে মানুষ কিন্তু আপন প্রতিজ্ঞায় অটল অনড় থেকে আপন মহিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। মনসামঙ্গলকাব্যেই এই পরিস্থিতি স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এর আবছা রূপ মাত্র আছে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবতার স্বরূপ কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট ; অন্যভাবে বলতে গেলে, জাতিগোত্র বিচারে মনসাদেবী লৌকিক জীবনের আদিম সমস্ত ছাপকেই আপনদেহে বহন করেছে ; চণ্ডী-দেবীর রূপে লৌকিক এবং পৌরাণিক বর্ণসংযোগ ঘটেছে ; ধর্মদেবতা তো নিজেই নিরঞ্জন নিরাকার, অবশ্য তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় কর্তা। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতা মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জীবনরূপের সার্থক পরিস্ফুটনা ঘটিয়েছেন। কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে এই জীবনরূপের মূল্য অপরিসীম।

রূপগত দিক থেকে মঙ্গলকাব্যের আলোচনা কালে দেখা যায় যে এই কাব্যধারার মৌলিক গঠন লৌকিক ধারার অনুগামী। এই লৌকিক ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পুরাণের রূপ ও ভাবগত ঐতিহ্য, সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাব। এইভাবে কাহিনী-কেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য দেবলীলা ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে পরিমণ্ডিত হয়েছে এবং মঙ্গলকাব্যের শিল্পরূপ মিশ্র উপাদানে গঠিত হয়েছে। অন্যদিক থেকে দেখলে মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'এপিক অব গ্রোথ'-এর লক্ষণও সুপরিস্ফুট দেখা যায়। নরখণ্ডের মধ্যে মনে হয় যে দেশের তৎকালীন প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরিচয় প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে ; ধর্মমঙ্গলকাব্য সম্পর্কে এই অভিমত অনেক পরিমাণে খাটে। মোটকথা, মঙ্গল-কাব্যগুলিতে মহাকাব্যের বীজ নিহিত আছে, কিন্তু কাহিনীর সমুন্নতি, বিচিত্র চরিত্র মাহাত্ম্য, রচনারীতির গাম্ভীর্য ও ব্যাপ্তি এবং মহৎ বিশালতা না থাকায় মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শ-মিশ্রিত দেব মাহাত্ম্যসূচক এবং ভক্তের প্রতিষ্ঠামূলক এক ধর্মীয় সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের সমুন্নত কল্পনাশক্তি

এবং রচনাশৈলীর অভাবের জন্যই বোধ হয় এমনটা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যায়, 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।' অথচ মঙ্গলকাব্যের কবিরা সংস্কৃত পুরাণ মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন নয়।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তিব মূলে রয়েছে ব্রতকথা, মেয়েলি ছড়া প্রভৃতি। এই জন্যই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর এক অঙ্গে অব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিব ছাপ অন্য অঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ছাপ পরিস্ফুট। এই ছাপ অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যে শ্রেণীভেদ দেখা যায়। এক শ্রেণীতে রয়েছে যথার্থ মঙ্গলকাব্যের ধাবা, অন্য শ্রেণীতে রয়েছে সংস্কৃত প্রভাবিত পুবাণাশ্রিত মঙ্গলকাব্যেব স্বরধ্বনি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যও প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এই প্রথম শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যই বাংলা কাব্য ধাবাকে পরিপুষ্ট করেছে। এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যে প্রধানতঃ শক্তি দেবতাই প্রতিষ্ঠিত—মনসা, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতি দেবীই শক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ কবেছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গল এর ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য পববর্তীকালে বচিত, তার সাহিত্য-মূল্য বিশেষ কিছু নেই। দেবামাহাত্ম্য, দেবীমঙ্গল প্রভৃতি রচনাগুলি এই শেষোক্ত শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত। এক ধরনের পুরোহিত-শ্রেণী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হযে এগুলি লিখেছিলেন। এদের সাহিত্য-মূল্য কিছু না থাকায় বাংলাকাব্যের ধারায় এদের কোন স্থান নেই।

মঙ্গলকাব্যের ধর্মধারণা এবং জীবন-চেতনা অত্যন্ত উচ্চমানের নয়, এ কথা আগে বলা হয়েছে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় যে শিবের পূজালাভ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীকে ঈর্ষাকাতর করেছে, দেবীরা নিজেদের পূজা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে এবং নিজেদের পূজালাভের জন্য স্বামী কিম্বা পিতার সঙ্গে বিরোধ

করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। সম্ভবতঃ শিবের প্রতি ভক্ত-সমাজের এক-ধরনের বিক্ষোভের সুযোগেই দেবীরা নিজেদের আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তৎকালীন সমাজ প্রতিবেশে শিবের মত সদাতুষ্ট নিষ্ক্রিয় দেবতা ভক্তদের নিশ্চয়ই কোন নির্ভরতা দিতে পারেনি। এইজন্য লৌকিক সাহিত্যে শিব হাসি-ঠাট্টার উপাদানে পরিণত হয়েছে, যদিও যতিশ্রেষ্ঠ, উমানাথ, ত্যাগী শিব এর ফাঁকে ফাঁকেই আত্ম প্রকাশ করছেন। ডিহিদার মামুদ শরিপ যে সময়ে বাংলাদেশের চারদিকে প্রতি নিয়ত অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়ে রাখতো সে সময়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মনসা চণ্ডী প্রভৃতির মত শক্তির দেবতাকে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়েছে। অবশ্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। লোক সমাজের দেওয়া এই পূজা উচ্চধর্মভাবাপন্ন যে ছিল না তা অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে এই দেবতাদের পূজা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥

[চৈতন্য ভাগবত]

ভক্তদের দেওয়া এই উপচারেই দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছে আর দেবতার সন্তুষ্টির জন্য ভক্ত পেয়েছে ধন দৌলত সুখ শান্তি। অবশ্য বাস্তবে সে কতটা পেয়েছে সে কথা না তোলাই ভালো।

চৈতন্যপূর্বকাল থেকেই মঙ্গলকাব্যধারা প্রচলিত হয়েছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন কবিদের কাব্য আমাদের কাছে যেগুলি এসে পৌঁছেছে সেগুলি চৈতন্যযুগেই লিখিত। এজন্য এই কবিদের রচনায় চৈতন্য-প্রভাব লক্ষিত হয় না। অবশ্য এই যুগে তিন জন কবির মনসামঙ্গল

কাব্যই পাওয়া গেছে। কিন্তু এই কবিদের পুঁথি 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়েছে, ফলে সঠিক কালনির্ণয় এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা অবশ্য প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই সগৌরবে বিরাজমান। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির গবেষণা পর্যালোচনায় এ সমস্যার যবনিকা যেটুকু উত্তোলিত হয়েছে আমরা তার ভিত্তিতেই চৈতন্যপ্রভাবহীন মঙ্গলকাব্যের—মনসামঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের, মঙ্গলকাব্যধারাব প্রথম যুগের আলোচনা কববো।

অনুমান আলোচনার সাহায্যে বোঝা যায় যে মঙ্গলকাব্যধারার অঙ্কুর আবির্ভূত হয়েছিল অনেক আগে। তবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতককে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এই কাল-সীমায় রচিত কোন মঙ্গলকাব্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় নি; সম্ভবতঃ সে সব রচনা কালস্রোতে ভেসে কোন্ বিস্মৃতির অতলান্ত দেশে হারিয়ে গেছে। এর পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন আমরা পাই। প্রকৃতপক্ষে এই সময়-গণ্ডীকে মঙ্গলকাব্যের সৃজন-যুগ বলা যায়। এই সময়-গণ্ডী বাংলা কাব্যধারার পক্ষে বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এর একাদকে আছে চৈতন্যপূর্ব বাংলাকাব্যের ভাব, রূপ ও রীতি, অন্য দিকে আছে চৈতন্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যধারা। মঙ্গলকাব্যেব আলোচনা-সূত্রে প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে অষ্টাদশ শতক মঙ্গলকাব্যেব ঐশ্বর্যময় যুগ। এ আলোচনা যথাকালেই করা যাবে।

চৈতন্যপ্রভাববর্জিত মঙ্গলকাব্যকার হিসেবে যাঁদের চিহ্নিত করা যায় তাঁরা হলেন নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই। অবশ্য শেষোক্ত কবি সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। এই সূত্রে একটা কথা বলে নেওয়া যাক; সে হলো, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির কবিরা মোটামুটি একটা কাহিনীকেই অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। অর্থাৎ কবিরা স্বাধীনভাবে কাহিনীরচনার সুযোগ লাভ করেন নি, প্রচলিত কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকেই তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, প্রভৃতি কবিদের

সম্পর্কে এ কথা ষোলো আনা সত্য। অতএব এই কবিদের সম্বন্ধে আলোচনার আগেই মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী-সূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাক। মনসামঙ্গলকাব্যশাখার প্রত্যেক কবিই এই কাহিনীসূত্রকে অনুসরণ করেছেন।

মনসামঙ্গল কাহিনীসূত্র ঃ

কাহিনীর প্রথমে মহাদেবের মানস কন্যা মনসার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শিব তাঁকে প্রথমে লুকিয়ে রাখেন, পরে কৈলাসে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে শিব-পত্নী চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ হয়। এই বিবাদে চণ্ডী মনসার একটি চোখ কানা করে দেন। তখন মনসা কুপিত হয়ে চণ্ডীর দিকে তাকান মাত্র চণ্ডী জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। মনসাব কৃপায় আবার চণ্ডী জ্ঞান ফিরে পান। এর পরে, মনসার বিবাহ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনসা স্বামীপরিত্যক্তা হন। শিব সমুদ্রের বিষপান করে মৃতপ্রায় হলে মনসা তাঁকে সারিয়ে তোলেন। আবার চণ্ডীর সঙ্গে মনসার কলহের উপক্রম হয়। মনসা তখন জয়ন্তী নগবে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মনসা নিজের পূজালাভে উদ্যোগী হন। মনসার শাপে মর্তে আবির্ভূত হন পরম শৈব চাঁদ। তিনিই মনসাপূজা সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচাব করবেন এই ছিল মনসার বাসনা। মনসা ইত্যবসরে প্রতিকূলতা ভেদ করে প্রথমে রাখাল বালকদের, পরে হাসান হুসেনের পূজা লাভ করেন। এদিকে মর্তধামে চাঁদ যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী বণিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। তিনি শৈব। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সনকা গোপনে মনসাপূজা শিখে বাড়িতে ঘটস্থাপন করেন। মনসা চাঁদ সদাগরের পূজা লাভ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন এবং চাঁদের ক্ষতি করতে শুরু করেন। একে একে চাঁদের সুন্দর উদ্যান নষ্ট হয়, ধন্বন্তরী বন্ধু শঙ্কর গাড়রীর মৃত্যু হয়, চাঁদের ছয় পুত্র প্রাণ হারায়, চাঁদ বাণিজ্য করতে গিয়ে সপ্তডিঙ্গা মধুকর হারায় এবং প্রাণ বিপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত

চাঁদের সপ্তম পুত্র লক্ষ্মীন্দর ভূমিষ্ঠ হলে চাঁদের নিরানন্দ গৃহে আবার আনন্দ প্রবাহিত হয়। যথাকালে লক্ষ্মীন্দর যৌবন প্রাপ্ত হয়। চাঁদ আগেই জেনেছিলেন যে এই পুত্রও মনসার অভিশাপে বাসরে প্রাণত্যাগ করবে। মনসার সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করার জন্য চাঁদ লৌহবাসর নিমাণ করেন এবং সেখানে সদ্য-বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূ বেহুলাকে রাখেন। চাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সর্প দংশনে লৌহবাসরেই লক্ষ্মীন্দর প্রাণ হারায়। এর-পর বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় করে ভেসে যান—উদ্দেশ্য স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে বেহুলা স্বর্গের ঘাটে উপনীত হন। সেখানে স্বর্গের ধোপানী নেত্রবতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নেত্রবতীর সহায়তায় বেহুলা স্বর্গে গিয়ে নৃত্যগীতে মহাদেব ও অন্যান্য দেবতার মনঃতুষ্টি করেন। দেবতাদের অনুরোধে মনসা বেহুলার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেন, চাঁদের অন্য পুত্রদেরও প্রাণ দান করেন, চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ফিরিয়ে দেন। কিন্তু মনসা এক শর্ত করে নেন, চন্দ্রধর মনসা পূজা না করলে এ সবের কিছুই থাকবে না। বেহুলা এই শর্তেই রাজি হন। বেহুলা স্বামী, ছয় ভাসুর এবং সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে চাঁদের রাজ্যে উপস্থিত হন। প্রথমে চাঁদ কিছুতেই মনসা পূজা করতে রাজি হন না, কিন্তু সোমাইপণ্ডিত, সনকা, অন্যান্য বন্ধুর অনুরোধ, সর্বোপরি পরম স্নেহের পুত্রবধূ বেহুলার চোখের জল তাঁর প্রতিজ্ঞাকে পরিবর্তিত করে দেয়। চাঁদ বামহস্তে মনসা পূজা করেন। এই ভাবে মর্তধামে মনসাপূজা প্রচারিত হলো, চারদিকে মনসার দেউল নির্মিত হলো। মনসাপূজার পরে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর দিব্যদেহ ধারণ করে স্বর্গে চলে যায়। তারা মনসাপূজা প্রচারের জন্য মর্তে আবির্ভূত হয়েছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের সমস্ত কবিই এই কাহিনী-কাঠামোটি অনুসরণ করেছেন। দেশ কাল ও কবি-শক্তির সাহায্যে এই কাহিনীতে নানা পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। তাতে কাহিনীর মূলরূপ

ব্যাহত হয়নি। এ কাহিনী বিশ্লেষণ করলেই চোখে পড়বে যে এর মধ্যে মানবজীবনরসই প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙালী কবি বিশেষভাবে জীবনরসের সাধক। এইজন্য অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদে পরিধৌত এই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে হাস্যের, মাধুর্যের, জীবন উপভোগের বিচিত্র পুষ্পরাশি বিকশিত হয়েছে।

চৈতন্যপ্রভাববর্জিত মনসামঙ্গলকার হিসেবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা কালে আমরা নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাসের কাব্যের আলোচনা করবো। কিন্তু এর আগেও কথা আছে। সেই কথার সূত্রপাতে আমরা কানা হরিদত্ত নামে একজন মনসামঙ্গল-কাব্য রচয়িতার উল্লেখ পাই। সাধারণভাবে ইনি মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসেবে গৃহীত: অবশ্য এর স্বপক্ষে সুদৃঢ় যুক্তিপ্রমাণ নেই। এই কবির কোন প্রামাণ্য পুথি পাওয়া যায় নি। এঁর পরবর্তী কালের কবি বিজয়গুপ্ত এঁর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে মনে হয় যে হরিদত্তের কবি-সামর্থ্য অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল:

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথায় সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

[অবশ্য এ মন্তব্য কবি সরাসরি করেন নি। দেবী মনসা স্বপ্নে কবিকে হরিদত্তের গীতের দোষ ত্রুটির কথা বলেছেন।] কিন্তু হরিদত্তের যে দুচারটি পদাংশ পাওয়া গেছে তাতে তাঁর রচনার নিম্নমানের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে হরিদত্তের কাব্যারম্ভ উদ্ধৃত হলো:

ওলা শুনি আস্তের কাহিনী।

মুই হেন সেবক　　　শরণ লইলাম গো

ঘটে ল্যামি লাও ফুল পাণি॥

নেতা বলে বিষহরি　　এথা রহিয়া কিবা করি

মর্ত্ত্য ভুবনে চল যাই।

মর্ত্ত্য ভুবনে যাইয়া　　ছাগ মহিষ বলি খাইয়া

সেবকেবে বর দিতে চাই॥

নেতারে সঙ্গতি কবি　　মাও লামে বিষহরি

হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।

হেটে ধান্যের সবা　　উপরে বিচিত্র ঝরা

সে না ঘটে চন্দন দিয়া॥

ধূপ ধরে কেহ　　　　স্তব পঠে রে

ঘৃতের প্রদীপ সুললিত।

বিষাণেব বাদ্য বাজে　　মনসা হরিষে বে

সম্মুখে গাযেন গায় গীত॥

এই উদ্ধৃতির মধ্যে ছন্দেব যে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তা মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিব কাব্যেই দৃষ্ট হয়। ছন্দেব এই ত্রুটি পডাব সময় কানে বাজে বটে, গান গাওয়াব সময় মোটেই ধবা পড়ে না। মধ্য-যুগের কাব্যাদি গেয সাহিত্য হিসেবে প্রচাবিত ছিল। সুতরাং হরিদত্তের সম্বন্ধে ছন্দ সম্পর্কে বিজয়গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার কবা যায় না। উদ্ধৃতিটিতে কাহিনীর অবতাবণার ভঙ্গিতে মুন্সীয়ানা আছে। মনসাব সর্পসজ্জাব যে চিত্র কবি এঁকেছেন তাতে তাঁব বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।

শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী॥

অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।

শ্বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনী॥

সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি
কর্কট নাগে পদ্মার গলাব হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল ॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী ॥
... . ইত্যাদি

এই বর্ণনায় প্রসাধিতা নারীর রূপ কবি তিলে তিলে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির প্রভাব তৎকালীন মনসামঙ্গলকারদের ওপর পড়েছিল বলেই মনে হয়ঃ

কাণা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তাঁর অনুবন্ধ নাচাবীর ছন্দ
কবি পুরুষোত্তমে গায় ॥

এ কবির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কালের প্রতিকূলতা ভেদ করে বার করে আনা যায়নি। ফলে বাংলাকাব্যধারাকে বিশেষতঃ মনসামঙ্গল কাব্য-শাখাকে তিনি কতটা পরিমাণে পরিপুষ্ট করেছেন তা নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য এ ধরনের দৃষ্টান্ত বাংলাসাহিত্যে অনেক আছে। ছাপাখানার আগের যুগে এ ঘটনা বিরল নয়। বিভিন্ন উল্লেখ থেকে মনে হয় যে কাণা হরিদত্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এই জনপ্রিয়তা প্রবাদেরই নামান্তর হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ সীমা পর্যন্ত কালবৃত্তে মনসামঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালব্ধ কবিদের আবির্ভাব হয়। এই কবিশ্রেণীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের, রাঢ় অঞ্চলের, উত্তরবঙ্গের কবিরা রয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে অন্য কোন মঙ্গল-কাব্যই এত ব্যাপক ভৌগোলিক সীমায় লিখিত হয়নি। এর কারণ বোধহয় এই যে, বঙ্গদেশ সর্পসঙ্কুল, তাই বাঙালী ভয়ে-ভক্তিতে মনসাদেবীকে পূজা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু এ

কথাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় এই কাব্যের মধ্যে মানবীয় রসের যে প্রবহন ঘটেছে তা বাঙালীর মর্মলোককে স্পর্শ করেছে। চাঁদের চরিত্রমহিমা, বেহুলার বেদনামথিত রূপ, চাঁদের সংসারের দুঃখকরুণ চিত্র বাঙালীর অন্তরের অন্তস্তলকে গভীরভাবে নিমজ্জিত করেছে। আর এই বেদনাবিধুর রূপের এখানে ওখানে ভিড় জমিয়েছে হাসির ছটা, লোভনীয় ভোজনের বিচিত্র সমাবেশ ইত্যাদি। বাঙালী এ কাব্য থেকে পরিপূর্ণ জীবনরসের সন্ধান পেয়েছে।

মনসামঙ্গলকাব্যের শাখায় প্রথমতঃ আমরা কবি নারায়ণদেবের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবো। 'সুকবিবল্লভ' নারায়ণ দেব মনসামঙ্গলকাব্যের প্রখ্যাত কবি। তিনি মৈমনসিংহ জেলার বোর গ্রামে বসবাস করতেন। এই সূত্রে তাঁর কাব্য পূর্ববঙ্গে ও আসামে বহুল প্রচারলাভ করেছিল। কবি নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্‌গোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর ॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥
পূবপুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি ॥

এই আত্মপরিচয়ে কবির কুলশীল, বাসস্থান সবই আছে, নেই কেবল তাঁর জন্মতারিখ। আবার তাঁর পুঁথি-রচনার কাল নির্ণয় করাও নানাদিক থেকে কষ্টসাধ্য। কারণ তাঁর পুঁথিতে বহু গায়েনের, লিপিকারের এবং কবির হস্তক্ষেপ ঘটায় বিচার-জটিলতা সৃষ্টি করেছে। নানা পার্শ্ববিচারের এবং যুক্তিসম্মত অনুমানের সাহায্য নিয়ে বলা যেতে পারে যে কবি পঞ্চদশ শতকের কিছু আগে বা পরে

জন্মগ্রহণ করেন। কবি স্বপ্নাদেশে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করে তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন ঃ

বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।
মহাপরিশ্রম মনে হইল দরশন ॥
শিশুকালে গোপরূপে হাতে লইয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি ॥
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি ত কারণ ॥
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি ॥
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানি জন ॥

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মঙ্গলকাব্যধারার প্রত্যেক কবিই স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনার উল্লেখ করেছেন। এর কারণ বোধহয় এই যে, মঙ্গলকাব্যের দেবতারা উচ্চকোটির কাছে হেয় ছিলেন, এইজন্য কবিরা স্বপ্নাদেশের অন্তরালে সেই দেবতাদের মাহাত্ম্য-কীর্তন করেছেন।

নারায়ণদেবের কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে আছে কবির আত্মপরিচয়, বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা. দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানসমূহ—শিব মনসার সম্পর্ক ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই খণ্ডত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডই দীর্ঘতর। এই খণ্ড সৃষ্টিতে কবি বিশেষ করে শিবচরিত্র গঠনে পৌরাণিক উপাদান এবং কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ কাব্য থেকে সহায়তা লাভ করেছেন। হয়ত এইজন্যই পরবর্তী খণ্ডটি দ্বিতায় খণ্ডের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি। চাঁদ সদাগরের লৌকিক কাহিনীর মান পৌরাণিক কাহিনীর স্তরে পৌঁছায় নি। অবশ্য এইভাবে টুকরো টুকরো করে কোন সমগ্র রচনা বিচার করা যায় না। কবি নারায়ণদেবের কবিপ্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় লাভ কালে আমরা দেখতে পাই যে

কবি একটি সহজ সরল আন্তরিক ভঙ্গিতে কাব্য রচনা করেছেন, সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কবির পাণ্ডিত্য। অবশ্য কবির স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব পাণ্ডিত্যের উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়নি। কুমারসম্ভবের প্রভাবে রচিত 'রতি বিলাপ' অংশটির সাহায্যে কবির শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে ঃ

পতিশোকে রতি কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
কেন হেন কর্ম কৈলা দেব শূলপাণি ॥
দেবেব দেবতা তুমি ভুবনের পতি।
স্ত্রীবধ দিন আজি গলায় দিব কাতি ॥
সংসারেতে যত পুরুষ সব হইল নাশ।
স্ত্রীপুরুষে আর না পুরিব আশ ॥
দক্ষিণ সময় আব না পুরিব মন্দ।
পক্ষন ছাড়িয়া যাইব মকরন্দ ॥
কোকিল মধুব ধ্বনি না পুরিব হৃদয়।
মর প্রভু বিনে নাহি বসন্ত সময ॥

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে কবিব কবিত্ব শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান বয়েছে। ভাবব্যাপ্তির এমন দৃষ্টান্ত সত্যই প্রশংসনীয়। বাঙালী চিরদিনই অন্যের ভাবনাকে নিজস্ব ক্ষমতায় আপন করে নিতে পারে, নারায়ণদেবের ক্ষেত্রেও এই সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। নারায়ণদেব হাস্যরস এবং করুণবসের পরিবেশনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন দুটি পরস্পর বিরোধীগুণ আয়ত্ত করা সত্যই দুঃসাধ্য। কিন্তু নারায়ণদেব ছিলেন এমন দুর্লভ গুণের অধিকাবী। বাংলা সাহিত্যে শিবের চরিত্র পরস্পর-বিরোধী ভাবে ও কাজে ভরা ; শিব দেবাদিদেব, কিন্তু তিনিই আবার আসক্তির পীড়নে নীচ নারীর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন। ডোমনী বেশিনী চণ্ডীর প্রতি শিব মোহাতুর হয়ে উঠলে চণ্ডী শিবকে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তিতে বিদ্ধ করেছেন ঃ

ডুমুনি বোলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ।
....নারীর উপরে এখনেহ মন ॥

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকা বেল।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বল করিবার॥

আবার এই চণ্ডীই এর আগে ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর কাছে শিবের নিন্দা শুনে বলেছেন ঃ

না বোল না বোল দ্বিজ হেন কুবচন।
মহাজন নিন্দার এথা নাহিক প্রয়োজন॥
নিরঞ্জন অব্যয় নির্গুণ ভগবান।
যাহার স্মরণ মাত্র হয় পরিত্রাণ॥
চারি বেদ কণ্ঠে যিনি সর্ব বেদ ময়।
যাহার মুখের অগ্নি সংসার প্রলয়॥
প্রলয়ের কালে শিব আপনি যোগবলে।
বটপত্রে শয়ণ করি ভাসিলেক জলে॥
সৃষ্টির কারণে শিব আপনি একাকী।
তাহা হইতে সৃষ্টি কৈলা সকল প্রকৃতি॥
কীট পতঙ্গ আদি যত সব শিবময়।
নিশ্চয় জানিও দ্বিজ নাহিক সংশয়॥

এই অংশের মধ্যে শিবের প্রতি চণ্ডীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বিদ্যমান। কিন্তু এই চণ্ডীই শিবকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচা দিয়েছেন। বাঙালী গৃহিণীর স্বরূপেই যেন নারায়ণদেব চণ্ডীকে চিত্রিত করেছেন—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা অপরিসীম, অথচ স্বামীর ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলে নরমে গরমে যা পরিবেশন করেন তাতে স্বামীর হৃদয়-কম্পন একান্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ চরিত্র সৃষ্টিতে নারায়ণদেবের অপূর্ব দক্ষতা ছিল। চাঁদসদাগরের চরিত্র সৃষ্টিতে কবির এই শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে। চাঁদসদাগর কবির কাছে আদিম শক্তিতে পরিপূর্ণ, এ চরিত্রে কবি তাই সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখান নি, মোটাতুলির টানে

চরিত্রটি বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ শোক-বিহ্বল না হয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছেন ঃ

চান্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোনখানে আছে॥
বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিল চান্দো বিষাদ ভাবিয়া॥
...　　...　　....
কথোক্ষণে থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বোলে কঠোর বচন॥
পুত্র মৈল খোটা যদি দেয় মোরে কাণি।
তাহার জতেক গুণ আমি তারে জানি॥
...　　...　　...
দেব করিযা বুলিতে লজ্জা নাহি কাণি।
একরাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুণি॥
হাসান হোসেন লাজ দিল বিধি মতে।
হেমতালে কাঁকালি ভাঙিল মোর হাতে॥
...　　....　　...
ডালমূল গেল মোর বৈদ্ধ হৈল সার'
অখনে কাণির সনে চাপি করো বাদ॥
যদি কাণির লাইগ পাম একবার।
কাটিযা সুজির আমি মরা পুত্রের ধার॥
জে কর্ম করিমু কাণিরে মনে জাগে।
নাগেরা উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও দিযা গাঙ্গে॥

চন্দ্রধরের এই শোক একেবারে অগ্নিবর্ণে রঞ্জিত প্রতিহিংসার তীব্রতায় পরিপূর্ণ। এ একান্তই আদিম পৌরুষের প্রস্তর গঠিত রূপের দৃষ্টান্ত। পুত্রস্নেহ পরে কিন্তু প্রতিহিংসা আগে। পুরুষকার এখানে পিতাকে অতিক্রম করে গেছে। নারায়ণদেব একদিকে যেমন চাঁদের চরিত্রে দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যদিকে তেমনি বেহুলার মধ্যে শোক করুণ বিষাদ

পরিমণ্ডিত রূপ সৃষ্টি করেছেন। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় করে ভাসতে ভাসতে বেহুলা যখন অকূল জলরাশিতে পৌঁছেছে তখন তার হৃদয় মন্থিত করে বেরিয়ে এসেছে আর্ত বিলাপ :

জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে॥
প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্বজন॥
তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহবে তুমি গলার হাব॥

এই অংশে বেহুলার হৃদয় যেন অশ্রুধারায় বিগলিত হয়ে বেদনা-বিমন্থিত কবিতা সৃষ্টি করেছে। কবি যেন চোখের সামনে কোন অসহায়া বিধবাকে দেখে এই রূপ সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য কবির বেহুলা কেবলমাত্র ব্যথাবেদনার, শোক তাপেরই প্রতিমূর্তি নয়, তাব মধ্যে নারীত্বের দীপ্তি কঠিন প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এইজন্যই স্বামী বিয়োগের বেদনায় প্রজ্জ্বলিতা বেহুলা বলেছে :

শাপ দিয়া বিধাতাবে করোঁ ভস্মরাশি।
বিধাতাকে কি দিম দোষ মুঞি কর্ম দোষী॥

... ...

উত্তর না দেহ প্রভু নাহি কর রাও।
মুঞী অভাগিনী দিগে চক্ষু মেলি চাও॥

কিন্তু যখন বেহুলা বুঝেছে দেবতাকে শাপ দিয়ে, আত্মগঞ্জনা করে, মৃতস্বামীকে আহ্বান করে কোন লাভই নেই তখন সে বলেছে :

যদি বেউলা হম সাত সাহসে জিয়াব পতি
যেন যশ ঘোষয়ে সংসারে।
যাইব দেবের পুরী রঞ্জাইব বিষহরি
আমি যাইয়া জিনিব মনসারে॥

কবি নারায়ণদেব এইভাবে আদিম দৃঢ়তায়, অতলান্ত দুঃখে, তরল হাস্যচ্ছটায় তাঁর কাব্যকে সাজিয়ে তুলেছেন। জীবনরসের এই

বিচিত্র সমাবেশের জন্যই তাঁর কাব্য জনপ্রিয়তালাভ করেছিল। পূর্ববঙ্গে, আসামে আজও কবির কাব্য পল্লীজনের মনোরঞ্জন করে।

পরিশেষে কবির রচনার গাঢ়বদ্ধতা এবং ভাষা ও ছন্দের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করতে হয়। কবি ভাবকে স্পষ্ট সরল সহজ ভাবে প্রকাশ করার উপযোগী রচনারীতি গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যই তাঁর কবিত্ব সর্বজনবোধ্য হয়েছে। কবির রচনার গাঢ়বদ্ধতা, রসের বৈচিত্র্য, চরিত্র সৃষ্টির পরিণতিবোধ থেকে মনে হয় যে তাঁর কবিপ্রকৃতিতে মহাকবির লক্ষণ ছিল, উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। অবশ্য মঙ্গলকাব্যধারার বেশ কয়েকজন কবি সম্পর্কে এ মন্তব্য খাটে।

নারায়ণদেবের কাব্যে অনেকেই অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি দেখেছেন। হাস্যরসের ক্ষেত্রে এর পরিস্ফুটনা সর্বাধিক। এ অনুযোগ মেনে নিয়েই বলা যেতে পারে যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। আদিরসের প্রতি বাঙালীর যেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, এর জন্যই কখনও কখনও সংযমের সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়েছে। অতএব নারায়ণদেবের কাব্য অশ্লীলতা দোষদুষ্ট বলে লাভ নেই। কবি জনরুচি এবং যুগধর্ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। নারায়ণদেব যে মঙ্গলকাব্য ধারার. বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্য শাখার শক্তিমান কবি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তীকালের মনসা-মঙ্গলকারদের অনেকেই তাঁর কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কবি জীবন মৈত্র, বংশীবদন প্রভৃতি পরবর্তীকালে যে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন তার মধ্যে নারায়ণদেবের অনুস্মৃতি সহজেই চোখে পড়ে। সুকবিবল্লভ নারায়ণদেবের কাব্যসাধনা যে বাংলা কাব্যধারাকে উৎকর্ষ দান করেছে, একথা অনস্বীকার্য।

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় নারায়ণদেবের পরেই কবি বিজয়গুপ্তের কথা আসে। পুঁথিতে উল্লিখিত সন তারিখের বিচারে বিজয়-গুপ্তকেই মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিজয়গুপ্ত এদিক থেকে চৈতন্যপূর্ব বাঙালী কবিদের মধ্যে অন্যতম

বিশিষ্ট কবি। এই কবির কাব্য পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। এঁর কাব্যের নামও 'পদ্মাপুরাণ'। কবি তাঁর কাব্যে যে পরিচায়িকা দিয়েছেন তা থেকে কাব্যরচনার কাল, কবির পরিচয় এবং সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় :

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার শাসনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তস্কিম্॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারিবেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে কবি ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তখন বাংলাদেশে হুসেন শাহের রাজত্ব, রাজ্যে সর্বত্রই সুখ শান্তি বিরাজমান ছিল। উদ্ধৃতিতে জন্মভূমি সম্পর্কে কবির অপরিসীম গৌরববোধ প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালীর আত্মগরিমাবোধ কবির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সর্বোপরি কবির শিক্ষা-দীক্ষাগত গর্ব ও মধ্যে সচেতনভাবে কাজ করেছে। সেইজন্যই তিনি কানা হরিদত্তের প্রতি একধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর রচনায়ও ধরা পড়েছে। অবশ্য তাঁর রচনার গুণাগুণ বিচার করা কঠিন, কেননা কবির রচনায় প্রচুর হস্তক্ষেপ হয়েছে। একে কবির জনপ্রিয়তার

মূল্য হিসেবে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য ছাপাখানার আগের যুগের জনপ্রিয় কবিদের এ খেসারত দিতে হয়েছে—পুঁথির অনু-লিপিকার, গায়েন প্রভৃতির সাহায্যে মূলপুঁথি কখনও কখনও এত পরিবর্তিত হয়েছে যে তা থেকে আসল উদ্ধার করা কঠিন। অন্যদিকে দেশের জলবায়ুর জন্য, পুঁথির প্রতি মমতাবোধশূন্যতার জন্য আদি পুঁথি পাওয়াই যায় না। এ সমস্যার কথা প্রাগাধুনিক যুগের প্রায় প্রত্যেক কবি সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সমস্যা স্বীকার করে নিয়েই আমরা বাংলাকাব্যধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কবি বিজয়গুপ্তের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা স্বীকার্য।

আগেই বলা হয়েছে যে বিজয়গুপ্তের কাব্য ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কিন্তু এ তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। বলা যেতে পারে যে এরই কাছে পিঠে কোন এক সময়ে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে কাব্যরচনার যে কারণ উল্লিখিত হয়েছে তা উদ্ধৃত হল ঃ

শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা পঞ্চমী।
ত্রিতিয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা জায়ে স্বামী ॥
নিদ্রার আবেষে না জাগে কোন জন।
হেনকালে বিজয় গোপ্তে দেখীল সপন ॥
গৌরবর্ণ স্বরীর ব্রাহ্মণের নাবি।
রত্নময়ে অলঙ্কার দিব্ব বস্ত্রে পরি ॥
তপ্ত কাঞ্চন হেন স্বরিলের যুতি।
অতি সুশ্রীকাসিত পরম যুবতী ॥

[উদ্ধৃত অংশের বানান বিভ্রাট লিপিকারদের জন্য হয়েছে, এ অনুমান অযৌক্তিক নয়।] কবি মনসার স্বপ্নাদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে দেখা যায় যে দেবতাদের কোন মহিমা রক্ষিত হয়নি। মনসাকে কেন্দ্র করে চণ্ডী ও গঙ্গার মধ্যে যে বাদ বিতণ্ডা, কোঁদল সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের গ্রাম্যনারীর স্বভাবধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়। গঙ্গা মনসার পক্ষ নিয়ে চণ্ডীকে বলেছে ঃ

'মা বলে যে ডাকে তাকে মার কি কারণ।' এ কথায় চণ্ডী যেন কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে কলহে প্রমত্তা হয়েছে :

চণ্ডী— ওগো গঙ্গা তোরে আমি ভালমতে জানি
তোরে আনিতে ভগীরথে সুমেরু ঠেকিল মাথে
ঐরাবত মাগিল সুরতি।

গঙ্গা— ওগো ওগো ওগো চণ্ডী
আশ্বিন মাস এলে পরে নরলোকে পূজা করে
প্রথমেতে যাও হাড়ির বাড়ি।
তার শূয়র দেয় বলিদান পাছে দেয় গুয়া পান
বড় তুষ্ট তাহে হও তুমি ॥

চণ্ডী— ওগো ওগো গঙ্গা গঙ্গা গো
সকল কাল যায় ভাল শ্রাবণেতে তোব যৌবন কাল
ভাদ্র মাসে নাম ধর বুড়ী ॥

ইত্যাদি

গঙ্গার সঙ্গে বিবাদ করার আগেই চণ্ডী অবশ্য মনসার সঙ্গে বিবাদ করে গলা সপ্তমে তুলে রেখেছিল। মনসার সঙ্গে বিবাদের কালে ক্রোধে আত্মহাবা চণ্ডী সৎকন্যা মনসার প্রতি স্বামীর আকর্ষণের কথাও উল্লেখ করেছে। এ ধরনেব আচার আচরণ মোটেই দেবদেবীর উপযুক্ত নয়। বিবাদ বিসংবাদেব পরিবেশেই যে চিত্তের এমন হীনতা দেবতাবা দেখিয়েছে তা নয়, কবি মনসার বিবাহ প্রসঙ্গে চণ্ডী ও মহাদেবের যে কথাবার্তা তুলে ধরেছেন তা হাস্যরস পূর্ণ হলেও শ্লীলতার ধার ধারে নি। শিবকে, কন্যা মনসার বিবাহে উদ্যোগী হতে দেখে চণ্ডী শিবের দারিদ্র্যে কটাক্ষপাত করেছে :

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে ॥

কিন্তু শিবের কাছে এসব সমস্যার সমাধান অতি সহজ :

হাসি বলে শূলপাণি   এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে
দেখিয়া আমার ঠান   এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥

শিবের এই সমাধান নিতান্ত গ্রাম্য রসিকতার দৃষ্টান্ত। অবশ্য বাংলাদেশের লৌকিক শিব এর উর্ধ্বে উঠতে পারে নি, সে শিবের দুঃখ দারিদ্র্য আছে, নেশা ভাং-এর অভ্যাস আছে, চরিত্রের দোষও যে নেই তা নয়। তাই দিগম্বর হয়ে শিব এয়ো বিদায়ের উপায় বার করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে, ভারতচন্দ্রের শিব তো বিবাহ বাসরে দিগম্বর হয়ে নারী সমাজকে ফাঁপরে ফেলেছিল।

বিজয়গুপ্তের পরিকল্পনায় মনসার চরিত্রও গৌরব রিমণ্ডিত হয় নি। ঈর্ষাতুর নীচতায় পরিপূর্ণ। কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে মনসা নিজ জীবনের দুঃখকে করুণভাবে প্রকাশ করেছে :

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল ॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥

এই অংশটিতে কবি, মনসার আন্তরিক দুঃখের গভীর বেদনাময় রূপ সৃষ্টি করেছেন; এখানে নীচতা, হীনতা নেই, দুঃখের দাবদাহে যেন পংক্তি কটি দীপ্ত। এই অংশের সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' পদটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যসাধনায় রসেরই কুসুমিত রূপ পরবর্তীকালে নানাভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবির 'অতিকোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর। অতিবড় গাঙ্গ হইলে ঘাটে পড়ে চর ॥' 'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে।' প্রভৃতি উক্তি প্রবাদের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

বিজয়গুপ্তের কাব্য বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। এই পালাভাগের যেন শেষ নেই। এর ফলে কাহিনীর সামগ্রিকতা এবং চরিত্রের

সংহতি অনেকখানি পরিমাণে নষ্ট হয়েছে ; তাঁর রচনার কাব্যগুণও ব্যাহত হয়েছে। তবু এই বিস্তৃত রচনার মধ্যেই স্থানে স্থানে কবির রচনাশক্তি আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর কাব্যে করুণরসের স্থান মুখ্য হয়ে ওঠেনি, তবু কলমেব তুএকটা আঁচড়ে কবি যে করুণ পরিবেশ রচনা করেছেন তাতে তাঁর সংহত অথচ গভীর ভাবময় রচনাশক্তির পবিচয় মেলে। লৌহবাসবে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু ঘটলে মাতা সনকা কিভাবে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন কবি তার একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছেন :

কপাট করিয়া দূব বাসরে সামায়।
দেখিল সোনাব তনু ধূলায় লুটায় ॥
তুই হস্তে ধবি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল বাণী বদন কমলে ॥

এখানে বর্ণনাব আতিশয্য নেই, শোকের গভীরতা সনকাকে যে স্তব্ধ, মূক করে দিয়েছে তারই ব্যঞ্জনা আছে। সুদৃঢ়চিত্ত চন্দ্রধরকেও পুত্র শোকে অধীর কবে দিয়েছে :

কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমাব বালা লক্ষ্মীন্দর ॥

শোকের এই স্তব্ধ গম্ভীর পবিবেশে চন্দ্রধর পত্নীকে সান্ত্বনা দিতেছেন :

শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কান্দ f য়া সকল মিছা মায়া ॥
মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার।
যে দেছিল লক্ষ্মীন্দব সে নিল আরবার ॥

এই অংশের সঙ্গে মধুসূদনের বাবণ কর্তৃক পুত্র শোকাতুবা চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দানের প্রসঙ্গের মিল লক্ষ্য করা যায়।

সামগ্রিক ভাবে বিজয়গুপ্তের কাব্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কবি যেখানে যেমনটি প্রয়োজন সেইখানে সেই রস পরিবেশন করেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি যেন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই জন্যই

মনসার কোপে হৃতসর্বস্ব চন্দ্রধর মাত্র চারপণ কড়ি পেয়ে বিলাস কল্পনায় মেতে উঠেছে ঃ

একপন কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর এক পন কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব ॥
আর এক পন কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর এক পন কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব ॥

এই অংশের মধ্যে তৎকালীন সমাজজীবনের বিলাস ব্যসনের চিত্রও ফুটে উঠেছে। কোনমতে প্রাণে বাঁচামাত্র চাঁদ ক্ষৌর শুদ্ধি হয়ে নটীবাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার মনোভাবে 'হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়' ভাবটিই পরিস্ফুট।

আনুপূর্বিক বিচার করলে দেখা যায় যে বিজয়গুপ্তের চন্দ্রধর বিচিত্র, কিন্তু সমগ্র নয়। অবশ্য এ কথা তাঁর কাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর কাব্য অখণ্ড একটি ভাবলোক সৃষ্টি করতে পারে নি, টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে রূপ সৃষ্টি করেছে। তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর রসবোধ কাব্যের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

বিজয়গুপ্তের কাব্য গঠন গত দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। তাঁর সময়ে পয়ার ও লাচাড়া ভিন্ন অন্য কোন ছন্দ চলিত ছিল না। তিনি সচেতন শিল্প প্রয়াসের সাহায্যে বাংলা কাব্যের ছন্দ সম্পদ বৃদ্ধি করেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দের পদধ্বনি শোনা যায় ঃ

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥
আগুণ লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥

তাঁর ছন্দে পরবর্তীকালের ভারতচন্দ্রের ছন্দবৈচিত্র্যের সুরও শোনা যায় ঃ

বিজয়গুপ্তের—জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥

রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥

ভারতচন্দ্রের—হরিষে অলস অবশ অঙ্গে
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥

উদ্ধৃত অংশদ্বয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

কবি বিজয়গুপ্ত সহজ সরল অলঙ্কারের সাহায্যে যে ভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর রচনা নৈপুণ্যের দিকটি ধরা পড়েছে। বেহুলার সৌন্দর্য-বর্ণনায় কবির এই অনায়াস লব্ধ শক্তি যেন প্রকাশিত হয়েছে ঃ

চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে ॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকা নির্মাণ দেখি যেন তিল ফুল ॥
নিতম্ব যুগল যেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেন ভ্রমর যুগল ॥
অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদি পরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি ॥

শুধুমাত্র বিভিন্ন উপমার সাহায্যে কবি একখানি বর্ণোজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছেন। কবির এই অলঙ্করণ-রীতি সত্যই প্রশংসনীয়। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য বাঙালী কবি তুলনা উপমার ডালি সাজান, কিছুতেই যেন তাঁর তৃপ্তি হয় না। বিজয়গুপ্তের মধ্যে এই গুণটি লক্ষণীয়।

বিজয়গুপ্ত অন্য একটি দিক থেকেও বাংলা কাব্যধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। তাঁর কাব্যে দেবতার রূপের বিভিন্নতা শেষ পর্যন্ত একক চেতনায় বিধৃত হয়েছে। শক্তির রূপ মূলতঃ এক কিন্তু তা বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে,—এই ধারণাটি বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট করেছেন। এই জন্যই মনসার পূজা-বিরোধী চন্দ্রধরকে

চণ্ডী দেবী নির্দেশ দিয়েছেন—'একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর'।
চন্দ্রধর মোহ বিমুক্ত নেত্রে দেখেছেন ঃ

এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি।
দুইজনে দেখে চান্দ একই মূরতি ॥
... .
এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই।
এতকাল মোরে কেন না বলিলে আই ॥
যেই মুখে বলিয়াছি লঘু জাতি কাণি।
সেই মুখে ভস্ম দেও জগৎ জননী ॥

ভাব সাধনায় বাঙালী সমন্বয় বাদী। বিজয়গুপ্তের মধ্যে সেই সমন্বয়বাদের চেতনা জন্মলাভ করেছে। একে পরবর্তীকালের শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের সোপান হিসেবেগ্রহণ করা অন্যায় হবে না। শাক্ত পদাবলীতে এমনি ধর্ম বিষয়ে অভেদ কল্পনার অজস্র পদ রয়েছে।

উদাহরণ ঃ অভেদে ভাববে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভূজা মুণ্ডমালী ॥

পরিশেষে বলা যায় যে, বিজয়গুপ্ত শাক্ত কাব্য রচনা করেছেন, তথাপি তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কথা কবি নারায়ণদেব সম্পর্কেও সত্য। সে সময়ে চৈতন্য প্রভাব মধ্যাহ্ন সূর্যের মত বিকীর্ণ হয় নি সত্য, কিন্তু বাংলার মাটিতে বৈষ্ণবতার যে সুর অঙ্কুরিত হয়েছিল তারই ছায়ায় কবি বিজয় গুপ্ত, কবি নারায়ণদেব মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। তাঁদের কাব্য সাধনা এই প্রশান্তির পরিপন্থী হয় নি। এ বাঙালী স্বভাবেই সম্ভব। বাঙালী বহু বিচিত্রকে আপন বক্ষে ধারণ করে এক অখণ্ড চেতনায় পরিপূর্ণ হতে পারে। শাক্ত পদাবলীকাররা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই এই ভাবসমন্বয়ের ভিত্তি রচিত হয়েছে। নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত সেই ভিত্তির সার্থক নির্মাতা। চৈতন্যপরবর্তী যুগে এই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই দ্বিজ মাধবের মত, মুকুন্দরামের মত ভাবসমন্বয়ী কবির আবির্ভাব ঘটেছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসা-মঙ্গল কাব্যও রচিত হয়। কবির যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। পুঁথির সংখ্যাল্পতা থেকে মনে হতে পারে যে কবি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। প্রাপ্ত পুঁথিতে তাঁর রচনার যে পরিচয় রয়েছে তাতে আধুনিকতার ছাপ আছে। এ ভিন্ন কবির কাব্যে কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। এ সব দিক বিবেচনা করলে কবির কাল নির্ণয় সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে ওঠে। কবির পুঁথি থেকে তাঁর রচনার কাল সম্বন্ধে জানা যায়ঃ

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া দ্রবিব লোক পরম পীরিত॥

এই কালজ্ঞাপক পয়ার থেকে বোঝা যায় যে ১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস তার কাব্য রচনা করেন। আত্মপরিচয় সম্পর্কে কবি লিখেছেনঃ

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥

কবি চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এই গ্রামেই তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন; বলা বাহুল্য, তিনিও অন্যান্য কবির মত স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করেন। ভূমিকায় কবি তাঁর কাব্য-বিষয়বস্তুর বিন্যাস-পরিকল্পনার আভাস দিয়েছেনঃ

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি।

অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্যকে সাতটি পালায় বিভক্ত করে রচনা করেছিলেন। অথচ দেখা যায় যে তার পুঁথি নয়টি পালায় বিভক্ত। অনুমান করা যেতে পারে যে শেষের দুটি পালা সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত। এইসব নানা কারণে এই কবি সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে একের মত অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই সমস্ত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা কবি বিপ্রদাসের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কাব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিপ্রদাসের কাব্যের প্রধান গুণ এই যে, কাব্যের কাহিনীটির ঘটনাপ্রবাহ স্বচ্ছ, কাহিনীটিতে ধারাবাহিকতা পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে, এবং বর্ণনাভঙ্গী সংহত। মধ্যযুগের অল্পসংখ্যক কবির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা ভিন্ন কবি বিপ্রদাস গভীর আন্তরিকতার সাহায্যে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে হাসানহুসেনের পালাটি (কাব্যের চতুর্থ পালা) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর। এই পালায় তৎকালীন মুসলমান সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এদিক দিয়ে কবি মুকুন্দরামকে বাদ দিলে বিপ্রদাসের সমকক্ষ আর কেউ নেই। অতি পরিমিত স্থানে কবি তৎকালীন মুসলমান সমাজের চাকর নফরদের ব্যবহারের একটি কৌতুকপ্রদ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। মনসার সঙ্গে বিবাদে প্রভু বড় মিঞার মৃত্যু হলে :

মিঞা যবে ফৌত হইল গোলামের খোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।

বড় মিঞার মৃত্যুতে চাকর-বাকরদের মধ্যে বিবিলাভের যে ব্যস্ততা পড়ে গেছে তা তৎকালীন মুসলমান সমাজের একটি দিকের প্রতিফলক। এই মিঞার মৃত্যুতে বিবিও দিশাহারা হয়েছে, তার বাঁদি পরিবৃত সংসার যেন ছারে খারে যেতে বসেছে। বাদিরা অবশ্য মনসার ঘটে পদাঘাত করার জন্যই মৃত্যু বরণ করেছে। মুসলমান-পাড়ার উল্লেখ করতে গিয়ে কবি মুরগ মোরগ পরিবৃত পথঘাটের চিত্র এঁকেছেন। কবির কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এখানে মনসা চরিত্রে করুণা, স্নেহ ও মমতা সঞ্চারিত হয়েছে। অন্যান্য কবির মনসামঙ্গলে মনসা চরিত্র ক্রূরতা, হীনতা প্রভৃতিতে ভূষিত, এ চরিত্র নির্মম কঠোর। কিন্তু বিপ্রদাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসা অভিনব হয়ে উঠেছেন। এইজন্য হাসান ভক্তিভরে মনসাকে পূজা দেওয়ায় মনসার অন্তর করুণায় দ্রবীভূত হয়েছে :

হাসান এতেক যদি করিল স্তবন
মনসা ব্যথিত অতি হইলা তখন।
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিঙ্করে
ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুস্বরে।

এবং হাসানের ভক্তিতে বিগলিত হয়ে মনসা বলেছেন 'অনায়াসে বর মাগ জেই মনে লয়'। দেবীর এই করুণা শেষপর্যন্ত বিরোধী চাঁদের ওপরও বর্ষিত হয়েছে। চাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী মনসা মোহনরূপে ভক্তের কাছে দেখা দিয়েছেন ঃ

নানা রত্ন অলঙ্কার পরি অঙ্গরাঙ্গে
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ ধায় দশ দিগে।
বিচিত্র অম্বর পরি হৃদয় কাঁচুলি
কটাক্ষে মোহজ কাম মনসা কুমারী।
অজাগর সর্পে পদ্ম কৃতাসন করি
ফণী কাল বেকাল যুগল হস্তে ধরি
দুই ঘটশিরে দুই পদাঙ্গুলি দিয়া
নৃপতিরে দেখা দিল ঈষৎ হাসিয়া।

বিপ্রদাস ব্যতীত অন্য কোন মনসামঙ্গলকার কবি মনসার এমন নয়ন লোভন শোভন সুন্দর রূপ চিত্রিত করেন নি। বিপ্রদাসের কাব্য কোমলতায়, কারুণ্যে এবং মমতাসঞ্চারে স্পষ্ট বলে এ কাব্যের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে গীতিরসপুষ্ট হয়ে উঠেছে। নারায়ণদেবের কাব্যে যেমন মহাকাব্যিক বিশালতা আছে বিপ্রদাসের কাব্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু স্নিগ্ধ গীতিময় এক সুর তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

কাহিনী গঠনে বিপ্রদাস যেমন সংহতি বোধ দেখিয়েছেন, চরিত্র চিত্রণেও তেমনি সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। চাঁদসদাগরের চরিত্রটি বিচার করলেই মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি মিলবে। চাঁদ প্রথম থেকেই মনসা-বিরোধী, অথচ চাঁদের পূজা লাভ না করলে মনসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মনসা চাঁদের ক্ষতি করেছে, তার সুরম্য উদ্যান নাখরা বন

ধ্বংস করেছে, কিন্তু চাঁদ মহাজ্ঞানের সাহায্যে নষ্ট বিষয় উদ্ধার করেছে। মনসা চাঁদের শক্তির কাছে প্রথমাবস্থায় পরাভূত হয়ে ভীতা হয়েছেন।

দম্ভময় অহঙ্কারে গালিপাড়ে মনসারে
দেখি পদ্মা ত্রাসযুক্ত হইল।

শেষে মনসা চাঁদের শ্যালিকার ছদ্মবেশে চাঁদকে বশ করে তার মহাজ্ঞান হরণ করে নিল। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরিও মনসার ছলনায় প্রাণ হারাল। শুরু হলো চাঁদের ক্ষতির পালা, ধনসম্পদ গেল, ছয় পুত্র গেল। কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও চাঁদ অটল, এমন কি বাণিজ্যে বেরিয়ে সে মনসার দেউল ধ্বংস করে ধনসম্পদ লুঠ করেছে :

মনসার ঘটে মারে হেতালের বাড়ি
ভাঙিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি।
কুবুদ্ধিরা চাঁদো রাজা ভাঙিল দেহারা।
মন্দিরের যত ধনে ডিঙ্গা কৈল ভরা।

এরপর চাঁদের বাণিজ্যবহর অনুপাম-পাটনে পৌঁছেছে, চাঁদ সেখানকার রাজা হয়েছে। অন্যদিকে চাঁদের অনুপস্থিতিতেই তার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দর জন্মেছে; সে বড় হয়ে বাপের রাজ্যের রাজা হয়েছে। মনসার চক্রান্তে চাঁদ আবার নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছে, ছেলের বিয়ের উদ্যোগ করেছে। ছেলের বিয়েতে চাঁদের আনন্দ-চিত্র কবি অতি সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেছেন :

চাঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁপ দাড়ি।

এর পরে আবার সেই দুঃখযন্ত্রণার পালা, পুত্র বিয়োগের ব্যথা। কিন্তু বেহুলা যখন স্বামীকে, ছয় ভাসুরকে এবং চাঁদের সম্পদ রাশি নিয়ে চাঁদের খাস বন্দর বামেশ্বর ঘাটে পৌঁছোলো তখন সকলের পরামর্শ সত্ত্বেও চাঁদ মনসার পুজা করতে চাইলো না। যারা তাকে মনসাপূজার কথা বলেছে তাদের উদ্দেশ্যে সে বলেছে :

না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনুচিত
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।
পুত্র শোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে
নেড়া কাউয়া দাসী বলে সনকাব বুদ্ধে।
ছয় বধূ বলে ছয় স্বামীর হাব্যাসে
গাবর চাকব বলে সেই অভিলাষে।

বিপ্রদাসের সৃষ্ট চাঁদ নিজের আদর্শ অটুট বেখেছে, কোন প্রলোভ.ন ভোলে নি। আত্মীয় স্বজনেব অনুরোধকে সে যাচাই করেছে প্রত্যেকের স্বার্থবোধেব ভিত্তিতে। একমাত্র চণ্ডীদেবী যখন চাঁদকে অভেদ জ্ঞান দিয়েছেন তখনই চাঁদ মনসাকে পূজা দিয়েছে। বিপ্রদাসের অন্যান্য চরিত্রও সঙ্গাততে পবিপূর্ণ, অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই চারুত্ব আছে এমন নয়। বিপ্রদাসের কাব্যে তৎকালীন সমাজেব একটি ব্যাপক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সমাজে শিক্ষা দান বীতি কি ছিল কবি নিপুণভাবে তাব উল্লেখ কবেছেন লক্ষ্মীন্দিরের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে:

অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভ দিন করে।
পড়ি শাল লইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তার পব ব্যাকরণ পড়ে রাজ সুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য প[illegible]িল হরষিতে।
অলঙ্কাব কুমাব পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টাদশ পুবাণ পাড়িয়া অনিবাব
হইল পণ্ডিত বড় বা[illegible]ব কুমার।

এই পাঠ্যতালিকা থেকে বাংলাদেশের জ্ঞানচর্চার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ভিন্ন বিপ্রদাস তাঁর সময়কার উল্লেখযোগ্য স্থান-গুলির উল্লেখ করেছেন চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে:

ডাহিনে হুগলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোয়ো পূর্বে কাঁকীনাড়া।
মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।
চাঁপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
... ...
পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাত'
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।

অবশ্য এই বর্ণনায় কলকাতা প্রভৃতির উল্লেখ থাকা[illegible] প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এই সন্দেহের কথা বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে বিপ্রদাস তাঁর কাব্যকে যুগ ও সমাজের দর্পণ করে তুলেছেন। কবিব রচনাভঙ্গিতে সংহতি এবং সমগ্রতা যেমন আছে তথ্যের নৈপুণ্য, বর্ণনাভঙ্গির সহজ সৌন্দর্যও তেমনি আছে। সর্বোপরি বিপ্রদাসের কাবা শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীতে মণ্ডিত হওয়ায় অন্যান্য কবির মনসামঙ্গল থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই যুগের অপর একজন মনসামঙ্গলেব কবির কথাও উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন উত্তর বঙ্গের তন্ত্র বিভূতি। দীর্ঘকাল এই কবির পরিচয় সাহিত্য পাঠকদের কাছে অপরিচিত ছিল, সম্প্রতি কবির কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার হয়েছে। এক সময় এঁর কাব্য উত্তব বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পববর্তী কালে, সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি জগৎজীবন ঘোষাল সম্ভবতঃ এঁর কাব্যকে আত্মসাৎ করেছিলেন, কবি জগৎ-জীবনের জনপ্রিয়তা সমধিক হওয়ায় তন্ত্র বিভূতির খ্যাতি সম্ভবতঃ ম্লান হয়ে যায়। কবিব কাব্য গতানুগতিক ধারাতেই প্রবাহিত, তবে মধ্যে মধ্যে কবিব স্বকল্পনাও রূপ লাভ করেছে। মনে হয় কাব্যখানিতে নাথপন্থী ঐতিহ্য প্রকট। কারণ দেব-সহায় সজ্জিত হওয়ার জন্য মনসা 'খটক ডম্বুর চাহে [আর] লাউয়া লাঠি। দশ সারা সিন্দূর চাহে আর ঘট দুটি॥' কাব্যমূল্য বিচারে এ কাব্যকে

যথেষ্ট গৌরবে ভূষিত করা যায় না। লখিন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গে কবি একটু বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। লখিন্দর কামপীড়িত হয়ে স্বীয় মাতুলানীর সঙ্গে ব্যাভিচারে রত হয়। এতে চাঁদ লজ্জিত হয়ে পুত্রের বিবাহের যোগাযোগ করেন। মনে হয়, এ ব্যাপাবে কাব্যখানিতে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই ধবনের কিছু কাহিনীগত বৈচিত্র্য বাদ দিলে কাব্যখানিব চমৎকাবিত্ব কিছু নেই। অবশ্য বাংলাকাব্যেব ধারায় তন্ত্রবিভূতিব কবির সংখ্যা প্রচুর, লোক-মনোরঞ্জনের আংশিক দায়িত্ব তাঁরা স্বীয় যুগে পালন করেছেন, তার বেশী সাধ্য তাঁদেব ছিল না।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগেব মধ্যেই প্রাগাধুনিক বাংলাকাব্যেব রূপ ও রীতি, বিষয় ও ভাব—এক কথায় বাংলা-কাব্যধাবাব নিজস্ব রূপ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। রূপগত দিক থেকে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে বাংলা কাব্য দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়েছে—(১) গীতি কবিতা বা পদসাহিত্য ধারা, (২) আখ্যানমূলক কাব্যধারা।

আখ্যানমূলক কাব্যধারাব মধ্যে রয়েছে দেশকালেব প্রয়োজনে উদ্ভূত অনুবাদ-সাহিত্যধারা এবং বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লৌকিক সংস্কৃতির একাকাব পটভূমিতে জাত মঙ্গলকাব্য ধারা। এই সমুদয় সাহিত্যসম্পদ ধর্মধাবণার ছায়াঞ্চলে বচিত সত্য, কিন্তু কবিগণ মানবজীবন-রসকে উপেক্ষা কবতে পাবেন নি। তাই ধর্মের তত্ত্ব ও রূপেব সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে মানব হৃদয়েব অজস্র সম্ভার, মানবজীবনের অজস্র উপকরণ সমীকৃত হয়েছে। আধুনিক পাঠকের কাছে এ সবের মূল্যই মুখ্য। যুগে যুগে বাঙালী কবি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেব বেদীমূলে আপন অন্তবের বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পরাশি সাজিয়ে দিয়েছেন তার প্রমাণ আমবা সেই চর্যাপদাবলীর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ থেকেই পাই :

হেরি সে মোর তইলা বাড়ি খসমে সমতুলা।
সুকড় এ সে রে কাপাসু ফুটিলা॥

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্নাবাড়ী উএলা।

ফিটেলি আন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ॥ [চর্যাপদ]

[দেখছি আমার সেই বাড়ি প্রভাস্বরূপ হয়েছে এবং সুন্দর হয়েছে আর কাপাস ফুল ফুটেছে। সেই বাড়ির পাশে জ্যোৎস্না প্লাবিত হচ্ছে, আকাশ ফুলের মত, অন্ধকার পালিয়ে গেছে।]

ফুটিল কদম্ব ফুল ভরে নোআঁইল ডাল

এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।

... .

সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।

এভোঁ নাইল নিঠুঁর সে নান্দের নন্দন

[শ্রীকৃষ্ণকীর্তন]

[কদমফুল ফুটলো, ডালগুলো ফুলভারে অবনত হলো, এখনও গোকুল থেকে বালগোপাল এলো না।....শ্রাবণ মেঘে আকাশের দক্ষিণ দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, এখনো নিষ্ঠুর নন্দের নন্দন এলো না]

এসব দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে; গীতিকবিতাতে তো বটেই এমন কি আখ্যানমূলক কাব্যের মধ্যেও। এর কারণ বাঙালী ভাব-সৌন্দর্যের বিলাসী, তার কল্পনায় প্রকৃতি মানব-অন্তরের সুখদুঃখের তরঙ্গদোলায় দোলায়িত। এর সর্বোত্তম বিকাশ আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দেখি। এ ভিন্ন মধ্যযুগের সাহিত্যে বাঙালী কবির ভাব-সাধনার বিশিষ্ট রূপটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে। বাঙালী বিশেষভাবে, মধুবভাবে, মধুবরসে পরিতৃপ্ত হয়। তার ধর্মভাবনায়ও তাই লীলারসের প্রাধান্য। এই লীলার তাৎপর্য চৈতন্যদেব আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু মর্তজীবনের কামনা বাসনায়, আনন্দ বেদনায় এই লীলা পরিকল্পিত। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এর মধ্যে যুগরুচির প্রভাব পড়ায় তা আদিরসের বাড়াবাড়ি হয়ে শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করেছে। তবু বলতে হয়, কি গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে, কি আখ্যান কাব্যের ক্ষেত্রে মধুর ভাবাপন্ন আদিরস একটি মুখ্য স্থান

অধিকার করে আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রাকৃত প্রেমপ্রবাহের অখণ্ড রূপ বিকাশ। বাঙালী কবির চেতনা জীবনের সম্ভোগ চিত্রকে ব্রজলীলার আবেষ্টনে মূর্ত করে তুলেছে। এই প্রবাহে চৈতন্যপরবর্তীযুগের অমৃত মাধুরী আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত যে মঙ্গলকাব্য পাওয়া গেছে তার মধ্য থেকে বাঙালীর কাব্য-সাধনার একটি বিশেষ পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, এই কাব্যধারায় বিশেষ করে শিব মানুষের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছেন, অন্যান্য দেবতাদের আচার-ব্যবহারও মানুষেরই মত। বাঙালীর ধর্ম-সাধনার এ এক বৈশিষ্ট্য। বাঙালী দেবতাকে দূরে রেখে ভক্তি নিবেদন করতে পারে না, বাঙালীর স্বভাবই হলো আত্মীয়তার নিগূঢ় বন্ধনে দেবতাকে আবদ্ধ করা। ধর্মভাবসাধনার এই বিশিষ্টতা অন্যতর ভাবে চৈতন্যদেবের মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে সেই আত্মীয়তার পরিমণ্ডল সংসৃষ্ট হয়েছে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের সংযোগসূত্রের সাহায্যে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কবিরা তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবিকে বাস্তবানুগ পথেই ধরে রেখেছেন। মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে প্রথাগতভাবে কয়েকটি দিক বর্ণিত হয়েছে—(১) খাদ্যতালিকা (২) বেশবিন্যাস (৩) নারীগণের পতিনিন্দা (৪) বাণিজ্যসূত্রে ভ্রমণ (৫) বারমাস্যা (৬) চৌতিশা। বাণিজ্যসূত্রে ভ্রমণের মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধস্থানগুলির বর্ণনা লাভ করা যায়। এই ভ্রমণের মধ্যেই বাংলাদেশের নদী-প্রকৃতির পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়েছে। নদীবক্ষে ঝড়ের যে বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লাভ করা যায় তার মধ্যে একধরনের প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই সূত্রেই আমরা বাংলাদেশের নৌশিল্প সম্পর্কে অবহিত হই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে কবিরা বাণিজ্যবহরকে সুদৃশ্য, সুন্দর, মনোহরভাবে পরিসজ্জিত করেছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এ বর্ণনা প্রথাগত হয়ে পড়েছে। বারমাস্যার মধ্যে নায়ক বা নায়িকার দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের

কথা ব্যক্ত হয়েছে। এজন্য বারমাস্যা একধরণের সামাজিক দলিলের ভূমিকা পালন করে। চৌতিশার মধ্যে ভক্ত চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার বন্দনা করেছে, এগুলি যেন আগামী দিনের শাক্ত পদাবলীর ভূমিকা রচনা করেছে। এ ভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন দিনের শিক্ষাদীক্ষা, উৎসব আনন্দ, নানা কলাবিদ্যা প্রভৃতির প্রসঙ্গ ভিড় জমিয়ে আছে। মনসামঙ্গলকাব্যে এবং চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বণিক খণ্ডে বাংলাদেশের সমৃদ্ধশালী বণিক শ্রেণীর আধিপত্যের পরিচয় লাভ করা যায়। ধর্মমঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় রাজতন্ত্রের ভূমিকা। এইভাবে মঙ্গলকাব্য বাংলাকাব্যধারায় কাহিনীরসের প্রবাহটিকে উৎসারিত করে দিয়েছে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ভাব, রূপ, রীতি ও বিষয়ের দিক থেকে বাংলাকাব্য তার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এই পূর্ণাঙ্গ কাব্যমণ্ডলের একদিকে রয়েছে গীতিরসধারা অন্যদিকে রয়েছে কাহিনীরসধারা। আর সমগ্র মণ্ডলে বাঙালীর প্রাণধর্ম স্বরূপ গীতি-সুর তরঙ্গিত হয়েছে।

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়

পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সাহিত্য সাধনার সিদ্ধিকে অবলম্বন করে বাংলাকাব্যধারা ষোড়শ শতকের পরিব্যাপ্ত সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে; আশ্চর্য এক পরশমণির ছোঁয়ায় এই ধারা অপরিম্লান সৌন্দর্যের অবিরত প্রবাহে উর্মিমুখর হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য এই স্পর্শমণি হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি বাঙালীর হৃদয়-মন্থিত অমৃত-সম্পদ। বাংলাদেশের এক অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব ব্যতীত বাংলাদেশের অন্তঃপ্রকৃতি যে অমৃতময় পরিপূর্ণতা লাভ করতো না, একথা বলাই বাহুল্য। চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে তান্ত্রিকতা প্রভাব বিস্তার করেছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে বাংলাদেশে ন্যায়, স্মৃতি এবং তন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করেছিল। তান্ত্রিকতার সূত্রেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বাংলাদেশে শাক্ত মতবাদ। অবশ্য শাক্তমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লৌকিক ধর্মাচরণের প্রভাবও কিছু ছিল, দেশকালের আনুকূল্যও ছিল। তান্ত্রিকতার ফলে বাংলাদেশে একধরনের অশ্লীল চিত্র ফুটে উঠেছিল। ধর্মসাধনায় এই মতবাদ সাধারণের কাছে ব্যাভিচারের আগল মুক্ত করে দিয়েছিল :

আমিষাসব সৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্যাশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ॥

[যার মুখে মাংসাদি আমিষের এবং মদ্যের গন্ধ নেই, সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য এবং বর্জন যোগ্য, সে যে সাক্ষাৎ পশু এতে কোন সংশয় নেই] এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পঞ্চমকারের আনুকূল্যে সাধন-ভজনের নামে নারীকে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা। সুতরাং এই ভোগলোলুপ পথে মানুষের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল। এই বিকৃতির বন্যাস্রোত রুদ্ধ হলো চৈতন্য-আবির্ভাবে। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে

ঘনায়মান অন্ধকার চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে অপসৃত হলো। চৈতন্যদেব ঘোষণা করলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ'। তিনি বললেন, রাগানুগা ভক্তি পথে হরিনাম গ্রহণের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরিত হয়। জীবনের সহজ সরল বিশ্বাসের বেদীমূলে, জীবনচর্যার অনাড়ম্বর অথচ আধ্যাত্মিক আলোকোজ্জ্বল বৃত্তে তিনি ধর্মকে সংস্থাপিত করলেন। অকুণ্ঠ মানবপ্রীতি তাঁর জীবনসাধনার মূলমন্ত্র। এই ধূলিমলিন মর্তপৃথিবীতে তিনি প্রেমের মন্দাকিনী ধারাকে নিয়ে এলেন, পৃথিবী মধুময় হয়ে উঠলো, জীবন ভরে জেগে উঠল অমৃতময় ফসল। বাংলাদেশের কাব্যধারা এই অমৃত-স্পর্শে যৌবন-পরিপূর্ণতা লাভ করলো। বৈষ্ণব সাধক কবিরা রচনা করলেন এই আলোকোদ্ভাসিত ব্যক্তিত্বের জীবনী কাব্য, পদাবলী সাহিত্য। শাক্ত কবিদের মানস-লোকেও চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের অতুলনীয় সৌরভ হিন্দোলিত হয়ে উঠলো। সমগ্রতঃ ষোড়শ শতকের বাংলা কাব্য পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো চৈতন্যদেবের প্রাণরস ধারায়। পরবর্তী যুগেও চৈতন্য-প্রভাবের রশ্মিচ্ছটা বাংলাকাব্যের দেহে নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। বিশেষ করে ষোড়শ শতকের বাংলাকাব্যের গতিপ্রকৃতির পরিচয় পেতে গেলে প্রথমেই আমাদের চৈতন্য-জীবনী প্রসঙ্গে অবহিত হতে হবে। এই সূত্রেই আমরা একটি কথা বলে রাখছি—চৈতন্য-যুগ থেকেই বাংলাকাব্যধারা ব্যাপ্তি ও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে—নানা শাখার আবির্ভাবে কাব্যদেহ নানাদিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এজন্য আমরা এক একটি শাখাকে কেন্দ্র করে বাংলাকাব্যের মূল্য নির্ণয় করবো। কালানুক্রমের দিকটি শাখাগতভাবেই রক্ষিত হবে।

আলোচনাসূত্রে আমরা যে শাখাগুলি লাভ করবো সেগুলি হলো—(১) বৈষ্ণব সাহিত্য (২) মঙ্গলকাব্য (৩) অনুবাদ সাহিত্য (৪) নাথ সাহিত্য (৫) শিবায়ণ কাব্য (৬) লৌকিক সাহিত্য। এই শাখাগুলিতেই যে ষোড়শ শতক ও তৎপরবর্তীকালের বাংলা কাব্যধারার সম্পূর্ণ পরিচয় নিবদ্ধ নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আমরা উল্লিখিত কাব্য-সাধন-ধারার বাইরে যে ভিন্নতার কাব্য-

সৃষ্টির পালা চলেছিল তার জন্য পৃথক আলোচনা করবো। সর্বাগ্রে আমরা শ্রীচৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যা। গ্রহণের পুণ্যস্নানের জন্য নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে ভিড় জমেছে, গ্রহণারম্ভে বাড়ীতে বাড়ীতে শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠেছে। এই সময়েই জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ আলো করে শচীদেবীর কোলে নিমাইএর আবির্ভাব ঘটলো। নবাগত শিশুকে দেখে সবাই আনন্দিত, গণক এই শিশুর ভাগ্য গণনা করে বললেন যে, কালে এই সন্তান বিখ্যাত হবে। শিশুকাল থেকেই নিমাই দুরন্ত, নব নব দুষ্ট বুদ্ধি উদ্ভাবন করে বাড়ীর সবাইকে, পাড়া-প্রতিবেশীদের উত্যক্ত করেছেন। কেবল তাঁর দাদা বিশ্বরূপ তাঁর সকল অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কিন্তু এই দাদা সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ-ত্যাগ করার পর জগন্নাথ ও শচীদেবী নিমাইকে নয়নমণির মত রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। জগন্নাথের ধারণা হল, তাঁর বড় ছেলে বেশী লেখাপড়া শিখেই সন্ন্যাসী হয়েছেন, এ জন্য তিনি নিমাইকে লেখাপড়া শিখতে দিতে চাইলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত টিকলো না, নিমাইএর আগ্রহাতিশয্যে তিনি নিমাইকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের টোলে ভর্তি করে দিতে বাধ্য হলেন। তীক্ষ্ণধী নিমাই অল্পকালের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হলেন। ব্যাকরণের সূত্রে এবং টীকায় তাঁর অসাধারণ আধিপত্য জন্মালো। এই সময়েই পিতা জগন্নাথের মৃত্যু ঘটলো। নিমাই অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করতে লাগলেন। তাঁর গুরু মনে করেছিলেন যে কালে নিমাই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হবেন। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব বহনের জন্য নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলে বসলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর কাছে অসংখ্য ছাত্রের ভীড় জমলো। জীবনের এই প্রারম্ভ কালেই এক মধুর মুহূর্তে বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। গঙ্গাস্নানের কালে উভয়ে উভয়কে দেখে

আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারই পরিণতিতে বিবাহ হলো। এ সময়ে চৈতন্যদেবের বয়স, বোধ হয় ষোল সতের। প্রথম যৌবনেই তিনি যেন জীবনের আনন্দবৃত্তটি সম্পূর্ণ করে তুললেন। কিন্তু এই সময়ের নিমাই অসম্ভব দাম্ভিক, তাঁর পাণ্ডিত্য অপরাহত, তিনি অন্যান্য ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ হানেন ঃ

প্রভু কহেন সন্ধি কার্যে নাহি জ্ঞান যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্টমিশ্র পদবী সবার ॥

কিন্তু ও দাম্ভিকতা মিথ্যা নয়, চৈতন্যদেবের গর্ব কেহই সেদিন খর্ব করতে পারেন নি। পাণ্ডিত্যের প্রখরতার জন্য নিমাই বোধ হয় জীবনের প্রথমদিকে কিছুটা পরিমাণে নাস্তিক ছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে একটি বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। সুকণ্ঠ মুকুন্দ-পণ্ডিত কৃষ্ণলীলা গান করতেন। পূর্ববঙ্গ-আগত বহু ছাত্র এবং অন্যান্য অনেকে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে নিমাই নানা পরিহাসে অতিষ্ঠ করে তুলতেন ; কৃষ্ণভক্তদের ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করতেন। তাঁকে আসতে দেখলেই সকলে পালিয়ে যেতো। তখন নিমাই হেসে বলতেন ঃ

এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তিটীকা আনি বাখানি সে মাত্র ॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন ॥

পরে নবদ্বীপেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার পর চৈতন্যের মন কৃষ্ণানুকূল হয়। এই সময়েই চৈতন্যদেব বায়ুরোগাক্রান্ত হয়ে উন্মত্তবৎ আচরণ করতে লাগলেন, আবেশের বশে তিনি মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন 'মুই সেই মোরে ত না চিনে কোন জন'। তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগলো। বৈষ্ণবরা তাঁকে উপদেশ দিলেন, 'ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ' ; চৈতন্যদেব আবার

সুস্থ হয়ে উঠলেন। আবার পূর্ণোদ্যমে তিনি অধ্যাপনা শুরু করলেন। এই সময়ে নবদ্বীপে এক মহাপণ্ডিত এসে হাজির হলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর তর্ক-যুদ্ধ হলো। চৈতন্যদেব তাঁর রচিত গঙ্গাস্তোত্রের অসংখ্য অলঙ্কারগত ও ব্যাকবণগত দোষ ধরে দিলেন। বৈয়াকরণ তরুণ চৈতন্যদেবের কাছে ষড়্‌দর্শনে প্রাজ্ঞ ভারতের দিগ্বিজয়ী প্রৌঢ় পণ্ডিতের শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। নবদ্বীপবাসী চৈতন্যদেবের এই কীর্তিতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। এর পরে শিষ্যদের বিশেষ অনুরোধে চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সেখানে তাঁর খ্যাতি পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিছু অর্থও তিনি এ অঞ্চল থেকে লাভ করলেন। এইখানেই তপনমিশ্র নামক এক কৃষ্ণভক্তকে চৈতন্যদেব ধর্মোপদেশ দিলেন। সেদিক থেকে ইনিই চৈতন্যদেবের প্রথম শিষ্য। পূর্ববঙ্গ থেকে খ্যাতি ও অর্থ লাভ করে চৈতন্যদেব বাড়ী এলেন। কিন্তু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল মর্মবিদারী এক সংবাদ। তিনি বাড়ী এসেই শুনলেন যে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছেন। চৈতন্যদেবের হৃদয় শোকের গাঢ় কৃষ্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সংসারকে তিনি শূন্য দেখলেন। ক্রমে তাঁর শোকাবেগ হলো সংহত। তিনি ছাত্রপড়ানোয় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্য পরিহাসের প্রবাহও উন্মুক্ত হলো। মাতার পীড়াপীড়িতে আবার তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন। এবারে পাত্রী হলেন রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই সময়েই নবদ্বীপে অন্য এক ব্যাপার চলছিল। বৈষ্ণবগণ নামসংকীর্তন নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু অবৈষ্ণবগণ তাঁদের প্রতিকূলতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। নবদ্বীপের ধর্মপরিমণ্ডল তখন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করলো।

এই সময়েই চৈতন্যদেব পিতৃ-পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় যান। তখন তাঁর বয়স বোধহয় তেইশ। সেখানে আবার তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর দেখা হলো। এখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দশাক্ষর

গোপালমন্ত্র গ্রহণ করলেন। এই গোপালমন্ত্রের প্রভাবে এবং বিষ্ণুপদ দর্শনে চৈতন্যদেব যেন আমুল পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। গয়া থেকে যে চৈতন্যদেব ফিরলেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ— কোথায় গেল সেই পণ্ডিতের দম্ভ, সেই রঙ্গ পরিহাস। তার বদলে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভাববিভোর চৈতন্যদেব নতুনভাবে নবদ্বীপবাসীর মনকে জয় করতে শুরু করলেন। তাঁকে লাভ করে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সম্প্রদায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। অহোরাত্র কীর্তনের ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। অবৈষ্ণবরা নানাভাবে এই প্রবাহকে বাধা দিতে সচেষ্ট হলো, তারা শেষপর্যন্ত কাজির কাছে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা নালিশ করলো। কিন্তু চৈতন্যদেবের দৃঢ়তায় সমস্তই ব্যর্থ হলো। অবশেষে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, যাতে তাঁর প্রচারিত ধর্মউপদেশ লোকে গ্রহণ করে। তিনি শচীমাতাকে কাঁদিয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে আশাহত করে, সমস্ত নদীয়াবাসীর দুনয়নে চোখের জল বইয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। তাঁর স্থিতি হলো পুরীধামে। এখান থেকে তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে গমন করেছেন। তাঁর বাকী জীবন পুরীতেই অতিবাহিত হয়। এখানে তাঁর চারপাশে তখনকার পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তশ্রেষ্ঠরা জড়ো হন। একটি বৈষ্ণব পরিমণ্ডল পুরীতে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে তাঁর নিত্যসঙ্গী নিত্যানন্দ তাঁরই নির্দেশে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তাঁরই নির্দেশে রঘুনাথ, রূপ সনাতন প্রভৃতি ষড়গোস্বামী বৃন্দাবনধামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ভাব ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। বৃন্দাবনে একটি সুদৃঢ় বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে।

চৈতন্যদেব নীলাচলে ছিলেন আঠারো বছরের মত। তাঁর জীবনের এই আঠারো বছর ধর্ম সাধনায়, ধর্মপ্রচারে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠনে অতিবাহিত হয়েছে। অবশ্য শেষ কবছর তিনি কৃষ্ণপ্রেমের ভাবঘোরে অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে তাঁর বয়স

যখন পুরো আটচল্লিশও হয়নি তখন এই ভাব-বিভোরতার ফলেই তিনি তাঁর মর্তলীলা সংবরণ করেন।

সাধারণভাবে চৈতন্যদেব নব বৈষ্ণবতার প্রবর্তক। তাঁর আগেও বাংলাদেশে বৈষ্ণবতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছিল। তার প্রমাণ আমরা জয়দেবের কাব্য থেকে, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য থেকে, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য থেকে লাভ করি। বৈষ্ণবতার এই ধারায় কৃষ্ণভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাও শতদল-সৌরভে আকুলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটা ব্যবধান এর মধ্যে ছিল। চৈতন্যদেব এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন, তাঁর প্রবর্তিত রাগানুগাভক্তি সাধনা অন্তরের ভাব-সম্পদকে সম্পূর্ণ করে তুললো। প্রাকৃত জীবনের প্রেমলীলাকে তিনি উর্ধ্বায়িত করে ভক্ত জীবনে ঈশ্বরানুসন্ধান, ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাকে আরোপ করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। মধুর রসাশ্রয়া রাধাপ্রেমের সুনিবিড় ঐকান্তিকতাই ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। এই প্রেমানুভূতির মাধ্যমে ভগবৎ অনুভূতিই চৈতন্যদেবের ধর্মসাধনার শেষ কথা। এইজন্যই চৈতন্যদেব বাঙালীর হৃদয়মন্থিত অখণ্ড অমিয়। চৈতন্যদেব তাঁর এই ধর্মতত্ত্বকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রেমভক্তির প্রবাহে উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণ্য ভক্ত অবগাহিত হয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। অবশ্য তাঁর প্রেমভক্তি শক্ত ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে অন্যায় সেখানে তিনি রুদ্র। তাই বিনয়াচরণ তাঁর পথের বিশিষ্ট কথা হলেও এই বিনয় কোন অন্যায়কে মেনে নেয়নি, আপন হৃদয়ের জোরে সমস্ত প্রতিকূলতাকে লঙ্ঘন করেছে।

তৎকালীন যুগে চৈতন্যদেব অসামান্য কাজ করেছিলেন। তখন ধর্মসাধনার নামে বিকৃত ব্যাভিচারের বন্যাস্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছিল; তখন জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতো শুকনো পুঁথিতে লিপিবদ্ধ স্মার্ত নিয়মকানুন; সমাজের রক্ষক তখন ভক্ষকের ভূমিকা

গ্রহণ করেছিল। মানবতার এমন এক রাহুকবলিত অবস্থায় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন। সহজ সরল ভক্তির এবং বিশ্বাসের, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ তিনি লোকসমাজে তুলে ধরলেন; 'আপনি আচরি ধর্ম' অপরকে শিক্ষা দিলেন। এর ফলও ফলল আশাতীত। এজন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চৈতন্যদেবকে সার্থক সমাজ-সংস্কারকের সম্মানে ভূষিত করতে হয়। মধ্যযুগের পরিবেশে এমন ব্যক্তিত্ব একান্তই দুর্লভ ছিল, তাই তিনি ভক্তের সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অবতার হয়ে উঠেছেন। মধ্যযুগের কবি-কল্পনা তাঁকে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু যুক্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হিসেবে চিত্রিত করেছে। চৈতন্যজীবনীকাব্যকার একটি বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাগবতে সৃষ্ট ব্রজগোপাল কৃষ্ণের রূপের অনুসরণে চৈতন্যদেবের রূপ সৃষ্টি করেছেন। এইজন্য চৈতন্য-জীবনীকাব্যে মানবচৈতন্য প্রাধান্য পান নি, ভক্তের বিশ্বাসে বিধৃত অবতার-চৈতন্য মুখ্য হয়ে উঠেছেন।

চৈতন্যের জীবিতকালেই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে কাব্যনাটকাদি লেখা হয়েছিল। অবশ্য এইসব গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। অদ্বৈত আচার্যই সর্বপ্রথম একাজ করেন। চৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবনকাহিনী শ্লোকসূত্রে প্রথমে গ্রন্থিত করেন মুরারী গুপ্ত। তাঁর গ্রন্থের নাম বোধহয় শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্, তবে গ্রন্থখানি মুরারী গুপ্তের কড়চা নামেই প্রসিদ্ধ। স্বরূপ দামোদরও মহাপ্রভুর জীবনকে কেন্দ্র করে কড়চা রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ অনুযায়ী মনে হয় যে মুরারী গুপ্ত চৈতন্যদেবের আদি লীলাকেই তাঁর কড়চায় রূপায়িত করেছেন এবং স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের মধ্য ও অন্তলীলার রূপকার:

আদি লীলা মধ্যে যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্যশেষ প্রভু-লীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

এই কড়চাদ্বয় ভিন্ন মহাপ্রভু সম্পর্কে কয়েক খানি সংস্কৃত নাটকও রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে কবি কর্ণপূর পরমানন্দ দাসের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়'ই প্রসিদ্ধ। কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে 'চৈতন্য চরিতামৃত' নামে মহাকাব্যও রচনা করেন। এ ভিন্ন তাঁর অন্য রচনা 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা' চৈতন্য সম্পর্কিত গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এই সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' কাব্যই বাংলায় লেখা চৈতন্য-জীবনীমূলক কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম। পরবর্তীকালে গ্রন্থখানির নাম পরিবর্তিত হয়, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্যলীলায় ব্যাস' বলে বন্দনা করেন এবং বৃন্দাবনের গ্রন্থকে ব্যাসের ভাগবত পুরাণের মর্যাদা দান করেন। এজন্য গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে 'চৈতন্য ভাগবত' নামেই প্রখ্যাতি অর্জন করে। গ্রন্থখানি যুগে যুগে বাঙালার রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করেছে, চৈতন্য-জীবনীর যত পুঁথি পাওয়া গেছে চৈতন্য ভাগবতের পুঁথির সংখ্যা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এ থেকেই গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যে তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি, কেবল নিজেকে 'নারায়ণী গর্ভজাত' বলে পরিচিত করেছেন। তাঁর পরবর্তী কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর সম্বন্ধে 'বৃন্দাবন দাস—নারায়ণীর নন্দন' বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এর ফলে বৃন্দাবন দাসের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে নানা গুজবের সৃষ্টি হয়। সে সব কথায় আমাদের কাজ নেই, কবির কাব্যপরিচয়ই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনীর মহান কাব্যকার, তিনি বৈষ্ণব-সমাজে ভাগবত পুরাণ রচয়িতা ব্যাসদেবের গৌরবে ভূষিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর কাব্য ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কবি নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন ঃ

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥

কবি তিন খণ্ডে তাঁর গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন,—আদিখণ্ড (১৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) মধ্যখণ্ড (২৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) এবং অন্তখণ্ড (১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ)। অনেকে অনুমান করেন যে অন্তখণ্ডটি আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে।

কবি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন মূলতঃ নিত্যানন্দের কাছ থেকে :

নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ত্ব ॥

তা ভিন্ন কবি অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির কাছ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এই সমস্ত উপাদানের ভিত্তিতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-জীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। অবশ্য তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলাই পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাপ্রভুর অন্তজীবন তাঁর কাব্যে বিস্তৃত সুন্দর ভাবে বিধৃত হয় নি। চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায় থেকে মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্য কৈশোর এবং যৌবনলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ কবির এই বর্ণনা প্রাণোদ্দীপ্ত, জীবন্ত এবং বাস্তবধর্মী।

আধুনিক অর্থে জীবনীসাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি চৈতন্য-দেবের জীবনকে কেন্দ্র করে সে ধরনের সাহিত্য রচিত হয় নি। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায়ই তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাঁর জীবনীকে ভিত্তি করে যাঁরা কাব্যসাহিত্য রচনা করেছেন তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ লীলার ছাঁচে গড়ে তুলেছেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্য-সূত্রেই লাভ করেছিলেন। তৎকালে প্রচলিত বৈষ্ণব ভাব দর্শনের

পটভূমিতে এবং বৈষ্ণবপুরাণ গ্রন্থাদির অনুসরণে বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্য রচনা করেন। অবশ্য এই সুনির্দিষ্ট চেতনার রাজ্যে বৃন্দাবন দাস তাঁর তথ্যানুগত্যের, বাস্তববোধের এবং আত্মপ্রেরণার স্বরূপও প্রকাশিত করেছেন। এইজন্যই তাঁর গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের দলিল স্বরূপ হয়ে উঠেছে। কবি তৎকালীন সমাজের আচার আচরণের, শিক্ষাদীক্ষার, ধর্মধারণার চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন তাতে তাঁর রচনা বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের যে ভাব-রূপ অঙ্কিত করেছেন তাতেও বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ক্ষমাসুন্দর প্রেমময় পেলব কোমলরূপেই দেখেছেন, কিন্তু বৃন্দাবন দাস তাঁর মধ্যে অগ্নিশুদ্ধ রুদ্র কঠোর রূপও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। যেখানে অন্যায়, যেখানে পাষণ্ড-পীড়নের প্রয়োজন সেইখানেই চৈতন্যদেব যেন কংসারি কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কারও অবশ্য অবৈষ্ণবদের, অবিশ্বাসীদের প্রতি বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এ সব ক্ষেত্রে কবি বৈষ্ণববিনয়ের ধার কাছ দিয়ে যান নি। এদিক দিয়ে বৃন্দাবনের কাব্য অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। মনে হয়, কবি তাঁর যৌবনে এই কাব্য রচনা করেছিলেন বলেই মতামতের ক্ষেত্রে আবেগ-পরিচালিত হয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে বৃন্দাবন দাস ভাগবতপুরাণের অনুসরণে তাঁর কাব্যের পরিকল্পনা করেছেন। এই জন্য চৈতন্যদেব যুগাবতারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য, বৈষ্ণব ভক্ত সমাজের সকাতর প্রার্থনায় আবির্ভূত হন:

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥

... ...

কলি যুগে সর্বধর্ম হরি সংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ॥

কলি যুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব পরিকরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে ॥

এই পরিকরগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ আগেভাগেই নবদ্বীপে এসে হাজির হয়েছেন। তৎকালে নবদ্বীপ অবৈষ্ণবদের, বিশেষ করে শাক্তদের দ্বারা অনুশাসিত ছিল:

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণু ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

এমন অবস্থায় বৈষ্ণবগণ মনের শান্তিতে কৃষ্ণ-কথাও বলতে পেতেন না, এমনকি তাঁদের উপহাস বিদ্রূপও সহ্য করতে হত। এমনি এক মর্মান্তিক যাতনার মুহূর্তে অদ্বৈত আচার্য 'হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।' ভক্তের এই আহ্বান ভগবান উপেক্ষা করতে পারলেন না:

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥

এবং এই অবতারে তিনি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সংকীর্তনে রত হবেন, ঘরে ঘরে প্রেম ভক্তি প্রচারিত হবে, পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়ে আনন্দ লাভ করবে।

এর পর বৃন্দাবন দাস মাতা যশোদার দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের ছায়াপাতে গৌরাঙ্গ নিমাইকে সৃষ্টি করেছেন। তার দুরন্তপনার শেষ নেই, অথচ সে ঘরপর সকলেরই নয়নমণি, 'বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন।' এই শিশুর মধ্য দিয়েই কবি ভগবৎ সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবি চৈতন্য চরিত্রের মধ্যে পূর্বাপর এই কৃষ্ণ অবতারের ভাবসঙ্গতি

বজায় রেখেছেন। এই জন্যই জগাই মাধাই উদ্ধারের কালে চৈতন্য যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তখন চক্র চক্র বলে ডাক ছেড়েছিলেন :

নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥

চৈতন্যদেবের যে লীলা-রূপ বৃন্দাবন চিত্রিত করেছেন তাতে ভক্তি বিশ্বাসের প্রাবল্যই মুখ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি তাঁর বিশ্বাসকে দার্শনিক গভীরতার স্তরে নিয়ে যান নি বলেই এই চরিত্রে আবেগময়তা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এইজন্যই চৈতন্যদেব কাজীর অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দলন করেন, তার চরম দুরবস্থা করেন এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অনুচরদের নির্দেশ দিলেন :

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥

অন্যদিকে এই রুদ্র চৈতন্যই করুণ বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে বলেছেন :

কৃষ্ণের বিরহে মুই বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া ॥

বৃন্দাবন দাস তাঁর সৃষ্ট চৈতন্যকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা ব্রহ্ম সনাতন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন, রাধাভাবের কথা তাঁর কাব্যে কিছু কিছু আছে বটে কিন্তু চৈতন্যদেবের মূল উদ্দেশ্য :

'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব'। বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্য স্পষ্টতঃই বলেছেন :

অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥

এক্ষেত্রে বৃন্দাবন বাঙালী-বৈষ্ণবের সহজ সরল বিশ্বাস দিয়ে শ্রীচৈতন্যকে রূপায়িত করেছেন, তত্ত্বের প্রাধান্য তাই তাঁর কাব্যে মুখ্য হয়ে ওঠে নি।

বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজে ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে তীব্র বিরোধ ছিল তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন। পাষণ্ডীরা (স্মার্ত ও শাক্ত মতাবলম্বীরা) বৈষ্ণবদের ওপর হাড়ে চটা ছিল। তারা বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে বলতো ঃ

এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে ত্বর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥
... ...
কেহো বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ॥

এ ভিন্ন পাষণ্ডীরা বৈষ্ণবদের সম্পর্কে নানা ধরণেব কুৎসা রটনা করতো। শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণবদের নামসংকীর্তনকে কেন্দ্র করে তারা বলতো ঃ

কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥
... ...
কেহো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক ত্বয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥

লোক সমাজের এই বৈষ্ণব বিরোধিতার জন্যই তৎকালীন শাসকও বৈষ্ণববিরোধী হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব স্বমহিমা প্রকটিত

করে ভক্তদের মনে আস্থা এনে দেন এবং সমাজেও বৈষ্ণবধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বৃন্দাবনের কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন চিত্রিত হয়েছে সন্ন্যাস অবলম্বনকারীর সমস্ত কঠোরতা দিয়ে, কিন্তু তাঁর একান্ত প্রিয় নিত্যানন্দ বিলাসী জীবন যাপন করেছেন। বৈষ্ণবধর্ম তৎকালে একই সঙ্গে বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যকে যেন গ্রহণ করেছে।

বৃন্দাবনের কাব্য রত্নের আকর। এই কাব্যের মধ্যে বাঙালীর জীবন-সাধনার বিচিত্র দিক প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য হয়েও চৈতন্যভাগবত তৎকালীন সমাজজীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে। এ জন্য গ্রন্থখানি এখনো নৈষ্ঠিক পাঠকের নানা কৌতূহল মিটিয়ে দেয়। চৈতন্যভাগবতের সহজ সরল ছন্দপ্রবাহ, পরিমিত সুন্দর অলঙ্করণ রীতি এই কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ গতি, উপমা রূপকের দ্যুতি কাব্যখানিকে সর্বজনের বোধের সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। কাহিনীগত দিক থেকে বিচার করলে কাব্যখানিতে ক্রমভঙ্গের দোষ এবং অন্যান্য ছোটখাট কিছু দোষ পাওয়া যায়। কিন্তু কবির আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং ভাবাবেগ সমস্ত দোষত্রুটিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এই কাব্যকে বাঙালীর প্রাণের সম্পদ করে তুলেছে। কবি তাঁর সমস্ত ভাবকে মন্থিত করে শ্রীচৈতন্যদেবের দি'ব্যাত্মত্ত রূপ বর্ণনা করেছেন :

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুল দাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
জিনি মদ-মত্ত হাতী পরম মন্থর গতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি
গোঁর অঙ্গে লহরী খেলায়॥

চলিতে নাহিক পারে গোরাচাঁদ হেলে পড়ে
বলিতে না পারে আধোবোল।
ভাবেতে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল ॥

অন্তরের বেদনার্ত অশ্রুকে মন্থিত করে কবি পুত্র-বিচ্ছেদকাতরা শচীমাতার আর্তি সৃষ্টি করেছেন:

না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া
পাগলিনী আছয়ে সবে তোর মুখে চাইয়া ॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্বথা ছাড়িমু ॥

বৃন্দাবন দাস ভক্তির পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু মানবীয় বোধ অনুভূতি তাঁর সেই পঞ্চপ্রদীপের দাহ্য উপাদান। এইজন্যই তাঁর কাব্য অমরত্ব লাভ করেছে।

চৈতন্যজীবনীকাব্যের ধারায় বৃন্দাবন দাসের কাব্যের পরেই লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের প্রসঙ্গ আসে। ১৫৫৫-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কাব্যখানি রচিত হয়। কবি ছিলেন নরহরি সরকারের শিষ্য—'নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা।' পূর্বাচার্যদের চৈতন্য-বিষয়ক রচনাদি থেকে বিশেষতঃ মুরারী গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত থেকে কবি তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কবি স্পষ্টতঃ তাঁর কাব্যের কাহিনী বিন্যাস করেছেন মুরারী গুপ্তের কাব্যের অনুসরণে। অবশ্য কবির কাব্যে লোকশ্রুতির প্রভাবও যথেষ্ট। কাব্যোপাদানগত দিক থেকে কিম্বা শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের ওপর নতুন আলোকপাতের দিক থেকে অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে লোচনদাসের কাব্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য অন্যতর। লোচনদাস নরহরি সরকারের প্রভাবে 'গৌর-নাগর' ভাবের সাহায্যে চৈতন্যচরিত্রকে দেখেছেন এবং লোচনদাসের কাব্যে

চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—এই দুটি দিক থেকে লোচনদাসের কাব্য উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কবির এই বৈশিষ্ট্য দুটিতে চৈতন্যচরিতের মহিমা ফুটে ওঠে নি বরঞ্চ অনেকখানি পরিমাণ শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। চৈতন্যদেবকে দেখা মাত্র নবদ্বীপের যুবতীরা মদনাবেশে আত্মহারা হয়েছে, কেউ কেউ আবেশাতিশয্যে চৈতন্যদেবের গায়েই ঢলে পড়েছে আর চৈতন্যদেব সমস্ত বিকার নির্বিকারে সহ্য করছেন—এই হলো গৌরনাগরভাবের প্রতিপাদ্য বিষয়। নরহরিদাস এই তত্ত্বের প্রধান প্রচারক, তিনি এবং তাঁর শিষ্য লোচনদাস এই ভাবকে কেন্দ্র করে অনেক পদ রচনা করেছেন। লোচনদাস চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যেও এই ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চৈতন্যদেবের দাম্পত্য জীবনের চিত্র অন্য কোন জীবনীকাব্যকারই আঁকেন নি, বিশেষতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্য জীবনীকাব্যে উপেক্ষিতাই রয়ে গেছেন, কেবলমাত্র লোচনদাস তাঁর প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যখণ্ডে আছে যে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ পেয়ে সন্ন্যাসগ্রহণের দু-একদিন আগের এক রাত্রে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ

কহ কহ প্রাণ নাথ মোর শিরে দিয়া হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে পবেশিব আমি॥

পত্নীর এ কথায় চৈতন্যদেব উত্তর দিয়েছেন ঃ

আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
এ কথা বা কে কহিল তোরে।
যে করি সে করি যাব তোমারে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে॥

দাম্পত্যজীবনের এমনতর চিত্র গ্রহণে আপত্তি থাকার কথা নয়, যদিও প্রশ্ন থাকে যে সন্ন্যাস গ্রহণের দু একদিন আগে চৈতন্যদেব আদৌ স্ত্রীর মুখোমুখি হয়েছিলেন কিনা। কিন্তু লোচনদাস আরও

অধিকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চৈতন্যদেব পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য, তিনি যে সন্ন্যাসী হবেন না এ কথার প্রমাণ দিতে দাম্পত্য লীলায় প্রমত্ত হয়েছেন :

ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানা রস কৌতুকে বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥

কিন্তু এই শেষ নয়, সন্ন্যাস গ্রহণের মাত্র একদিন আগে চৈতন্যদেব স্ত্রীর দেহকে নিজহাতে সাজিয়েছেন, তাঁর রূপে বিমুগ্ধ হয়েছেন :

ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ নিরীখে বদন।
অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজ লতা বেঢ়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
... ...
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥

অবশ্য কবি এই ধরণের পরিস্থিতির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন :

বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমতচিত॥
এসময়ে বিথরয়ে রঙ্গরসভাব।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥

এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে দাম্পত্যলীলায় প্রমত্ত চৈতন্যের কথা চিন্তা করা যায় না। বলা বাহুল্য নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব-সমাজে কবি এ সবের জন্য যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য লোচনদাস যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রামাণিক জীবনী কাব্য রচনার উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্য লিখতে বসেছিলেন তা মনে করার কোন কারণ

নেই। তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন মুখ্যতঃ জনরুচির ওপর রেখে। এইজন্যই তাঁর কাব্য সুরতাল সংযোগে গেয় পাঁচালী এবং মঙ্গলকাব্যের রীতির মিশ্রণে রচিত, একাব্য লোকসমাজের আনন্দ-বর্ধনের জন্য। এইজন্যই বালক নিমাই যেভাবে মুরারী গুপ্তকে জব্দ করেছেন তা নিতান্তই স্থূল এবং গ্রাম্য।

এই ধরনের স্থূলতার স্পর্শ লোচনদাসের কাব্যে প্রচুর আছে। তৎকালীন লোকরুচির প্রতি কবির অত্যধিক সচেতনতা থাকায় এমনটা হয়েছে। এসব ক্রটি সত্বেও লোচনদাসের কাব্যে কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পবিচয় আছে। তাঁর কাব্য সুরলালিত্যে পরিপূর্ণ, বর্ণনার সঙ্গীত তরঙ্গ শ্রোতাদের মর্মে প্রবেশ করে আনন্দঝঙ্কার তুলতো। কয়েকটি বর্ণনার সাহায্যে লোচনদাসের বর্ণনাশক্তির, কবি-সামর্থ্যের পরিচয় লাভ করা যেতে পারে। কবি তাঁর অন্তরের ভাবরাশিকে মথিত করে গৌরাঙ্গদেবের রূপ সৃষ্টি করেছেন ঃ

অমিয় মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গাড়ল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
একৈভেল শুধুই সুনেহা॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ পেয়ে শচীমাতার মনের অবস্থা কেমন হযেছিল কবি তার অত্যন্ত সংবেদনশীল বেদনাকরুণ চিত্র এঁকেছেন ঃ

এমন কেনে হলে গোরাঙ্গ এমন কেনে হলে।
নটবর বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে॥
সুরধুনী তীরে নিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদ মুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও॥
এক বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই ঘরে বসে থাক॥
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যেও কবি বেদনাময় আর্তি সৃষ্টি করেছেন, গৌরাঙ্গদেবের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া সকরুণ মিনতি করেছেন :

না যাইহ দেশান্তরে কেহো নাহি এ সংসারে
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা অন্তরে মরম ব্যথা
কান্দে মাত্র চরণ ধরিয়া ॥

কবি মানব-রসকে মুখ্য করেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, এই জন্যই তাঁর কাব্য চৈতন্যদেবের জীবনী না হয়ে চৈতন্যজীবনের ছায়া অবলম্বনে রচিত মৌলিক কাব্য হয়েছে। রসাত্মক বাক্যের সংযোজনায় এ কাব্য পরিপূর্ণ, কবিমনোভূমিতে অঙ্কুরিত সত্যই এ কাব্যের উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

চৈতন্যজীবনীকাব্যধারার পরবর্তী কবি হলেন জয়ানন্দ। তাঁর কাব্যও চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছেপিঠে কোন সময়ে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যও প্রধানতঃ জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত। এই জন্যই কবি তাঁর কাব্যের অংশগুলিতে রাগ রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, শ্রোতার আসরে গানের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য পরিবেশিত হতো। জয়ানন্দ গতানুগতিক ভাবেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, তথাপি তাঁর কাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। কবি তৎকালীন মুসলমান শাসকের অত্যাচারের যে রূপ পরিস্ফুট করেছেন তাতে তাঁর বাস্তব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
... .
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে ॥

এ ভিন্ন তৎকালীন হিন্দুসমাজের যে চিত্র কবি এঁকেছেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ :

বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী ॥
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
তুই তিন চারি বর্ণে হৈল একাকার ॥
... ...
কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন।
সর্বলোক হৈল শিশ্নোদর পরায়ণ ॥

আর একটি দিক দিয়েও জয়ানন্দ বাস্তবানুগামিতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্পর্কে কোন কবিই সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দেন নি, কারও মতে মহাপ্রভু সমুদ্রে মিলিয়ে গিয়েছিলেন, কেউবা বলেন মহাপ্রভু জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে যান। জয়ানন্দ লিখেছেন যে মৃত্যুকালে মহাপ্রভুর পায়ে ইট বিদ্ধ হয় এবং সেই ক্ষতের জন্যই তাঁর মৃত্যু হয় :

আষাঢ় বাঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
... ...
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥
....
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥

জয়ানন্দের এই বর্ণনা সত্য কিনা তা নির্ণীত হয় নি, তবে এর মধ্যে যে বাস্তবতা আছে তা স্বীকার করতেই হয়।

জয়ানন্দের কাব্যে আরও একটি দিক লক্ষণীয়,—কবি বংশানুক্রমে বৈষ্ণব হলেও সম্পূর্ণতঃ বৈষ্ণব হতে পারেন নি। তাঁর

কাব্যে শক্তিদেবতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে, অত্যাচারী সুলতানকে স্বপ্নযোগে 'কালী খড়্গ খর্পরধারিণী দিগম্বরী' ভয় দেখিয়ে বলেছেন :

আজি তোর গঙ্গায় পেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥

এদিক দিয়ে জয়ানন্দ নিশ্চয় তৎকালীন সমাজে শক্তি-প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার জন্যই শক্তিদেবী কালিকার অসুরনিধনকারীমূর্তি অঙ্কন করেছেন।

কবি জয়ানন্দ চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা পোষণ করতেন তাও প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা থেকে পৃথক। তাঁর চৈতন্যদেব ভাবাবেশে নৃত্য করাব কালে বলেছেন :

আরে রে সংসারে লোক দেখ মোব নাট।
ক্রয় বিক্রয় কর মোব প্রেমের হাট॥
কার মাতা কার পিতা স্বামী পুত্র সখা।
স্বপ্ন হেন সংসার কাব সনে কার দেখা॥
বাজিকর নাচাএ যেন কাষ্ঠের পুত্তলী।
তেমত সংসাব নাচাএ কৃষ্ণ করে কেলি॥
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা পরিবার।
যথা এ সম্পদ তথা বিপদ অপাব॥
কত জন্ম মরণ নিশ্চয় নাহি জানি।
রমণী জননী হয় জননী রমণী॥
কমল পত্রেব জল জেন স্থিব নহে।
তেমত চঞ্চল জীব একত্র না রয়ে॥
সম্পদ বিপদ যত সর্ব কর্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল॥

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে এ বিশ্লেষণ, এই উপলব্ধি মায়াবাদী ; এই উপলব্ধির সঙ্গে শঙ্করাচার্যেব 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' ইত্যাদি মোহমুদ্গরের ভাবের মিল লক্ষ্য করা যায়। জয়ানন্দের কাব্য কেন যে বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয় নি তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল মঙ্গলকাব্যধারার ছাঁচে ফেলে গড়া। এই জন্যই কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা রচনা করেছেন। জয়ানন্দের বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবকে সস্ত্রীক ধর্মাচরণের কথাও বলেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব দুহাতে কান ঢেকে সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলেছেন:

জথা তথা চল তুমি সঙ্গে যাইব আমি
আমা না ছাড়িবে দ্বিজরাজ।
করিব তোমার সেবা সেহ আমার শোভা
গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ ॥

কিন্তু এই আত্মনিবেদন, এই আর্তি বিফল হয়েছে:

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী জত কৈলা নিবেদন।
দৃক্‌পাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ ॥
শ্রবণ যুগলে প্রভু দিএগ দুই হাথ।
জয়ানন্দ বলে প্রভু হা নাথ হা নাথ ॥

এ চিত্রকে অসঙ্গত বলে মনে হয় না। বরঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখবেদনা, অন্তরের হাহাকার সহজেই পাঠক মনে প্রভাব বিস্তার করে। পাঠক বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে সহানুভূতিশীল হন। জয়ানন্দ তাঁর কাব্যকে জনসাধারণের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য এখানে পাণ্ডিত্যের, দার্শনিকতার, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সহজ সরল বিশ্বাসের কোন অভাব দেখা যায় না।

এক দিক দিয়ে লোচনদাস ও জয়ানন্দ বাঙালী স্বভাবের আনুগত্য স্বীকার করে চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করেছেন। সাধারণতঃ বাঙালী বিশ্বাসপ্রবণ, সে তার শ্রদ্ধা বিনম্র মন নিয়ে বিশ্বাস বিস্ফারিত দুচোখ ভরে সমস্ত কিছুকেই ভাবের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে চায়। তা ভিন্ন, দর্শনের বা তত্ত্বের কথার চেয়ে রসের কথার দিকেই তার প্রাবল্য বেশী।

লোচনদাস ও জয়ানন্দ বাঙালীহৃদয়ের ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাদের কাব্য রচনা করেছিলেন। এ জন্য এই

কবিদ্বয়ের রচনায় ইতিহাস অপেক্ষা লোক বিশ্বাস এবং লোকশ্রুতি, জ্ঞান ও তত্ত্ব অপেক্ষা রসাশ্রয়ী চেতনা, দার্শনিকতা অপেক্ষা আবেগ-প্রবণতা বেশী মূল্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন শ্রীচৈতন্য-জীবনী। উপাদানকে তাঁরা তৎকালীন যুগের কাব্যরীতির ছাঁচে গড়ে তুলেছেন। এই জন্যই তাঁদের কাব্যে, পাঁচালীর গেয় রূপ, মঙ্গলকাব্যের বিন্যাসরীতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাব্যলোক সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত। সে দিক দিয়ে আমরা তাঁদের কাব্য থেকে চৈতন্যদেব সম্পর্কে জনবিশ্বাসের রূপ কেমন ছিল তা জানতে পারি। পক্ষান্তরে জনমানসে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও প্রতি-ক্রিয়ার স্বরূপও তাঁদের কাব্যের সাহায্যে লাভ করা যায়।

চৈতন্য জীবনী কাব্যধারার পরবর্তী কবি হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সর্বকালের বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কাব্য বাংলা কাব্যধারায় সুউন্নত তরঙ্গ-ভঙ্গ। কবির পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, রসজ্ঞান, মনীষা প্রভৃতির কথা বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে সাহিত্যসৃষ্টির জগতে এমন প্রতিভার সংখ্যা সুলভ নয়। কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনের মহাভাষ্যকার। তিনি চৈতন্যভাব-জীবনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চৈতন্য ভাবানুভূতির শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বাঙালী মনীষার গৌরবমণ্ডিত দৃষ্টান্ত। সাধারণভাবে বাঙালী আবেগপ্রবণ, ভাবকল্পনাবিলাসী, রসিক। কিন্তু মনীষার ক্ষেত্রেও যে তার আলোকদৃপ্ত জয়স্তম্ভ বিরাজিত তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, বঙ্গজননীর ভাণ্ডারে বিবিধ রতন, বঙ্গজননী রত্নপ্রসবিনী। কৃষ্ণদাস অন্যতম রত্ন, তাঁর কাব্য বঙ্গজননীর ভাণ্ডারের বিশিষ্ট সম্পদ।

কৃষ্ণদাসের পূর্বে চৈতন্যজীবনের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতে তিন-খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (কাব্য ও নাটক) এবং বাংলায় অন্ততঃ তিনখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেন নি, তিনি চৈতন্য জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার ভাষ্য, বৈষ্ণবধর্মদর্শন

ও রসচেতনার মননিষ্ঠ ধারণা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর স্তূপ নেই, কিন্তু সে জন্য আক্ষেপও নেই। যাঁরা তাঁর কাব্য থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে যান তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।' কৃষ্ণদাসের রচনা চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের কবিত্বময় দার্শনিক ভাষ্য। এদিক দিয়ে তাঁর কাব্যের মতো সৃষ্টি সুদুর্লভ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যের নাম 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। এই গ্রন্থ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল বলেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এই গ্রন্থে কবির যে আত্মপরিচয় আছে তা থেকে জানা যায় যে তিনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে তাঁর জন্ম হয়। কবির পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তাদের বাড়ীতে গৃহদেবী শ্রী মূর্তি ছিল; দেবীর পূজা করতেন গুণার্ণব মিশ্র নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণ। কবি নিজের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে নানা অনুষ্ঠানের, নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করতেন। একদিন সংকীর্তনের আসরে নিত্যানন্দের এক শিষ্য মীনকেতন রামদাস আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিনি আসরে নিত্যানন্দ গুণকীর্তন করার কালে গুণার্ণব মিশ্র এবং কৃষ্ণদাসের অনুজের বিরোধিতা লাভ করেন, ফলে সক্রোধে আসর ত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ—উভয়েরই ভক্ত ছিলেন। এজন্য অনুজের আচরণ তাঁকে ব্যথিত করে এবং অনুজকে তিনি ভর্ৎসনা করেন। সেইদিন রাত্রেই কৃষ্ণদাস স্বপ্ন দেখেন যে নিত্যানন্দ 'নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে' এবং কবিকে বললেন,

অরে রে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্বলভ্য হয়।।

পরদিন প্রভাতেই কবি বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু

করলেন। বৃন্দাবনে এসে কবি সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি গোস্বামীদেব কৃপায় বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও দর্শনে প্রগাঢ় অধিকার লাভ করলেন। আজীবন তিনি অকৃতদাব ছিলেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদির অনুশীলনেই তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। জ্ঞানেব গভীরতা তাঁকে বিনযাবনত কবেছিল, শিশুর সাবল্যে পরিপূর্ণ করেছিল, আত্মাভিমানলেশশূন্য কবে দিয়েছিল ঃ

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষীরাভা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রেব পানি ॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলাব।
এ দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুব লীলার বিস্তাব ॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা কবি অভিমান।
আমাব শবীব কাষ্ঠ পুত্তলি সমান ॥

বয়সেব ভাবে অবনত, জবাতুব বৃদ্ধ কবি এই কাব্য বচনা কবেছেন, পাঠক তাঁর কাব্য পড়লে তিনি কৃতার্থ হবেন ঃ

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহাব চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে ॥
শ্রোতাব পদবেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমার এ অমৃত পীলে সফল হৈল শ্রম ॥

কৃষ্ণদাসেব চবিত্রে বিদ্যা ও বিনয় অপূর্বভাবে মিশে গেছে। একেই বলে প্রকৃত বৈষ্ণব-বিনয়। এদিক দিযে তিনি বাঙালী সাহিত্যসাধকের মধ্যে, বাঙালী মণীষীদের মধ্যে অনন্য। তাঁব কাব্যের বহুক্ষেত্রে নিত্যানন্দেব প্রতি আভূমি প্রণতি আছে, বৃন্দাবনেব গোস্বামীদের প্রতি, তাঁব গৃহশিক্ষকেব প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা আছে। গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কবে তিনি তাঁব কাব্য শুরু করেছেন। এসব অবশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু এই পরম প্রাজ্ঞ কবি অসীম শ্রদ্ধায় শ্রোতাদেব পদবেণু মাথায় রাখতে চেয়েছেন, এ দৃষ্টান্ত বিবল।

কৃষ্ণদাস চৈতন্যতিরোধানের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, বাংলাদেশ

থেকে বহুদূরে বৃন্দাবনে বসে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য যেন তাঁর পূর্বাচার্যদের সমস্ত সাধনার, সকল প্রচেষ্টার, সার্বিক উপলব্ধির, সমস্ত সিদ্ধির অমৃত রূপ।

কাব্যরচনার কালে কৃষ্ণদাস প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন :

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোব স্থির॥
নানা বোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি।
পঞ্চ বোগেব পীডায় ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি॥

কবির এই বর্ণনায় আতিশয্য থাকলেও থাকতে পাবে, কিন্তু কথা হলো, কবি তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনাকে সম্বল করে তাব প্রখ্যাত কাব্য রচনা করেছেন। ফলে এ কাব্যেব সর্বত্র ভাবসংহতি ও ভাব-গভীরতা পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য কাব্যখানি কবিতার সীমা ছাড়িয়ে দার্শনিকতার জগতে প্রবেশ কবেছে। তাঁর কাব্য সুগভীর মনন, সুপরিণত বোধ এবং সহজ বিশ্বাসকে অবলম্বন করায় কাব্যের বক্তব্য সুদূব প্রসারী হয়ে পড়েছে। অতিদুরূহ তত্ত্বকেও কবি একান্ত সহজ করে প্রকাশ করতে পেরেছেন, কাবণ চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁর মানস-লোককে মণ্ডিত কবে বেখেছিল। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলাকেই মুখ্যতঃ তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কারণ বৃন্দাবনেব গ্রন্থে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নি। এজন্য বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দ তাঁর ওপব সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন :

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥
....
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥

নিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥

কৃষ্ণদাস অতিশয় সংকোচে এই দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন :

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥

কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন দাস, স্বরূপ দামোদর, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি পূর্বসূরীদের গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'লীলাসূত্র' লিখেছেন। কেবল বৃন্দাবন দাস যেখানে চৈতন্যলীলার বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইখানেই মাত্র বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তলীলাই কৃষ্ণদাসের কাব্যেব উপজীব্য বিষয়ী শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলা বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ—চৈতন্যদেবের অন্তলীলা তাঁর জীবনসাধনার পরিপূর্ণ রূপকে দ্যোতিত করে, তাঁব হৃদয় উৎসের সম্পূর্ণ রসকে নির্ঝরিত করে। এই গুরুত্বপূর্ণ চৈতন্যজীবনঅধ্যায় কৃষ্ণদাসের চেতনা-মানসের দ্বাবাই প্রকটিত হওয়া সম্ভব। সেদিক দিয়ে কৃষ্ণদাস যেন এক অসাধ্যকে সাধন কবেছেন, তার দায়িত্ব যে অত্যন্ত গুরুভার কবি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং কবি মুহূর্তের জন্যও তাঁর লেখাকে শ্লথ হতে দেন নি। ভক্ত কবি তাঁর পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়েই এ কাব্য রচনা করেছেন। বার্ধক্য কবিকে প্রবলভাবে আক্রমণ করায় কবির মনে শঙ্কা জেগেছিল যে তিনি কাব্য শেষ করতে পারবেন কিনা :

শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিত লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥

কবির এই শঙ্কাতুর মনোভাব সম্ভবতঃ তাঁর বোধবুদ্ধি, চেতনা এবং আন্তরিকতাকে সংহত ও তীক্ষ্ণ করে দিয়েছিল। সেই সংহতি ও তীক্ষ্ণতার সহায়তায় তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ভাবানুভূতি ও নিবিষ্ট রসবোধ তাঁর কাব্যে স্বচ্ছ সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জন্য তাঁর কাব্য চৈতন্যজীবনী ও বৈষ্ণবদর্শনের অপূর্ব সম্মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অন্ত্য—চৈতন্যজীবনের এই তিনটি লীলা আছে। আদি লীলায় মোট ১৭টি পরিচ্ছেদ আছে, মধ্যলীলায় আছে ২৫টি পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলা ২০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদি লীলায় কবি তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কবি তাঁর কাব্যে মূলতঃ চৈতন্যজীবনীসূত্রকে অবলম্বন করে বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-দর্শন প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন, ফলে তথ্যগত প্রয়োজন তাঁর গ্রন্থ থেকে না মিটলেও গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ভাবদর্শনের আত্মানুভূতিতে পরিপূর্ণ। আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কবি চৈতন্যঅবতারের মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ রাধা-প্রেম লাভ করার পর সেই প্রেমের তাৎপর্য অনুসন্ধানের জন্যই কলিতে চৈতন্যদেহে আবির্ভূত হন :

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ॥

সুতরাং সেই প্রেমাস্বাদের জন্য কৃষ্ণ :

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্মনাম প্রেম কৈল পরচার ॥

যুগধর্ম পালনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কাজি দলন করেছেন, জগাই মাধাই উদ্ধার করেছেন এবং কলিযুগসার নাম-সংকীর্তন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এ সবের অন্তরে রয়েছে :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা তুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই তুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হইল এক ঠাঁই ॥

এই রস আস্বাদনের সাধনায় চৈতন্যদেব তিলে তিলে যেন আত্মাহুতি দিয়েছেন, প্রতি মুহূর্তে প্রেমের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছেন এবং জীবনের শেষ বারো বছর, দিব্যোন্মত্ত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন :

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভোজন কৃত্য ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দেরে লইয়া।
আপন মনের কথা কহে উঘারিয়া ॥

মনের কথা বলতে বলতে চৈতন্যদেব রাধাময় হয়ে যেতেন, রাধা-প্রাণের সুতীব্র আর্তিতে বেদনা-ব্যাকুল হয়ে উঠতেন :

সব ত্যজি ভজি যাঁরে যে আপন হাতে মারে
নারী বধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি উলটি না চাহে হরি
ক্ষণ মাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥
কৃষ্ণ কেনে করি রোষ আপন তুর্দৈব দোষ
পাকিল এ মোর পাপ ফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তাঁরে হৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥

কবি কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের এই প্রেম-ব্যাকুল, আত্মহারা তন্ময় রূপ আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ভক্তির ঐকান্তিকতায়, রসের নিবিড়তায়, অনুভূতির তীব্রতায় এই সৃষ্টি প্রাণময় হয়ে উঠেছে। এই সৃষ্টির ছত্রে ছত্রে ঐতিহাসিক তথ্য না পেলে

ক্ষতি কি? বাঙালীর বিশ্বাসপ্রবণ মনের অমৃতমন্থনে কবি চৈতন্য-দেবের জীবনী প্রতিফলিত করেছেন, বাঙালী বাস্তবজীবনে যেমন ভাব-জীবনেও তেমনি আবেগ সমুত্থিত প্রেমের অধীন—একথা কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতের মধ্য দিয়ে প্রকটিত করেছেন।

কবি ছোট ছোট উপমার সাহায্যে তাঁর তত্ত্ব-ব্যাখ্যাকে প্রাঞ্জল করে তোলায় আমরা কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির সুন্দর সার্থক পরিচয় পাই:

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

অথবা অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান॥

কৃষ্ণদাসের দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এই পরিচ্ছন্নতা তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কবির কবিত্ব শক্তি; অন্তরের সংহত আবেগ নিয়ে কবি অন্ত্যলীলায় দিব্যোন্মত্ত চৈতন্য-দেবের রূপ ও অন্তঃসৌন্দর্য ব্যক্ত করেছেন:

রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু থাকে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি॥

এই আবেশের বশে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-প্রেম বিরহে ব্যাকুল হয়ে বলেছেন ঃ

সখি হে,　　　না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
　　সুখ লাগি কৈলুঁ প্রীত　　হৈল দুঃখ বিপরীত
　　　　তবে যায়, না রহে পরাণ ॥
　　অগ্নি যৈছে নিজ ধাম　　দেখাইয়া অভিরাম
　　　　পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
　　কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ　　দেখাইয়া হরে মন
　　　　পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥

শ্রীরাধার ভাবরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও কবির সহজসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে ঃ

রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্ট শাটি পরিধান ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
সৌন্দর্য কুম্‌কুম্ সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গে বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥

রাধিকার এই ভাবরূপের বর্ণনায় সৌন্দর্যের সঙ্গে দার্শনিকতার যে অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে তা কৃষ্ণদাসের পরিণত চেতনার পক্ষেই সম্ভবপর।

কৃষ্ণপ্রেমের তাৎপর্য বিশ্লেষণেও কবি একান্ত সহজ প্রকাশভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন ঃ

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু পাই তার একবিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিযায়॥

কৃষ্ণদাসের সৃজনীশক্তি দার্শনিকতার সঙ্গে কবিত্বশক্তির, ইতিহাসের সঙ্গে ভাবময়তার, অন্তরের আবেগের সঙ্গে প্রজ্ঞার, জ্ঞানের সঙ্গে রসের, সহজসরল ভক্তির সঙ্গে বোধের, অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে উপলব্ধির অনিন্দ্যসুন্দর সংমিশ্রণ সাধন করেছে। কবির কর্তব্য দুরূহ কিন্তু বাংলার পয়ার ত্রিপদীর দেহে কবি সেই দুরূহ কর্তব্যকে অনায়াসে সংস্থাপিত করেছেন, অতি পরিচিত উপমা ইত্যাদির সাহায্যে তার মধ্যে প্রাণরস সঞ্চার করেছেন। তিনি বাংলা কাব্যের ধারাকে সমুদ্রাভিমুখী করে দিয়েছেন। তাঁর কাব্য সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্ত রূপদ্যোতনার প্রতিফলক। কৃষ্ণদাসের কাব্যের অন্য একটি দিক আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। মধ্যযুগের ধারায় আদিরসের বাহুল্য লক্ষিত হয়, অথচ কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে কেন্দ্র করেও যখন কিছু লিখেছেন তখন সেখানে তথাকথিত আদিরস অনুপস্থিত। মধুররসের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দেখিয়েছেন তথাপি তার কোন আবেগময় চিত্র আঁকেন নি, অথচ সুযোগ যে ছিল না তা নয়। কবি সে দিক দিয়ে বাঙালীর বিদগ্ধ রুচির, বাঙালীর পরিশীলিত প্রজ্ঞার সার্থক দৃষ্টান্ত।

চৈতন্যজীবনীর অন্য একজন রচয়িতা গোবিন্দ দাস। তাঁর গ্রন্থ 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে অভিহিত। কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থখানি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নিঃসংশয় নন, গ্রন্থখানিকে জাল বলেই অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তা ছাড়া এই গ্রন্থ কোন দিক

দিয়েই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে না, অবশ্য অবিশ্বাস্য অনৈতিহাসিক গালগল্পের কথা বাদ দিলে। সুতরাং এ গ্রন্থ যে চৈতন্যজীবনী জানার পক্ষে, কিম্বা বাংলাকাব্যের গতিপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে উপযোগী নয় তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এজন্য আমরা আমাদের আলোচনা-ধারা থেকে এ গ্রন্থকে বাদ দিলাম। অন্য একখানি গ্রন্থ সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। সে গ্রন্থখানি হলো চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' বা 'ভুবনমঙ্গল'। গ্রন্থখানির একখানি খণ্ডিত পুঁথিমাত্র পাওয়া গেছে। এ থেকেই জনপ্রিয়তার বিচারে গ্রন্থখানির গুরুত্ব বোঝা যায়। অবশ্য এই গ্রন্থে চৈতন্যজীবনী সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, অবশ্য এই তথ্যগুলি কতখানি পরিমাণে খাঁটি তার বিচাব এখনো হয় নি।

চৈতন্যজীবনীকাব্যের নিদর্শনে মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যধারায় নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, বীরচন্দ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকদের জীবনী অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হয়েছে। তবে তাদের কাব্য মূল্য এত সামান্য যে তার উল্লেখ না করলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথাই আমাদের মনে হয় যে চৈতন্যদেবের জীবনী বাংলা-কাব্যধারায় মর্তমানবের মহিমাকে এই ধূলার ধরণীতে উজ্জ্বল করে রেখেছে। মধ্যযুগের মানুষ অলক্ষ্য দেবতার পরিবর্তে কায়াধারী মানব-দেবতার মানবতার অম্লান সুন্দর রূপকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের জীবনী কাব্য সেই মানব-প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

চৈতন্যজীবনীকাব্য নির্ঝরের পরেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য-ধারায় বিপুল ব্যাপক স্থান অধিকার করে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। পদাবলী সাহিত্য যেন সমুদ্র মোহনার বিচিত্র কলতানে পরিপূর্ণ সীমাহীন সঙ্গীত-লোক। চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে পদাবলী যৌবনবাগ তরঙ্গিত অমৃতমাধুরীর কান্তিতে ভূষিত হয়ে, মোহনার বিস্তৃত পটভূমিতে আনন্দ-নৃত্যে আত্মহারা হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীকারদের সাধনা যেন সিদ্ধি লাভ করেছে চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীকারদেব রচনার মধ্যে। এই বিরাট বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার, জীবন-সাধনার অমৃত ফল, সুধা সমুদ্র। যুগে যুগে বাঙালীচিত্ত এই পদাবলী সাহিত্যের রসধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, পরিতৃপ্ত হয়েছে।

চৈতন্যপূর্বযুগ থেকেই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে গীতিরস সমুজ্জ্বল পদ বচিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। চৈতন্যদেব তাঁর জীবন-সাধনার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যপ্রেমের অলৌকিক লীলা-রূপকে প্রকটিত করেন। আধ্যাত্মিকতার ধারাস্রোতে, বিশিষ্ট দার্শনিক চেতনার আলোকপাতে চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের বিলাসকলার গতি-প্রকৃতিকে উর্ধ্বমুখী করে তাকে মন্দাকিনী ধারার কূলপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। অথচ পদাবলীকারগণ মানবীয় রসের আবেষ্টনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় স্বরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য-পরিক্রমা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
> পূর্বরাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান,
> অভিসার-প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
> বৃন্দাবন-গাথা—এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার।
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

...   .

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে!

এই উদ্ধৃতির পর বৈষ্ণবকবিতা বিচারের রীতি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার থাকে না। ভক্ত বৈষ্ণব ধর্মচেতনার বশবর্তী হয়ে যতই বলুন না কেন যে বৈষ্ণবপদাবলী কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠের গানের, রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমেরই কবিতারূপ, সে বক্তব্য মেনে নিলে পদাবলীর রসবিচারে ঘোর অবিচার করা হবে। ধর্মের ছত্রছায়ায় রচিত এই পদাবলী সাহিত্যে মানবজীবনরসকেই মুখ্য করে তুলেছে; সেই রসের প্রবাহ থেকে কলস ভরে নিয়ে মানুষ আপন

রসতৃষ্ণা, প্রেমতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ মানব-অন্তরের প্রেমবৃত্তির সার্থক প্রতীক। অবশ্য পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অলৌকিকত্বও প্রতিফলিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও নিছক সাহিত্য বিচারে এই পদগুলির তাৎপর্যও বড় কম নয়। মানবহৃদয়ের তীব্র ভাবানুভূতি নিবিড় নিটোল মুক্তাবিন্দুর মত সম্পূর্ণতা লাভ করে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবপদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ যথার্থ। রাধাকৃষ্ণের পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমলীলার যে বিতর্কিত দিকটি বহুকাল ধরে চলে আসছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র আস্বাদনবৃত্তির এবং সহৃদয় অনুভূতির সাহায্যে তারই ওপর আলোক সম্পাত করেছেন।

বৈষ্ণবপদাবলী শুধুমাত্র দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অম্লান সুন্দর পুষ্পবাজি নয়। মানুষের কামনা বাসনার, মানবীয় হৃদয়বৃত্তির সুগভীর তলদেশ থেকে উত্থিত সহস্রদল হয়েই বৈষ্ণবপদাবলী বিকশিত হয়ে উঠেছে। দেবতা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, এই পদাবলীর জগতের আসল লক্ষ্য পার্থিব নর-নারীর প্রণয়কলার বিভিন্ন অবস্থার বিচিত্র লীলাবিলাস। বাঙলাদেশের মর্তমৃত্তিকায় এই প্রণয়চেতনার স্পন্দন সুতীক্ষ্ণ হয়ে যুগে যুগে বাঙালী কবির ভাবানুভূতিকে তরঙ্গিত করেছে, চর্যাপদাবলীর কবি ডোম্বীর জন্য বাঙালী হয়েছেন, জয়দেব শ্রীহরির বিলাসকলাকুতূহলকে অবলম্বনের অন্তরালে আপন হৃদয়ের প্রেমমাধুর্যকেই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, বৈষ্ণবকবিগণও সেই পথেরই পথিক। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলবো যে কেবলমাত্র ঈশ্বর-চেতনার অতি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক পথেই বৈষ্ণবপদাবলীর সাহিত্যের সীমা নিবদ্ধ নয়। মানুষের চিরন্তন ভাবচেতনার বিস্তৃতলোকে এই সাহিত্যের লীলায়িত পদসঞ্চার। যে কোন দেশের, যে কোন কালের সাহিত্য এমন সাহিত্য সৃষ্টিকে অশেষ সৌভাগ্যগর্বের নিদর্শন হিসেবে সতর্ক প্রহরায় রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অবশ্য সমগ্র পদাবলী সাহিত্যই যে এই গৌরব লাভের যোগ্য নয়, একথা বলা বাহুল্য।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-পরিকল্পনায় বাঙালীর ভাবচেতনা ও রস-বোধের একান্ত নিজস্ব স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে। চৈতন্যপূর্বযুগে এই স্বরূপ পুষ্পিত হয়েছে, কিন্তু চৈতন্য-সমসময়ে এবং চৈতন্য-পরবর্তীকালে এ হয়ে উঠেছে·পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে অবনমিত। চৈতন্য-সমসাময়িক এবং চৈতন্য-পরবর্তী অন্ততঃ দুশোজন কবি বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে স্বষ্টির বিচিত্র পরিচয় সমুৎকীর্ণ করেছেন। এঁদের সকলের কবি-প্রতিভা যে সমমানের নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। কালের বিচারে অনেকেই সাহিত্যের ইতিহাসে সীমিত হয়ে গেছেন; মাত্র কয়েকজন গীতভারতীর প্রসাদ লাভ করে বাংলা কাব্যধারায় আপন প্রতিভার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করেছেন। পদাবলী সাহিত্যের পরিচয় লাভ কালে আমরা মূলতঃ অতি পরিচিত, প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজন কবির প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করবো।

চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণবপদকর্তাগণ চৈতন্যদেবের জীবন-সাধনার অমৃত রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যেন তাঁরা চৈতন্যজীবনের রূপবিকাশের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর সমসময়ের কবিদের মানস-পটভূমিতে চৈতন্যদেব রসিকনাগরের রূপমাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠলেন। নায়িকার স্বভাবধর্ম কবি-মনে প্রেমভাবনার জোয়ার আনলো, কবি যেন শ্রীরাধার অন্তরের আকুলতা নিয়ে শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে প্রেমের ডালি নিবেদন করলেন। প্রবাহিত হলো 'গৌর নাগর' ভাবের ধারা, শ্রীগৌরাঙ্গের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যজ্যোতিসমুদ্ভাসিত রূপদর্শনে তাঁর সমসময়িক কবিরা যেন পাগল হয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মত্ত ভাবকে কেন্দ্র করে মুরারী গুপ্তই বাংলাভাষায় প্রথম পদ রচনা করলেন ঃ

> ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
> রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
> অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
> কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখ খানি॥

মুরারী গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলাকে কেন্দ্র করেও পদ রচনা করেন। অবশ্য যে সব কবি চৈতন্যদেবের লীলাকে কেন্দ্র করে কিছু রচনা করেছেন তাঁরা সেই রচনায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার ভাবকে প্রয়োজন মত ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে এই রচনারাশির মধ্যে গৌরনাগর ভাবাত্মক পদের উল্লেখই বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালীর প্রবণতা যে মধুরভাবের, মধুবরসের প্রতি অন্তহীন, তা এ থেকে সহজেই বোধগম্য হয়। আধ্যাত্মিক প্রেমচেতনায় পরিপূর্ণ একজন মানুষকে কেন্দ্র করে এইজন্যই কবিচেতনায় প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়েছে। কবি নরহরি সরকার এই বিশেষ দিকের উৎসমুখকে খুলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে রাধিকার এবং কৃষ্ণের—উভয়েরই ভাবসত্তাকে প্রকটিত করেছেন :

কি হেরিলাম গোরা রূপ না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল গোরা॥
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেই বলি গোরা রূপ অমিঞা পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাতার॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥

উদ্ধৃত পদটির মধ্যে শ্রী.গৌরাঙ্গের রূপমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণই প্রতিফলিত, নিচের পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে রাধাভাবের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে :

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।

সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে ॥
অবলা নারীরে করে জর জর
বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুষ বচন
অবনত মুখ শশী ॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পুরুষ চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই দ্বৈত সত্তা চৈতন্য-সমসাময়িক কবিদের কল্পনায় পরিধৃত হযেছিল, এর ফলে কবিমানসে প্রেমের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, ভাবের গভীরতা অতল হয়েছে। এইজন্যই চৈতন্যদেব বাংলা-সাহিত্যে কিছু রচনা না করেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মণিময় স্বর্ণকমল। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন ভাবতরঙ্গকে লীলায়িত করে যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমতাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই জন্যই দেখা যায় যে পালাকীর্তনের আসরে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলার যে স্তরটি কীর্তিত হবে তারই অনুরূপ একটি গৌর বিষয়ক পদ প্রথমেই গাওয়া হবে। এমনি করে সৃষ্ট হয়েছে 'গৌর চন্দ্রিকা'। কারণ ভক্ত কবিদের দৃষ্টিতে গৌরাঙ্গদেব রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-মহিমার দ্বারোদ্‌ঘাটক। নরহরি সরকার এই ভাবটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।

বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

নরহরি সরকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবতাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই জন্যই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা কীর্তনের ভূমিকা স্বরূপ গৌরচন্দ্রের গুণকীর্তন করা হয়। কবিদের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবরূপ কেমন বিচিত্র হয়ে উঠেছে এখানে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

পূর্বরাগের পদ :

আজু হাম পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ্র।
করতলে করই বয়ণ অবলম্ব ॥
পুণ পুণ গতাগতি কর ঘর পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নবনব ভাব করত পরকাশ ॥

অভিসারের পদ :

ব্রজ অভিসারিণী ভাবে বিভাবিত
নবদ্বীপ চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি তনু
নয়ন হি আনন্দ লোর ॥

খণ্ডিতার পদ :

... .

জানলুঁ তোহারে কপট পিরীতি।
যা সঙ্গে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর গতি ॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখে কবিমনে যে রূপোল্লাস জেগেছে তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে জ্ঞানদাসের একটি পদে :

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে ॥
বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥

... ...

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের রূপকে কেন্দ্র করে কবি গোবিন্দ ঘোষ মাথুরের আর্তি সৃষ্টি করেছেন :

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে আর কোবে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥

... .

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক যুগের কবিদের মধ্যে নরহরি সরকার, কবি বাসুদেব ঘোষ, কবি যদুনাথ দাস, যদু নন্দন, মাধব দাস, গোবিন্দ আচার্য প্রভৃতি কবিগণ মূলতঃ শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই প্রেম-ভাবের তরঙ্গলীলার উচ্ছল উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এঁদের কাব্য-সাধনা পরবর্তীকালের কবিদের রাধাকৃষ্ণ প্রেমোপলব্ধির সিংহদ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বৈষ্ণবপদসাহিত্যের যে রূপ বিদ্যাপতি সৃষ্টি করে গেছেন তাই বহু বিচিত্র হয়ে একটি স্বতন্ত্র রসলোকের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে পদাবলীর চণ্ডীদাস, কবি শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির কাব্যসাধনায় বৈষ্ণবপদাবলী মানব অন্তরের চিরন্তন অমৃত নির্ঝরটিকে ধারামুক্ত করে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বৈষ্ণবসাহিত্যের রসগত স্বরূপের মূল্যও নির্ধারণ করে দেন। রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁরা

পঞ্চরসের সন্ধান লাভ করেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে মধুররসকেই প্রাধান্য দেন। বৈষ্ণব কবিরা যত পদ রচনা করেছেন তার মধ্যে মধুর রসাশ্রয়ী পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। মধুর রস আবার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহের স্তর পরম্পরায় উন্নীত হয়ে প্রেমের সর্বোচ্চ সৌধে স্থাপিত হয়েছে। মানব মনে রসের যে নিত্য স্ফুরণ ঘটে তাকে অত্যন্ত সতর্ক এবং সুনিপুণভাবে বৈষ্ণব কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্তব্য করতে গেলে বলতে হয় যে বৈষ্ণব পদাবলী মুখ্যতঃ প্রেমেরই কবিতা, প্রেমই এই কাব্যমণ্ডলের প্রদীপ্ত, ভাস্বর মধ্যমণি। দর্শন, শ্রবণের মাধ্যমে নায়ক নায়িকার মনে পূর্বরাগ সৃষ্টি হয়, এই পূর্বরাগ যেন কোন বৈশাখী পূর্ণিমার অপরাহ্নের কাল-বৈশাখীর মেঘ খণ্ড। পূর্বরাগ ক্রমে অনুরাগে আত্মবিস্তার করে, তারপর মান অভিমানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, বিদ্যুৎ বিদীর্ণ প্রমত্ততা, ক্রমে প্রেমের চমৎকারিত্ব পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাশোভায় প্রশান্ত শান্তিতে বিরাজ করে।

বৈষ্ণব কবিদের ভাবচেতনায় রাধাকৃষ্ণ আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকার রূপ পরিগ্রহ করে বিরাজমান। সেইজন্য এই প্রেমিক যুগলের প্রেমকোরকের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখানোর কালে কবিরা রাধাকৃষ্ণের অপরূপ রূপসৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই রূপ পরিস্ফুটনায় তাঁরা ক্লান্তিহীন, অন্তহীন রূপের সায়রে অবগাহিত হয়ে রাধাকৃষ্ণে রূপামৃত মাধুরীর সন্ধান পেয়েছেন। বৈষ্ণব কবির দৃষ্টিতে কৃষ্ণ :

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনলোভা।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।

মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি শিখর ঘেরিয়া ॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগুয়া রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥

শ্রীরাধার রূপ ঃ

যাঁহা যাঁহা বিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই ॥
....
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নিলউতপল বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥

[গোবিন্দদাস]

কৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য রাধিকার নয়নমনে ভাবের আবেশ সঞ্চার করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে শ্রীমতী আত্মহারা। এই অবস্থায় শ্রীরাধার মনে প্রতিক্ষণে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের বাসনা জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকে চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। তাই,

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ধ্যানে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন:

খিন তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চীত পুতলীসম দেহ।
মরম না বুঝায়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥

উভয়ের প্রতি উভয়ের এই আকর্ষণ তিলে তিলে বর্ধিত হয়েছে, তিলে তিলে নতুন হয়েছে; এই আকর্ষণ রাধাকে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা-স্নাতা তমিস্রা রজনীতে অভিসারিণী করেছে, কৃষ্ণের হৃদয়ে যমুনার জোয়ার কল্লোল ধ্বনিত হয়েছে। এই আকর্ষণ মিলনে সুধাক্ষরা হয়েছে; বিচ্ছেদে দারুণ তপনতাপে পরিপূর্ণ হয়েছে। এই প্রেমের মৌলিক রূপ নরনারীর পার্থিব প্রণয়ের পুষ্পপাত্র থেকেই উদ্ভূত। এই জন্যই 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর', এইজন্যই প্রেমিকের দর্শনে প্রেমিকার 'দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা'। বৈষ্ণব কবিদের সংস্কৃত অনুভূতিতে পরিমার্জিত হয়ে পার্থিব নরনারীর প্রণয় নিবিড় অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে। প্রণয়ের লৌকিক স্তর অতিক্রম করে তাঁরা প্রেমকে অলৌকিক চেতনার রস-সাগরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেম-চেতনা বাস্তব জগতের নরনারীর আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা বেদনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই অপূর্ব প্রেমগীতিকার রচয়িতা কবিগণ মর্ত্য মানবের সুখদুঃখের, আনন্দ বেদনার সুতীব্র অনুভূতিতে আপন চিত্ত জারিত করেই তাঁদের ভাবানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে

অবলম্বন করলেও তাঁদের কাব্য প্রতিছত্রে দেব-গন্ধ বাসিত নয়। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধিকা বলেন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'। এমন কি শ্রীরাধা কৃষ্ণের বাঁশীর প্রতি ঈর্ষা পরায়ণা হয়ে বলেন: 'মুরলী হইত বাঁশ কি পুণ্য করিয়া। বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া।' ॥ কিম্বা শ্রীরাধা কৃষ্ণের কবোষ্ণ সান্নিধ্য লাভের জন্য বলেন, 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।' এই মানসিকতা সম্পূর্ণ-ভাবে মানবীয় ভাবানুভূতিতে পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা হলেও, বৈষ্ণব ভক্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে দার্শনিকতার সহায়তায় গ্রহণ করলেও সাধারণ পাঠকের কাছে বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণ মানবীয় রূপরসেরই আধার; বাস্তব জীবনাশ্রয়ী প্রেমের যুগলমূর্তি। প্রেম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিগণ দেহজ কামনা বাসনার জগৎ থেকেই যাত্রা করেছেন কিন্তু সে যাত্রা দেহাতীত লোকে পরিসমাপ্ত হয়েছে। এ দিক দিয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শ তাঁদের ধ্রুবতারা। ভারতীয় জীবনাদর্শের সার্থক সাহিত্যিক-প্রতিফলন আমরা কালিদাসের মধ্যে পাই। কালিদাসের শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মোহজাত প্রণয় তপস্যার দুঃখদাহে পরিশুদ্ধ হয়ে সার্থক মিলনে পরিণত হয়েছে। যেখানে মোহ, যেখানে অতলান্ত গভীরতার অভাব, ভারতীয় ভাবাদর্শ সেইখানেই বিচ্ছেদের বজ্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে। সেই জন্যই কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধিকা আর্তনাদ করে উঠেছেন:

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সায়রে সিনান করিতে
সকলই গরল ভেল ॥

যেখানে আত্মকেন্দ্রিক আশা, যেখানে সংকীর্ণতা সেইখানেই অপার দুঃখ দহন। কিন্তু অনুক্ষণ প্রিয়ধ্যানে যখন-'সুন্দরী ভেলি মাধাই' তখন প্রেমের সর্বব্যাপ্ত রূপ সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবকবিগণ এই জীবনাদর্শের অনুভূতিতে আপন চেতনাকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছিলেন বলেই মিলনের গণ্ডীতেও বিচ্ছেদ-শঙ্কা সৃষ্টি করতে পেরেছেন, 'দুঁহু

কোরে ছুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। এবং তাঁদের বিরহের পদ না-পাওয়ার বেদনার পাত্রকে গীতিসুধায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। প্রেমের মধ্যে বিরহের এই পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব কাব্যকে জীবনরূপের অতল স্পর্শে রোমাঞ্চিত করেছে। বৈষ্ণব কবিগণ পার্থিব কামনা বাসনাকে ভিত্তি করেই মানব জীবনের ভাবসত্যকে চিরন্তনী মূর্তি দান করেছেন, এতে প্রেমও যেমন ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছে, জীবনরূপও তেমনি অতলান্ত হয়ে উঠেছে।

প্রেমই বৈষ্ণবপদাবলীর মুখ্য উপজীব্য, বৈষ্ণব কাব্যকাননে প্রেমের কলিকাগুলিই চিরসৌন্দর্যের নির্ঝর হয়ে বিরাজমান। কিন্তু বাৎসল্যরসের, সখ্য দাস্য শান্ত রসের এমন কিছু পদ আছে যেগুলির কাব্য-সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ বাৎসল্যরসের পদগুলি বাঙালীর আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে; পার্থিব বাসনা সঞ্চারে এই পদগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মাতা যশোদার সন্তান স্নেহের আকুলতা কবির অন্তরে অনুরণিত হয়ে এক একটি রসঘন সার্থক পদের সৃষ্টি করেছে :

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরিমুখ পাওল পরম সুখ
চুম্বয়ে চান্দবয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনীলোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রক্তিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥

[বলরাম দাস]

পুত্রের নয়নলোভন নৃত্যভঙ্গিতে মায়ের মনে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রাণের পুত্তলী, নয়ন-মণি পুত্রের জন্যে মাতৃহৃদয় সামান্যতেই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মন্থিত হয়ঃ

শ্রীদাম সুদাম দাম   শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর   নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে   গোপালে করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে   রাঙাপায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো   মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি যেন রব শুনি।
বিহি কৈল গোপজাতি   গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই বাছনি॥

[বলরাম দাস]

মাতা যশোদার বাৎসল্য-প্রীতি বাংলার মায়ের সন্তান-প্রীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বাৎসল্য রসের এই দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে শাক্ত পদাবলীতে পরিবাহিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবি স্নেহ প্রবণ বাঙালী মনের মায়া মমতায় পরিসিক্ত একটি আবেগময় স্বচ্ছ রূপ বাৎসল্য রসের পদগুলিতে সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্য-সমসাময়িক কবিগণ কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্যে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা পরিকল্পনার দ্বারাই এই মানব-রস পরিসিক্ত পদসাহিত্যের স্রোতোধারাকে উচ্ছল করে দিয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সখ্য, দাস্য, শান্ত রসের পদগুলিও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শান্ত রসের পদ অবশ্য বাংলাদেশের সাহিত্য সাধনায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সখ্য এবং দাস্য রসের পদগুলি মূলতঃ মানব সম্পর্কের সীমায়

ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছে বলে এই পদগুলির মধ্যে মানবমুখিতার দিকটি সুস্পষ্ট।

আসলে বৈষ্ণবকবিগণ বাঙালীর ভাবচেতনার মণ্ডলে আপন অন্তরের সুরভিত বিস্তার খুঁজে পেয়েছিলেন। এইজন্যই তাঁদের পদাবলী মুখ্যতঃ পার্থিব জীবনের জয়গান কীর্তিত করেছে; প্রেমই এই পদসাহিত্যের স্বতোজ্জ্বল বৈদূর্যমণি, স্বতোপ্রবাহিত নির্মল অমৃত রসধারা। প্রসঙ্গতঃ আমরা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি :

> বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম উপহার
> চলিয়াছে নিশিদিন কতভারে ভার
> বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
> অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
> লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহ তরে
> যথাসাধ্য যে যাহার;

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে রসের ঝর্ণা প্রতিনিয়ত প্রাণোচ্ছল ছন্দে উৎসারিত হচ্ছে তা মানুষের কামনা বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনার স্তর থেকে আপন প্রাণসম্পদ আহরণ করেছে, অথচ এখানে মানুষ এক সীমাতীত লোকের সন্ধান পায়। এইভাবেই বৈষ্ণব কবি জীবনরসের সাহায্যে জীবন দর্শনের মর্মমূলে আমাদের পৌঁছে দেন।

চৈতন্য-সমসাময়িক এবং চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যকে যাঁরা পরিস্ফুট করেছেন, তাঁদের পরিচয় এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করাও প্রয়োজন। এই সমস্যা পদাবলীকার চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের সৃষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু এই কবির কোন প্রামাণ্য পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি। কারও মতে ইনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী, কেউবা মনে করেন ইনি চৈতন্য-পরবর্তী। চণ্ডীদাসের নামে যে বিপুল রচনা প্রচলিত আছে তার ভনিতাও বিভিন্ন, কোন

পদে আছে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কোন পদে চণ্ডীদাস। অন্যদিকে চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীর ভাব ও ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করেনা। তবে অনেকগুলি সার্থক পদ চণ্ডীদাসের রচনা হিসেবে বাঙালী পাঠকের মনে অনবদ্য অনুভূতি সৃষ্টি করে; অতএব পদাবলীর চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী না পরবর্তী এ প্রশ্নের জটিলতায় না গেলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাঁর সৃষ্ট কিছু সার্থক কবিতা আমরা পেয়েছি। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় আপন স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন; তাঁর রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, সে 'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে';

সে পীরিতি নগরে বসবাস করার জন্য ব্যাকুল। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমের অতলান্ত গভীরতায় নিমজ্জিত। চণ্ডীদাসের রাধা বলে :

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়।।

কৃষ্ণের প্রতি চণ্ডীদাসের রাধার উক্তি :

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
... ...
আঁখির নিমেখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ।।

চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমসায়রের পদ্মকলিকা, তার সৌরভ বিস্তারে

পাঠকমনে প্রেমমাধুর্যের বসন্ত পরজ বেজে ওঠে ; সেখানে ছোঁয়া লাগে বেদনার গভীর নিখাদের। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস প্রেমের গভীর অতল স্বপ্নময় প্রদেশের রত্নবণিক। অন্তরের সুনির্দিষ্ট রূপ কেমন সহজ সরল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে পারে, অনলঙ্কৃত হয়েও কেমন করে ভাবরস পরিণতি লাভ করতে পারে চণ্ডীদাসের রচনা তার সার্থক দৃষ্টান্ত। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস আপন মহিমায় বিরাজিত, তিনি কোন সময়েব কবি একথা না জানতে পারলেও তাঁর মহিমা বিন্দুমাত্র ছায়াগ্রস্ত হয় না।

এখানে চৈতন্য-সমসাময়িক এবং তৎপরবর্তী কালেব পদাবলী-কারদের তালিকা দেওয়া হলো ঃ—(ক) চৈতন্য সমসাময়িক যুগ—(১) রায় রামানন্দ—ইনি সাতটি পদ রচনা করেন, এই পদগুলিব মধ্যে 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ' ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥' সমধিক প্রখ্যাত, অন্য পদগুলি সংস্কৃতে রচিত। ইনি চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার সঙ্গী ছিলেন। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিচারে এঁব প্রগাঢ় বোধের পরিচয় দিয়েছেন। (২) মুরারী গুপ্ত—ইনি চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে পদ রচনা করেন ঃ

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামা গুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥

কিম্বা 'শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে।' প্রভৃতি পদে কবি চৈতন্যদেবের বাল্যলীলাব জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের গীতিরূপও ইনি দিয়েছেন। এঁর পদের সংখ্যা বারো। ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার এবং অন্তলীলার প্রত্যক্ষদর্শী।

(৩) নরহরি সরকার—ইনি গৌরনাগর-তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা, এঁর পদগুলি চৈতন্যদেবের রাধাভাব এবং কৃষ্ণভাবকে কেন্দ্র করে

রচিত। এঁর রচিত ২৯টি পদ পাওয়া যায়। আবেগের উচ্ছলতায় এঁর পদগুলি পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ ভাব কবির মানস-লোকে তীব্র অনুভূতি সঞ্চার করেছিল।

(৪) গোবিন্দ ঘোষ—পদসংখ্যা—৯, (৫) মাধব ঘোষ—পদ সংখ্যা—৬, (৬) বাসুদেব ঘোষ—চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা বেশী পদ বচনা করেন, এঁব পদ সংখ্যা ১১৮। এঁর পদের উপাদান চৈতন্যজীবনের ভাবময় রূপ, চৈতন্যলীলাব বিচিত্র অনুভূতিতে আপন হৃদয় অনুরঞ্জিত কবে কবি পদ রচনা করেছেন, ইনিও গৌরনাগবতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন :

সোঙরি পূরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফু ক দিল গোরা চান্দে।
অঙ্গুলি নাচাঞা গায় সুললিত ছান্দে॥

কিম্বা,

আজু কেন গোরাচাঁদেব বিবস বয়ান।
কে আইল কে আইল কবি ঝবয়ে নয়ান।। ইত্যাদি।

(৭) বসু বামানন্দ—পদসংখ্যা—১৭, (৮) বামানন্দ দাস—পদসংখ্যা—১৩, (৯) যদু কবিচন্দ্র—পদসংখ্যা—১৮, (১০) যদুনাথ দাস—পদসংখ্যা—৪৯, (১১) যদুনন্দন—পদসংখ্যা—৭৭, (১২) শিবানন্দ সেন—পদসংখ্যা—৮, (১৩) শিবাই—পদসংখ্যা—৬, (১৪) শিববাম—পদসংখ্যা—১৬, (১৫) অনন্ত—পদসংখ্যা ৭, (১৬) অনন্ত বায—পদসংখ্যা ১, (১৭) অনন্ত দাস—পদসংখ্যা ৩০, (১৮) অনন্ত আচায—পদসংখ্যা ১, (১৯) বংশীদাস—পদসংখ্যা—১৯, (২০) বংশীবদন—পদসংখ্যা—২৭, (২১) পবমানন্দ—পদসংখ্যা—১২, (২২) প্রসাদ দাস—পদসংখ্যা—৫, (২৩) মাধবদাস—পদসংখ্যা—৬৭, (২৪) গোবিন্দ আচার্য—পদসংখ্যা—২৮॥

(খ) চৈতন্য-পরবর্তী যুগ : এই যুগের পদকর্তার সংখ্যা বিপুল, বস্তুতঃ এই যুগটি যে কোথায় শেষ হয়েছে তা বলা মুস্কিল। পরোক্ষ-

ভাবে মধুসূদন তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানু-সিংহের পদাবলীতে এই যুগের ধারারই যেন রূপ বিস্তৃত করেছেন। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস, কবি শেখর, রায় শেখর, রাধামোহন, যাদবেন্দ্র, বলরাম দাস প্রভৃতি। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে আলাওল, আকবর প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করেন। এই যুগের কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস যেন যথাক্রমে পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কাব্যধারাকে আপন আপন কাব্যসাধনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানদাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতই প্রেম বিভোরা ঃ

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা ॥

কিন্তু এই রাধাই বিরহের তীব্রতায় রক্তাক্ত হৃদয়ে বলে ঃ

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

আবার আত্মনিবেদনের কালে শ্রীরাধা বলে ঃ

তোমার গরবে গরবিনি হাম
রূপসী তোমার রূপে।

জ্ঞানদাসের রাধা প্রেম সর্বস্ব, প্রেমই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র।

জ্ঞানদাসের পদে তত্ত্বদৃষ্টি ও রসসৃষ্টির হরগৌরী মিলন ঘটেছে, এ ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস অনুরূপ ভাবের ভাবুক। চণ্ডীদাসের পদে অনুভূতির নিবিড়তা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা।

প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উভয় কবিই গ্রহণ করেছেন সহজ

সুরের ভাষা। গভীর কথা বলতে গেলে সহজ ভাষারই আশ্রয় নিতে হয়। এই দুই কবি কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে সেই পথেরই পথিক হয়েছেন। অবশ্য জ্ঞানদাসের ভাষার সর্বত্রই যে চণ্ডীদাসের মত সহজ সারল্য আছে তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস ভাষার কারুকার্য দেখিয়েছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুপ্রাসের আমদানী করে তিনি তাঁর রচনাকে কোথাও কোথাও আশ্চর্য চিত্রধর্মী করে তুলেছেন। জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ এক্ষেত্রে স্মরণীয় ঃ

রজনী শাঙন ঘন   ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে   বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে
শিখরে শিখণ্ড রোল   মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে
ঝিঝা ঝিনিকি বাজে   ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে।

এমন অনেক পদ আছে যা চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস উভয়েরই ভণিতায় পাওয়া যায়। সে সব পদে রয়েছে আশ্চর্য সাদৃশ্য। আবার কয়েকটি পদে ভাষার সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও জ্ঞানদাসের ওপর চণ্ডীদাসের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-মাধবের রূপবর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন,

সুধা ছানিয়া কেবা   ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা   খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা।

জ্ঞানদাস যেন তাঁর পদ-দর্পণে ঐ রূপ-মাধুরীরই প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

চিকণ কালিয়া রূপ   মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া

কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি কতেক সুধা দিয়া।

উভয়েই ভক্তকবি, তাই আত্মনিবেদনের পদরচনায় উভয়ের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত।

অনুভূতির গভীরতায় জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমসাগরে ডুব দিয়েছিলেন; তাই হৃদয়ের অতলান্ত প্রদেশের ভাবকে তাঁরা একই দক্ষতায় সহজ ভাষা-রূপের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। পূর্বরাগের প্রথম প্রণয়-আঘাতে কম্পিতা চণ্ডীদাসের রাধা বলেছে:

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
....
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

অনুরূপ প্রণয়-ভাবাবেশে সঞ্জীবিত জ্ঞানদাসের একটি পদ লক্ষণীয়:

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।

প্রেমের প্রসাধনকলা ও সাধনবেগ, উভয় ক্ষেত্রেই গোবিন্দ-দাসের রাধা বিদ্যাপতির রাধার সমতুল্যা। বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাসও ভাষা-সৌকর্যের সচেতন শিল্পী। পরিবেশ, ভাবের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কতখানি স্থান অধিকার করে থাকে তা উভয় কবিই জানতেন, তাই কি অভিসারে, কি মাথুরপর্বের বেদনায় তাঁরা

অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে ভাবের উদ্দীপক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। দুর্যোগময়ী অভিসার-প্রকৃতি এবং বিষাদবিধুর মাথুর-প্রকৃতি যথাক্রমে গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির রচনায় আশ্চর্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ-চকিত, বজ্র-নিনাদিত প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপসজ্জাকে গোবিন্দদাস তাঁর আশ্চর্য ছন্দিত ভাষায় ধরে রেখেছেন ঃ

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥

অন্যদিকে বিদ্যাপতি কি অভিনব বিরহবিধুর পরিবেশ রচনা করেছেন। সে পরিবেশ হৃদয়ের অসহনীয় ব্যথার কত অন্তরঙ্গ দোসর হয়ে উঠেছে ঃ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে শ্রীমতী রাধার রূপ বর্ণনার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

বিদ্যাপতি রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥

যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥

গোবিন্দদাস অনুরূপ ক্ষেত্রে গুরু বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করে বলেছেন :

যাঁহা যাঁহা নিকসযে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুবি চমকময় হোত ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥

কেবলমাত্র পদের এই প্রভাবগুলিতেই নয়, রূপ এবং ভাবের পরিকল্পনায় ও প্রকাশে উভয়েই সমগোত্রীয়।

গোবিন্দদাস তাঁর সচেতন শিল্পপ্রয়াসের দ্বারা কবিতার ভাব-মূর্তিকে অনুপম করে তুলেছেন। অভিসারের পদ-রচনায় গোবিন্দদাস তুলনারহিত কবি।

অভিসারের পথের দুইটি প্রান্ত। এক প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণমাধব জ্বালিয়ে রেখেছেন প্রতীক্ষার প্রদীপ। অন্য প্রান্তে উদ্বেল মিলন-আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত শ্রীমতী রাধার হৃদয়। মাঝে অসহ দুঃখের বিপত্তি-সঙ্কুল পথ। এই বিপত্তি একদিকে যেমন প্রকৃতির, অন্যদিকে তেমনি পরিবার পরিজনের। এই বিপর্যয়কে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে প্রেমাস্পদের কাছে, তবেই অভিসার দুঃখের বরষায় প্রাপ্তির ফুল ফোটাবে।

গোবিন্দদাস অভিসারের এই হৃদয়-যন্ত্রণার চিত্ররূপ তাঁর কাব্যে এঁকেছেন। প্রকৃতির দুর্যোগচিত্র যত ভয়ঙ্কর হয়েছে; সংসার বাধা যত সীমাহীন হয়েছে, গোবিন্দদাসের রাধা-হৃদয় তত শক্তি সঞ্চয় করেছে। রাধার সঙ্গে সখিদের উত্তর প্রত্যুত্তরের ভেতর দিয়ে অভিসারপর্বের একটি সার্থক ভাব-চিত্র গোবিন্দদাস আমাদের উপহার দিয়েছেন।

শ্রীমতী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভিসারে প্রস্তুত হয়েছেন। সখিরা প্রকৃতির রূপ দেখে রাধাকে বাধা দিয়ে বলল :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-ভার॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥

সখিদের এইরূপ শঙ্কা প্রদর্শনের উত্তরে শ্রীমতী রাধা যে উত্তর দিচ্ছেন তাতে প্রণয়ের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার কি বিস্ময়কর মূর্তিই না ফুটে উঠেছে ঃ

কুল মরিযাদ— কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ— সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
....
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগ।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥

গোবিন্দদাস কোন রূপহীনা কাব্য-সুন্দরীকে প্রসাধন-চাতুর্যে সুরূপা করে তোলেননি, তিনি যথার্থ অভিনব কাব্য-আত্মাকে ভাষার বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত করে প্রকাশ করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অনন্ত সাগরে কত নদী তাদের ধারা

মিলিয়েছে। কত কবি-ভগীরথ তাদের শঙ্খ ধ্বনিতে আহ্বান জানিয়ে সাগর সঙ্গমে নিয়ে এসেছেন। এই সব পদকারদের অমৃত পদমাধুরী আমাদের বিস্মিত করেছে। প্রণয়ের এমন বিচিত্র কলাপী-কেকা-বিলাস বুঝি বিশ্বসাহিত্যে বিরল। পূর্বরাগ অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর ও ভাবসম্মিলনে বৈষ্ণবপদকারদের প্রণয়-ভাবনা যে অভিনব ও বিচিত্র বিকাশ-সাফল্য লাভ করেছে তা তুলনা রহিত।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

ভালবাসার প্রথম প্রণয়-স্পর্শে নরনারীর চিত্তের এই অবরুদ্ধ ক্রন্দনকে বুঝি এর চেয়ে বেশী কোন রূপেই প্রকাশ করা যায় না।

গুরুজনদের মাঝে নায়িকা তার প্রণয়-ভাবনাকে গোপন করার কি অসহায় প্রয়াসই না করেছে। জ্ঞানদাস চারটি ছত্রে সেই মধুক্ষরা নায়িকা-মূর্তিটি এঁকেছেন:

গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

অন্যদিকে প্রণয়-ভাবনার কি গভীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন চণ্ডীদাস তাঁর পদে:

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

শ্রীরঘুনন্দনের একটি পদ প্রণয়-ক্ষেত্রে ঈর্ষার একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছে। এখানে চেতন অচেতনের ভেদ লুপ্ত হয়েছে। শ্রীমতী অচেতন বস্তুর ওপরেও তাঁর সূক্ষ্ম ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। যে কৃষ্ণকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েও পাননি, যাঁর সঙ্গে কথা বলার

সামান্য সুযোগও তিনি পাচ্ছেন না, বক্ষ-লগ্ন-হবার কিংবা চুম্বনের অভিলাষ চরিতার্থ করার বাসনা যেখানে সুদূর মরীচিকামাত্র, সেখানে এরা কি পুণ্যে তার প্রিয়তমের নিকট সান্নিধ্য পেল !

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোব বন্ধু যায় যাতে নাচিযা নাচিয়া ॥
নূপুব হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চবণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিযা।
বন্ধুব বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥
মুবলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥

বৈষ্ণব পদাবলীব প্রীতি-রসে ক্লান্তি নেই, তিলে তিলে তা নবীভূত হয়।

শ্রীরাধার মুখে কবিবল্লভ বলছেন ঃ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

প্রেমবৈচিত্ত্যেব পদে পদাবলীকাবেবা কি সুনির্বিড় প্রণয়-গভীবতার স্বাক্ষব রেখেছেন। গোবিন্দদাসেব পদে মুগ্ধা রাধার প্রণয়-বিভ্রমের কি আশ্চর্যসুন্দর ছবিটিই না ফুটে উঠেছে ঃ

নাগব-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥

শ্রীমতী রাধা গৃহবধূ। তিনি কৃষ্ণকে পেতে চান, কিন্তু প্রতিকূলতার জন্য প্রেমাস্পদকে পাওয়া যাচ্ছেনা, তাই শ্রীমতী নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে রাখতে চান। কিন্তু একি হল ! সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শ্রীমতীকে প্রতাবণা করে চলেছে। চণ্ডীদাসের

আক্ষেপানুরাগের পদটিতে শ্রীমতীর অসহায় অবস্থার আলেখ্যটি কি সুচারু মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥

মাথুর পর্বে শেখরের একটি পদে শ্রীমতীর মনোবাসনা কি অভিনব ভাব-মূর্তিতেই না প্রকাশিত হয়েছে। বিরহ-দুঃখ সহ্য করতে না পেরে শ্রীমতী মৃত্যু বরণ করতে চান। কিন্তু এই ধরিত্রী ত্যাগ করে গিয়েও তিনি বেঁচে থাকতে চান দয়িতের অন্তরে। আর সব পরিচিত পরিবেশ ও পরিজনেরা থাকবে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের কাল পর্যন্ত, কিন্তু শ্রীমতী থাকবেন না। সবাইকে ফিরে পাবেন কৃষ্ণ, কিন্তু পাবেন না তাঁকে। শুধু শ্রীমতীর স্মৃতির কাঁটা দয়িতের হৃদয়কে বিদ্ধ করবে। মৃত্যুর মাঝে এ যে পরম সুখ :

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে ॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥

... ...

শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥

গোবিন্দ দাসের একটি বিখ্যাত পদে মৃত্যুর ভেতর দিয়েও অমরতা লাভের আকাঙ্ক্ষাটি আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। পঞ্চভূতের দেহ বন্ধন-মুক্ত হয়ে যখন মিশে যাবে জল, স্থল, আকাশ, বাতাস আর আলোকের মাঝে তখন শ্রীমতী প্রতি মুহূর্তে লাভ করবেন তাঁর প্রেমাস্পদের অমৃত-সান্নিধ্য:

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥

... ...

যো সরোবরে পহু নিতিনিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

প্রণয়-সাধনার সিদ্ধিপর্বে পদাবলীকারেরা কি বিস্ময়কর উৎকর্ষের সাক্ষ্য রেখেছেন। ভোগের সামগ্রী দেহকে করে তুলেছেন পূজার উপচার। প্রণয়ের কি নিবিড় গভীরতা ও উপলব্ধির কি গভীর সাধন-লোকে প্রবেশ করলে তবে এই ভাব চিন্তা প্রেমিকের পক্ষে সম্ভব তা কবি-সম্রাট বিদ্যাপতি আমাদের দেখিয়েছেন:

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥

প্রণয়-সাধনার এই স্তরে প্রবেশ করলে তবেই আসে আত্মস্থ-ভাব। তখন বাইরের সব খোঁজার অবসান হয়। মনের মন্দিরে প্রদীপ জ্বেলে প্রেমিকা তার চিরদিনের প্রেমিককে আরতি করে। এই অবস্থায় বিদ্যাপতির রাধা সখীদের বলেন:

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

ভাব ও রসের অজস্র শাখাজাল বিস্তার করে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য মানবচেতনালোকের সবখানিকেই আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে মানব-মনের অনুভূতির রাখীবন্ধন করে বৈষ্ণব কবিগণ ভাবের দেহকে অসীমরাজ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। বসন্তের মধুময় পরিবেশে মিলনের স্পন্দিত ছন্দ, বর্ষার ঘনঘোর রজনীতে বিরহের বক্ষবিদারী দীর্ঘশ্বাস সহজেই পাঠক মনে অনুভূতির তীব্রতা সৃষ্টি করে। প্রায় সর্বত্রই মর্তকামনার উত্তাপ সঞ্চারিত। বাঙালীর ভাবচেতনার রত্নময় স্বর্ণমুকুরে প্রেমের যে প্রতিবিম্ব তিলে তিলে আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রেম-প্রসাধনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণ-বৈচিত্র্য বিচ্ছুরিত হয়েছে বৈষ্ণবকবিগণ একান্ত সযত্ন প্রয়াসে তাকে রসপরিমার্জিত কাব্যরূপ দান করেছেন। বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণব-পদাবলী সেইজন্যই অনন্য, অতুলনীয় এক চিরবসন্তের রাজ্য।

বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন:

'আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব

করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্কের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকেই বৈষ্ণবপদাবলীর জীবনবোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভালবাসার এই অনন্তবোধ বৈষ্ণবকবিদের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল বলেই তাঁরা রাধাকৃষ্ণের লীলা কল্পনায় ক্লান্তিহীন। তাঁরা বলেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।' বৈষ্ণবকবির রাধা, কৃষ্ণ-বিরহে দশদিক আঁধার দেখেন, এবং প্রিয়মিলনে দশদিক আনন্দময় দেখেন। শ্রীরাধার পরম-প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত চেতনা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে। অথচ এই চেতনার মর্মমূলে রয়েছে পার্থিব জীবনের সমস্ত প্রেম সম্পর্কের আবেগময় অনুভূতি।

চৈতন্যপূর্ব যুগেই মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য বাংলাকাব্যধারায় আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যজগতে মনসামঙ্গল কাব্য প্রথমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা মঙ্গল-কাব্যের রূপ ও রীতি নির্ধারিত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যস্রোতের পর মঙ্গলকাব্যজগতে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের স্রোতে জোয়ারের কল্লোল জাগলো। বঙ্গদেশের ব্যাপক ভৌগোলিক সীমায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হলেও বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে এই কাব্যের প্রচলন বেশী। এই কাব্যশাখার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম রাঢ়ভূমির অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এবং জন-জীবন যেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুকূলতা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত শান্ত, শ্রীমণ্ডিত বরদা প্রকৃতিই যেন চণ্ডীদেবীর মূর্তিতে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডী মিশ্রণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবী চণ্ডী বনপশুপালিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ইনি শিবগৃহিণী, আদ্যাশক্তি। দেবীর বনপশু-রক্ষয়িত্রী ভূমিকা থেকে মনে হয় যে লৌকিক স্তর থেকেই চণ্ডীমঙ্গলকাব্য উদ্ভূত; কালকেতুর কাহিনী এই ধারণাকে স্পষ্টভাবেই সমর্থন করে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবী চণ্ডী প্রথমে ব্যাধ কালকেতুর পূজা লাভের দ্বারা আত্মবিস্তার করেছেন, অপশ্চ কবিগণ পরে ধনপতি সদাগরের পূজা অর্পণ করে দেবীকে জাতে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লৌকিক স্তর থেকে উন্নীত হলেও দেবী চণ্ডীর আচার আচরণ পৌরাণিক গুণমণ্ডিত। এই দেবী মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সাধনই এঁর স্বভাব ধর্ম। কাব্যের সর্বত্র দেবী মূলতঃ কল্যাণশ্রী পরিমণ্ডিত হয়েই বিরাজিত, তাঁর যেটুকু ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছে তা একান্ত-ভাবেই ভক্তকে রক্ষা করার জন্য।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে দুটি সুস্পষ্ট কাহিনীপ্রবাহ রয়েছে—ব্যাধখণ্ড ও বণিকখণ্ড। শেষোক্ত খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, মনে হয় মনসামঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরের কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে এই কাহিনীটি লিখিত। ব্যাধখণ্ডের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনের যথার্থ রূপ অংকিত হয়েছে। এই খণ্ডটি বিশেষভাবে মানব প্রীতির পরিচয়ে উজ্জ্বল। এই কাব্যের দেবখণ্ড গতানুগতিক, পুরাণের উপাদানে সৃষ্ট। দেবখণ্ডের মধ্যে দেবী চণ্ডীর পূজা লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পরেই কাহিনী সূত্র ব্যাধখণ্ডে বিস্তৃত হয়েছে; ব্যাধখণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর বণিকখণ্ড শুরু হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কাহিনী ধারা নিম্নরূপঃ

দেবী চণ্ডী মর্তে আপন পূজা প্রচারের জন্য একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর শিব পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করতে গেলে দেবী চণ্ডী কীটরূপে পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পূজাকালে শিবকে দংশন করলেন। শিবের শাপে নীলাম্বর কালকেতু ব্যাধরূপে মর্তে গমন করলেন, নীলাম্বর-পত্নী ছায়া ফুল্লরা নাম নিয়ে ব্যাধের ঘরেই জন্মগ্রহণ করলেন। দেবী নীলাম্বরকে আশ্বাস দিলেন যে সে তার পূজা প্রচার করলেই মুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে আসবে।

এর পরেই কাহিনী, ব্যাধ জীবনকে, কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনকে আশ্রয় করেছে। এই অংশে দুঃখপীড়িত ব্যাধের সংসারের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু গুজরাটের রাজা হল, তার রাজ্যে দেবী চণ্ডী অখণ্ড প্রতিষ্ঠায় বিরাজ করলেন। দেবীর পূজা প্রচারের পর কালকেতু ফুল্লরা দিব্যদেহ ধারণ করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করল।

বণিকখণ্ড মূলতঃ বৈচিত্র্যহীন, এই কাহিনী পরিকল্পনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী—লহনা ও খুল্লনা। খুল্লনা চণ্ডীপূজা করতো। ধনপতি বাণিজ্যে যাওয়ার কালে দেবী-চণ্ডীর ঘটে লাথি মারে। এজন্য পথে তার দারুণ কষ্ট হয়, কিন্তু

পথে সে অপূর্ব এক দৃশ্য দেখে—কমলেকামিনীর দৃশ্য। সিংহলরাজকে সে কথা বলতে সিংহলরাজ সেই দৃশ্য দেখতে চাইলেন। কিন্তু কার্যকালে ধনপতি ব্যর্থ হলো এবং রাজরোষে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। এদিকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে লহনা সন্তানসম্ভবা-সপত্নী খুল্লনাকে নানাভাবে নির্যাতিত করলো, কিন্তু দেবীর কৃপায় সেই নির্যাতন বন্ধ হলো। দেবী চণ্ডীর বরে সে পরম রূপবান এক পুত্র লাভ করলো। পুত্রের নাম রাখা হলো শ্রীমন্ত। বড় হয়ে শ্রীমন্ত বাণিজ্যে গেল, অবশ্য এই বাণিজ্যে যাওয়ার পেছনে অন্য একটি কারণও ছিল, সে হলো পিতৃ-অনুসন্ধান। সেও পথে কমলেকামিনী দেখলো এবং পিতার ন্যায় সিংহলরাজকে সেইদৃশ্য না দেখাতে পেরে মৃত্যুদণ্ড লাভ করলো। দেবীর কৃপায় সে মশান থেকে মুক্তি পেল। পিতা পুত্রের মিলন ঘটলো। সিংহলরাজের দুই কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ হলো। পুত্র পুত্র-বধূদের নিয়ে ধনপতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। ধনপতি শেষ পর্যন্ত ভক্তিভরে চণ্ডীপূজা করলো।

এই হলো চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কাহিনী চুম্বক।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যশাখার আদি কবি হিসেবে পরিচিত মাণিক দত্ত। এই কবি সম্পর্কে মুকুন্দরাম সশ্রদ্ধ বিনয় নিবেদন করেছেন :

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥

মুকুন্দরামের উল্লেখ থেকেই মাণিক দত্তের প্রাচীনতার কথা অনুমান করা যায়, এ ভিন্ন অন্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। মাণিক দত্তের নামে যে পুঁথি পাওয়া গেছে তার ভাষা আধুনিক, এমন কি সেখানে 'ফিরিঙ্গি' শব্দও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মনে হয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যশাখায় মাণিক দত্ত নামে কোন কবি ছিলেন, কিন্তু কালগর্ভে তাঁর রচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর নামে যে পুঁথি পাওয়া গেছে, মনে হয় তা অন্য কোন অর্বাচীন কবির রচনা। এই রচনা ছড়ার রীতিতে সৃষ্ট :

আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান ॥

কবির আত্মপরিচয় থেকে মনে হয় যে কবি লেখাপড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি, মঙ্গলচণ্ডীর গান গেয়েই জীবিকা অর্জন করতেন। সুতরাং এ রচনায় সাহিত্যগুণের সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা।

দ্বিজমাধব তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে। তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, কবি নিজের জীবনী সম্বন্ধে লিখেছেন :

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার।
ত্রিবেণী যে গঙ্গা যথা বহিছে ত্রিধার ॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়ার যে মহাস্থান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অনেক প্রধান ॥
পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম।
কলিকালে হইত জগত অনুপাম ॥

এর থেকে কবি যে কোথাকার অধিবাসী ছিলেন—নবদ্বীপের না ত্রিবেণীর নিকটস্থ সপ্তগ্রামের, আমরা তা যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারি না। এইটুকু অনুমান করা চলে যে কবি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, পরে চটগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর কাব্যও তাই চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং রংপুর অঞ্চলেই প্রচার লাভ করেছিল।

দ্বিজমাধবের কাব্যের আকার সংক্ষিপ্ত। তাঁর কাব্য 'সারদামঙ্গল', 'সারদা চরিত' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এই কাব্যের দেবী সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব বিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গল-দৈত্যে বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী ॥

এই পৌরাণিক আদর্শেই কবি তাঁর কাব্যের দেবখণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যের সৃষ্টি-পত্তন বর্ণনা ধর্মঠাকুরের পুরাণের প্রভাব যুক্ত :

না আছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
না আছিল সুমেরু মন্দার।
না আছিল সুরাসুর রাক্ষস কিন্নর নর
কেবল আছিল শূন্যাকার ॥

দ্বিজমাধবের কাব্যের কাহিনী একটু স্বতন্ত্র। এই কাব্যের দেবী প্রথমে কলিঙ্গরাজের পূজা পেয়েছেন। তারপর ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের অভিশাপে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, দেবীর কৃপা লাভ করেছে এবং রাজ্যস্থাপনের পরে স্ত্রীর সঙ্গে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গে গমন করেছে। এই কাহিনী অত্যন্ত অপরিসর, অনেকটা ব্রতকথা জাতের। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর কাহিনীর মধ্যেই কবি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর চিত্রিত ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি একটি জাত শয়তান হয়ে ফুটে উঠেছে। কপট, শঠ, স্বার্থপর এই চরিত্রের প্রতি কবির বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। তাঁর গুরুতর অপরাধের জন্য প্রচণ্ড শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছে, নাপিত উল্টো ক্ষুরে তার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে, আর তার রক্তাক্ত মাথায় কেউ কেউ 'শিরে ঢালি দিল লোনা জল।'

দ্বিজমাধব চরিত্র-চিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি সত্য, কিন্তু তাঁর চরিত্র বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এইজন্য তাঁর কালকেতু কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অস্ত্রহীন হয়ে ধরা পড়েছে, নিতান্ত ভীরুর মত ধানের গোলায় লুকিয়ে থেকে ধরা পড়ে নি। ভাঁড়ু দত্তের দৃষ্টান্ত থেকেই দ্বিজমাধবের রচনার নিদর্শন দেওয়া গেল। কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করার জন্য ভাঁড়ু ভেট নিয়ে চলেছে :

দেওানেতে যায় ভাড়ু মনে নাহি হেলা
চুরি করি আনিলেক কুল কাঁচ কলা।
ভেট সজ্জা লয়ে ভাড়ু করি পরিপাটি
বাড়ির বাথুয়া শাক তুলি বান্ধিলেক আটি।

বীরের খাসিটা লৈয়া দেওয়ানেতে যায়
তারাপুর সিংহপুর ত্বরাএ এড়ায়।
বিনোদপুর ছাড়াইয়া পাইল চণ্ডীর হাট
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট।
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাড়ু যায় একভাগে
দণ্ডবৎ প্রণাম করে নৃপতির আগে।
নিবেদিছু ধরাধীশ কর অবধান
রাজ্যের বসতি করে ব্যাধ বলবান।
গোপনে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে
ব্যাধের নন্দন হৈয়া ছত্র শিরে ধরে।

ভাঁড়ুর কুটিল কুচক্রী মনের পরিচয় কবি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিজমাধব বণিকখণ্ডের প্রারম্ভে হরগৌরীর পাশা-খেলার চিত্র এঁকেছেন। এই পাশাখেলায় ইন্দ্রপুত্র মণিকর্ণকে হারজিতের রায় দেওয়ার জন্য ডাকা হল। সে রায় দিল হারজিৎ দুপক্ষেরই সমান। এতে দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। মণিকর্ণ ধনপতির দেহে মর্তে আগমন করলো। তার দুই স্ত্রী—লহনা, খুল্লনা। এ কাহিনীর মধ্যে বিশেষত্ব এমন কিছু নেই। তবে লহনা খুল্লনার বিবাদ মীমাংসার পর তাদের খাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি পরিচ্ছন্ন পরিহাসের চিত্র এঁকেছেন:

খুল্লনায়ে বোলে দিদি মুড়া খাও তুহ্মি।
তবে এক লক্ষ ধন পাই আজু আহ্মি॥
মুড়া লইয়া ঠেলাঠেলি কেহ নাহি খায়ে।
উগার উপরে থাকি বিড়াল আড় চোখে চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

গার্হস্থ্য-জীবনের এ চিত্র অত্যন্ত বাস্তব। বাঙালীর স্বভাব-সিদ্ধ রসিকদৃষ্টির ছোঁয়া এখানে রয়েছে। এই ধরনের ছোটখাট চিত্রের

সমাবেশে দ্বিজমাধবের কাব্য গঠিত। এ কাব্যে প্রতিভার প্রখরতা নেই সত্য তবে আন্তরিকতা আছে।

দ্বিজমাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের দিকটিও সহজেই চোখে পড়ে। এই কাব্যের মাঝে মাঝে বিষ্ণু পদ রয়েছে ঃ

মৈলু মৈলু মঞি বাঁশীয়ার জ্বালায়ে।
গৃহ কর্ম লোক ধর্ম রাখন না জায়॥
বাঁশের বাঁশী কহে কথা শুনিতে মধুর।
যে জনে দিয়েছে ফুক সে জন চতুর॥

কিম্বা ঃ বিনোদিনী, বিলম্ব না করিতে জুযায়ে।
তুয়া পথ নিরখিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে॥ ইত্যাদি

এই বিষ্ণুপদগুলি স্বভাবতঃ চৈতন্যযুগের সাহিত্য-জগতের স্বরূপকে তুলে ধরেছে।

দ্বিজমাধবের কাব্যে তন্ত্রসাধনার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। মত্তলীলার পর কালকেতু স্বর্গে গেলে মহাদেব তাকে মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

শুন শুন কহি তত্ত্ব অবে নীলাম্বর।
আপন শরীর চিন্ত হইতে অমর।
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গল পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে॥
জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান।
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান॥
সে জোয়ারে দেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়াপিণ্ডে হইব দেখা নিশ্চল শরীর॥
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত॥
সে অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান।
নহি টলিবেক পথ সুস্থির পুরাণ॥

মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দ কৈলে জিনিবা শমন॥

তন্ত্র-সাধনার যে ধারা চর্যাগীতিপদাবলীতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ খণ্ডে, নাথ সাহিত্যে, শাক্ত পদাবলী-সাহিত্যে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে দ্বিজ-মাধব বাংলাদেশের ধর্মসাধনার রূপকে তাঁর কাব্যে সংযুক্ত করেছেন।

দ্বিজমাধবের কাব্যের সাহিত্য-মূল্য কম, এ কাব্য ব্রতকথার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। তবে তাঁর কাব্যে বাঙালীর সমন্বয়ী ধর্মসাধনার রূপটি পরোক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যশাখার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম। কবি-প্রতিভার দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে মধ্যযুগের বাংলাকাব্য-ধারার শ্রেষ্ঠতম কবি বলাই সঙ্গত। বস্তুতঃ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-জগতের কয়েকজন বৈষ্ণবপদকর্তা এবং চৈতন্যজীবনী রচয়িতা কবির কথা এবং অন্ত-মধ্যযুগের ভারতচন্দ্রের কথা বাদ দিলে মুকুন্দরামকেই প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যধারার একচ্ছত্র সম্রাট বলতে হয়। শিল্প-নৈপুণ্যে, রসের গভীরতায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায়, সহানুভূতির ব্যাপ্তিতে এবং মানবীয় রসপ্রীতির প্রাবল্যে মুকুন্দরাম তুলনাবিহীন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যশাখার গতানুগতিক কাহিনীতেই তিনি আপন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনা শৈলীর সাক্ষ্য অনুসারে স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় যে আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করলে তিনি প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক হতে পারতেন। বাস্তব রসপ্রীতির সাহায্যে মুকুন্দরাম যেভাবে তাঁর কাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে তুলেছেন মধ্যযুগের কাব্যজগতে তার তুলনা বিরল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যশাখার অন্যান্য কবিদের যশ তিনি আপন প্রতিভার সাহায্যে হরণ করে নিয়েছিলেন, মঙ্গলকাব্যজগতে তিনি প্রতিভার প্রদীপ্ত দিবাকর।

কালগত দিক থেকে মুকুন্দরাম দ্বিজমাধবের পরবর্তী কবি। মুকুন্দরাম ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবির বয়স যখন আনুমানিক পঁচিশ তখন দেশের রাজনৈতিক

আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা সৃষ্টি হয়, ফলে কবি স্বভূমি পরিত্যাগ করে আড়রা ব্রাহ্মণভূমির ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা যেন তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার জ্বলন্তরূপকে ধারণ করে রয়েছে। এই আত্মবিবরণী বাংলাদেশের ইতিহাসেরও অমূল্য সম্পদ :

শুন ভাই সভাজন   কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে   কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমা বাজ   তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি   দামিন্যায চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ   বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে   প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥

এই মামুদ সরিপের দাপটে কবি পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই দাপটের মর্মস্পর্শী চিত্র কবি এঁকেছেন :

উজির হল রায়জাদা   বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া   পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারী ॥

খোদ শাসক যখন অত্যাচারী তখন ক্ষুদে শাসকরাও নখদন্ত বার করে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে, জনজীবন অত্যাচারের বেড়াজালে ছটফট করে :

প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥

এই অবস্থায় শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় কবি সপরিবারে ঘর ছাড়েন, পথে ভয়, নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই :

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগর।
তৈলবিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।

এই অবস্থায় ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন কবি স্বপ্ন দেখেন যে দেবী চণ্ডী তাঁর শিয়রে উপস্থিত, দেবী কবিকে মহামন্ত্র দিলেন। কবি শেষ পর্যন্ত আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমির নিরুপদ্রব আশ্রয়ে উপস্থিত হন। তিনি বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন :

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ শ্রীকবি কঙ্কন গান ॥

মুকুন্দরাম তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গাঢ় রঙের সাহায্যে, পাণ্ডিত্যের পরিচ্ছন্ন পরিমার্জনার সহায়তায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। কাব্য মধ্যে তাঁর উদার প্রসন্ন দৃষ্টি, সুদূর প্রসারী মনন এবং ব্যাপক গভীর সহানুভূতি স্পষ্ট স্বচ্ছভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কাব্য ধর্মসংস্কারের ছায়াতলে রচিত অথচ তাঁর মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি নেই, আসলে তিনি কবি—এই-ই তাঁর একমাত্র পরিচয়। চিন্তার জগতে বাঙালী যে সমন্বয়বাদী, মুকুন্দরামের কাব্যে প্রতিফলিত ধর্মবোধ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের ধর্মমত কি ছিল তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য, তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী মুকুন্দরাম বৈষ্ণব কিম্বা শাক্ত, শৈব অথবা গাণপৎ—বিশেষভাবে কোন কিছুই ছিলেন না, বলতে কি তিনি সবকিছুই ছিলেন। কবি স্মার্তপথের প্রত্যেক শাখায়

বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মমতের এই উদারতার জন্য কবির কাব্য ভাববিকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছে। কবির কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক হলেও কবি তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছেন। তাঁর বাস্তবানুগ কাহিনী-পরিকল্পনা কাব্যখানিকে গল্পরসের সার্থক সামগ্রী করে তুলেছে। দেবখণ্ডে শিব পার্বতীর সংসারকে কেন্দ্র করে কবি গল্প বলেছেন, নরখণ্ডে কালকেতু কাহিনীতে এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে কবি গল্প বলেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিপাটি গল্প নিপুণ পরিবেশে রঙে রসে ভবে উঠেছে। এইজন্যই তাঁব রচনা উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত, এইজন্যই তিনি বাংলাদেশেব অমর কাহিনী-কাব্যকার। তিনি সার্থক গণসাহিত্যিক, তাই নীচ জাতের ব্যাধ কালকেতু বলিষ্ঠ নায়ক। তিনি জীবনের প্রাত্যহিকতার আকাশে অপরাহ্নের বর্ণসৌন্দর্য স্থষ্টি করেছেন। জীবনের এই প্রাত্যহিকতায় বৃহৎ ব্যাপক বাঙালী জীবন বিধৃত, ব্যাধখণ্ডে নীচ-জাতের বাঙালী এবং বণিক খণ্ডে উচ্চসম্প্রদায়ের বাঙালী স্থান পেয়েছে। প্রাতাহিক জীবনেব প্রত্যেকটি অঙ্গ—বৃত্তি, বেশভূষা, উৎসব, রান্নাবান্না, পরিতৃপ্ত আহারের দৃশ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, দাম্পত্যজীবন, দুই সতীনের কলহ এমন কি চাকব চাকবাণীর আচার আচবণ—প্রত্যেকটি দিকে কবির তীক্ষ্ম রসিক দৃষ্টি সম্পাতিত হয়েছে। কবির রসিক-দৃষ্টির জন্যই তাঁর কাব্যে ভালমন্দে-ভরা জীবন পরিপূর্ণ-ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে পঙ্কোদ্ভূত রক্তাভ শতদল।

প্রথমেই আমরা কবির চরিত্র-স্থষ্টির দক্ষতা লক্ষ্য করি, তাঁর কাহিনীর দেব-চরিত্রও মানবগুণ মণ্ডিত। সেজন্য শিবের মত ঘরজামাইয়ের আচার আচরণে তিক্ত হয়ে মাতা মেনকা কন্যা পার্বতীকে বলেছেন:

রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরজামাই রাখিয়া জোগাইব কত ভাত॥

মনে মনে পার্বতী স্বামীর ব্যবহারে যে তুষ্ট ছিলেন এমন নয়, তবে

মায়ের এ কথায় তিনি পতিব্রতার ভূমিকা পালন করলেন, কটিদেশে অঞ্চলের গ্রন্থি দিয়ে মায়ের সঙ্গে কোন্দলে রত হলেন :

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন ॥
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান ॥
রাঁধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমাব দুয়ারে দিনু কাঁটা ॥
মৈনাক তনয় লয়্যা সুখে কর ঘর।
কত না সহিব খোঁটা যাব দেশান্তর ॥

এই বলে ক্রোধের বশবর্তী হযে দেবী বাপের বাড়ী ছেড়ে চললেন, কিন্তু যাওয়ার কালে তাঁব মনে দুঃখ বেদনা, মায়া মমতা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো :

এত বলি যান দেবী ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ ॥

পিত্রালয় ত্যাগ করে দেবী কৈলাসে হাজির হলেন এবং সেখানে দুঃখ দারিদ্র্য তাঁকে তিলে তিলে দগ্ধ করতে লাগলো। ভিখারী শিব সংসার প্রতিপালনে অক্ষম। একদিন ভিক্ষা করে তিনি দিনকতক বসে খেতে চান এবং না পেলে পার্বতীকে কটুবাক্য বর্ষণ করে বলেন :

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে ॥

কিন্তু পার্বতী যখন জানান যে সে ভিক্ষায ধার শোধ হয়েছে তখন শিব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, দেশান্তর যেতে চান। এই অবস্থায় দেবী নিজের পূজালাভ করায় উদ্যোগী হলেন, কিন্তু অবনীমণ্ডলে তখন শিবের একাধিপত্য। পূজালাভের ব্যাপারে স্বামীর কাছে হেরে গিয়ে দেবী শেষ পর্যন্ত স্বামীরই আশ্রয় নিলেন। পত্নীকে তুষ্ট করার জন্য শিব ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে ধর্মকেতু ব্যাধের

ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। দেবীর মতিগতি দেখে মনে হয় যে তিনি নিতান্তই বঙ্গললনা। মুকুন্দরাম দেবসমাজকে বাংলাদেশের সমাজ-সংসারে নিয়ে এসে দেবতা-মানবের সম্পর্ককে নিবিড় করে দিয়েছেন। মানবসংসার সম্পর্কে কবির সহানুভূতি স্বাভাবিক, এইজন্য দেবীর পূজাপ্রচারক কালকেতু যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই ব্যাধ-পরিবার নিতান্ত দরিদ্র কিন্তু মানসিক শান্তি সেখানে বিরাজিত :

নিদয়া বিহরে হাটে মাংস লয়্যা গেলা হাটে
অন্যদিন বেচয়ে ফুল্লরা
শাশুরী যেমন ভনে সেইমত বেচে কিনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা।
মাংস বেচি লয় কড়ি চালু লয় দাল বড়ি
তৈল লোন কেনয়ে বেসাতি
শাক বাইগণ মূলা আঁটা থোড় কাঁচকলা
সকলে পূরিয়া লয় পাতি।

ব্যাধ ধর্মকেতুর ঘর সুখী, সেখানে কর্তব্যপরায়ণ পুত্র কালকেতু আছে, একান্ত অনুগতা পুত্রবধূ ফুল্লরা আছে। এমন সুখী পরিবারের স্বপ্নই বাঙালী দেখে। এই শান্ত পরিবেশ থেকে গড়ে-ওঠা কালকেতু যখন দেবীর কৃপায় গুজরাটে নগর পত্তন করেছে তখনও সে সেখানে শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছে। কালকেতু গৃহহীন বুলান মণ্ডলকে সাদরে গ্রহণ করেছে :

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিও কর।
হাল পিছে একতঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

ব্যাধ সন্তান রাজা হয়েছে, কিন্তু আঙল ফুলে কলাগাছ হয় নি,

তার মধ্যে ন্যায়বোধ বিবেকবোধ পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত, এ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল নয়। মুকুন্দরাম তাঁর আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কালকেতুকে একজন সহজ সুন্দর মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কালকেতু দক্ষ শিকারী, বহুভোজী, পত্নীপ্রেমিক এবং সর্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এইগুলিই তার একান্ত গুণ, দেবীর প্রসাদে সে রাজা হয়েছে, তাই সহজ সরল কালকেতু রাজার উপযুক্ত কূটনীতি জানে না, যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার স্যাপারও বোঝে না। এইজন্যই মুরারী শীল তাকে ঠকাতে চেষ্টা করে। ভাঁড়ুদত্ত তাকে জব্দ করতে প্রয়াসী হয় এবং এই জন্যই সে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রকৃত বীরের মত আচরণ করে নি। সে সহজ সরল গ্রাম্য মানুষ, গুজরাটের রাজা হলেও সে নিতান্ত গ্রাম্যমানুষ, সরলতা ও শান্তি-প্রিয়তাই তার চরিত্রের একমাত্র পরিচয়। মুকুন্দরাম ফুল্লরা চরিত্রটিকে স্বামীসোহাগিনী নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, এইজন্য ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে বিতাড়নের জন্য দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসেছে, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধকালে স্বামীর মঙ্গলচিন্তায় দিশাহারা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে মুকুন্দরাম মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবনরূপকে সরলরৈখিক রেখায় চিত্রিত করেছেন।

মুকুন্দরাম তাঁর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা দেখিয়েছেন মুরারী শীল, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি ছোটখাট চরিত্রে, লহনা, দুর্বলা প্রভৃতি চরিত্রে। মুরারী শীল জাতে বেনে, সে কালকেতুর মাংসের দাম ফাঁকি দিতে চায়, মুরারীপত্নীও এ ব্যাপারে সুযোগ্যা সহধর্মিণী। তাই কালকেতু মুরারীর কাছে এলে মুরারীগৃহিণী বলে 'ঘরেতে নাহিক পোতদার', কিন্তু কালকেতু যখন বললো :

শুন গো শুন খুড়ি কার্য কিছু আছে ডেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।

এবারে আর জটিলতার কিছু থাকলো না, পোতদার যেন বেতার-বার্তায় এ সংবাদ পেয়ে তড়িৎগতিতে গৃহে এসে গেল, লাভের গন্ধের স্বর্গীয় মহিমা। সে খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে কালুর সঙ্গে

আত্মীয়তা করতে লাগলো, 'ভাইপোর জন্য তার যেন চিন্তার অবধি নেই, কিন্তু কাজের বেলায় সে সুচতুর, তাই দেবী-প্রদত্ত আংটি দেখে সে ব্যাধ-নন্দনকে বললো :

সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল ॥

ব্যাধনন্দন কোনদিন সোনারূপা দেখেনি, অতএব তাকে একথা বলতে বাধা নেই, কি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞান। কিন্তু কালকেতু অন্যত্র আংটি যাচাই করতে গেলে মুরারী শীল অভিমানে আহত হয়ে বলে :

ধর্মকেতু ভায়া সনে কৈলুঁ লেনা-দেনা।
তাহা হইতে ভাগপো হয়াছ সেয়ানা ॥

মুরারী শীল সতর্কভাবে ধর্মকেতুর প্রসঙ্গ এনে কালকেতুর মনে লজ্জা-সংকোচ জাগিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায়।

ভাঁড়ুদত্তও এই জাতের চরিত্র। সে জাত্যাভিমানী অথচ দরিদ্র, কালকেতুকে সে মনে মনে বোকা ব্যাধ ভাবে। তাই তাকে ভাঁড়ু রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ দেয় :

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষয় দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধনে দিবে নাগা।

বলা বাহুল্য, এধরনের পরামর্শে কালকেতু নির্বিকার ছিল। কালকেতুর অজ্ঞাতে ভাঁড়ু হাটে তোলা তোলে, এ ধরনের কাজ করার ভূমিকা স্বরূপ সে আগেই কালকেতুকে ভেট দিয়ে এসেছে :

ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়াণ।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ ছেঁড়াধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান।
প্রণাম করিয়া ধীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥

কিন্তু স্বার্থে ঘা লাগামাত্র, কালকেতু তাকে তোলা তুলতে নিষেধ করা মাত্র, ভাঁড় তার স্বার্থপর কুচক্রী রূপ উদ্ঘাটিত করলো। তিন গোটা শর আর একখানি বাঁশের মালিক কালকেতু দৈবযোগে রাজা হয়েছে এই কথা সে কালকেতুকে শুনিয়ে দিলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো :

হরি দত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়াহাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাটের ধরা।
পুনরার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

তারই চক্রান্তে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে বন্দী করলেন। কিন্তু দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে যেইমাত্র কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে ছেড়ে দিলেন অমনি ভাঁড়ু দরবিগলিত নেত্রে কালুর কাছে হাজির :

তুমি খুড়া হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

এ যাত্রায় এমন মধুমাখা বাক্যেও কোন ফল ফললো না, তার দুর্গতির এক শেষ হলো। সে মুণ্ডিত মস্তক নিয়ে অন্যত্র চলে গেল এবং সেখানে প্রচার করলো যে সে গঙ্গাসাগরে মাথা কামিয়ে এসেছে। এ চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

এই শ্রেণীর অপর চরিত্র হলো বণিক খণ্ডের দুর্বলা দাসী। সে লহনার দাসী, কিন্তু যখন সে দেখলো যে লহনা এবং খুল্লনা সতীন হওয়া সত্ত্বেও পরম প্রীতিভরে বসবাস করে তখন তার মর্মদাহ শুরু হলো, তার ফর্মুলা অনুযায়ী :

যেই ঘরে দু সতীনে না করে কোন্দল।
সে ঘরে যে বসে চেড়ি সে বড় পাগল ॥

অতএব তার সর্বপ্রযত্নে দুই সতীনে কোন্দল লাগলো, তার স্বার্থসিদ্ধির পথ সহজ হলো। অবশ্য তার এই কুকর্ম, সে কেবল লহনার মঙ্গলের জন্য। এদিক দিয়ে দুর্বলা রামায়ণের মন্থরা দাসীর সাক্ষাৎ বংশধর।

লহনা চরিত্রে মুকুন্দরাম বিগত যৌবনা বন্ধ্যা একনারীর বেদনার্ত হৃদয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। খুল্লনা লহনার খুড়তুতো বোন, এই 'বোন সতীনের' হাত থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই তার যাবতীয় প্রয়াস, এ কারণে সে স্বামী-বশের জন্য তুক করেছে, খুল্লনাকে কষ্ট দিয়েছে এবং লাসবেশে স্বামীর কাছে গিয়ে ধিক্কৃত হয়েছে। সে ধিক্কার অত্যন্ত পীড়াদায়ক, তার নারীত্বের অক্ষমতাকে আঘাত হানার জন্যই ধনপতি বলেছে :

চল ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি।
যদি না খাইবি বাঁজি পাটডর বাড়ি॥

নবপত্নীর মোহে প্রমত্ত স্বামীর এই শেলসম উক্তিতে লহনার বুক ফেটে গেছে, সে বলেছে :

ফুরাল্য যৌবনকাল এবে সে সতান কাল
তৃণসম আপনাকে বাসি।
ঔষধ সাধিতে গত সব হৈল বিপরীত
ঠাকুরাণী হয়্যা হৈলুঁ দাসী॥

লহনার এই মর্মবেদনা প্রাগাধুনিক বাংলা দেশের পারিবারিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই চিত্র বাঙালী-জীবনে সত্যই মর্মন্তুদ।

ক্ষুদ্র পরিসরে মুকুন্দরাম তাঁর অপ্রধান চরিত্রগুলিকে পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন, তাদের হৃৎস্পন্দন তাঁর কাব্যকে প্রাণ-পরিপূর্ণ করে তুলেছে। সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনেও মুকুন্দরামের দক্ষতা সহজেই দৃষ্ট হয়। গুজরাট নগর পত্তনকে কেন্দ্র করে কবি তার পরিচয় দিয়েছেন, এই পরিচয়ে তাঁর নগর পরিকল্পনা ক্ষমতাটি সহজেই বোঝা যায়।

সমগ্রতঃ মুকুন্দরামের কাব্য জীবনরসে ভরপুর। বিভিন্ন অবস্থায় জীবনের রূপ কি ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, জীবনের গতিপ্রকৃতিই বা কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় মুকুন্দরামের কাব্যে রয়েছে। সর্বত্রই কবির রসদৃষ্টি অনুপম আস্বাদন সৃষ্টি করেছে, তাই

দুঃখের বেদনার্ত পরিবেশও তাঁর কাব্যে একধরনের কোমলতায় পরিমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর আগে কাহিনী কাব্য একপেশে চরিত্র সৃষ্টি করেছে, একসুরে বেজেছে, কিন্তু তিনিই চরিত্রকে পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট করে তুললেন; তাঁর সাহিত্য-সাধনায় কাহিনীতে বৈচিত্র্য সংযুক্ত হলো। পরবর্তীকালের ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিরা তাঁরই সাহিত্য-সাধনার ফল।

মুকুন্দরামের পরবর্তীকালে মুক্তারাম সেন, দ্বিজরামদেব প্রভৃতি কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-শাখায় মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তিতে বিরাজিত থাকায় অন্যান্য কবির কোন প্রভাব এই কাব্য ধারায় পড়েনি। মুকুন্দরামের পরবর্তী কবি দ্বিজ-রামদেব সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর 'অভয়ামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। তাঁর কাব্যে বৈচিত্র কিছু নেই, তবে এই কাব্যের ধনপতি সদাগরের কাহিনী কালকেতু কাহিনীর দ্বিগুণ। তাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার বহু পদ ও ধূয়া সংযোজিত হয়েছে। চট্টগ্রামের কবি মুক্তারাম সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি নিজে সাধক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর কাব্যে যে আত্মবিবরণী আছে তাতে কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিবরণীতে স্বভূমিকে বন্দনা জানিয়ে তাঁর কাব্য শুরু করেছেন:

চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোাম পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর॥ ইত্যাদি।

মুক্তারামের কাব্যের ভাষা সহজ, সরল। তাঁর কাব্যের আকার ছোট।

মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন হরিরাম, এঁর কাব্যে মেদিনীপুর অঞ্চলের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কাব্যখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে রচিত।

রামায়ণ রচয়িতা কবি রামানন্দ যতি একখানি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যকে তিনি মুকুন্দরামের কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় লালা জয়নারায়ণদেবের 'চণ্ডিকামঙ্গল', চট্টগ্রামের কবি ভবানীশঙ্করের সুবৃহৎ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করা যায়। তবে এই সব কাব্য বাংলাকাব্যধারাকে মৌলিক কোন দানে পুষ্ট করে নি।

চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল শাখাটির উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই করতে হয়। কালের ব্যবধানে এই কাব্যধারা বাংলাদেশের সর্বত্র আত্মবিস্তার করে। এই যুগের মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন। কবি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর কাব্যে যে আত্মবিবরণী আছে তা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের অনুসরণে লেখা :

শুন ভাই আত্মকথা দেবী হৈল বরদাতা
সহায় পূর্ব্ব বিষহরি।
বলভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয়
তাঁহার তালুকে ঘর করি॥
তাঁহার বাজতি শেষ চলি গেল স্বর্গ দেশ
তিন পুত্রে দিয়া অধিকার।
... ...
তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লিখা পড়া।
তাহার কলম বশে প্রজা নাহি চাষ চষে
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥

এই অবস্থায় কবির জনক-জননী সন্তান-সন্ততি নিয়ে দেশছাড়া হন। পথে কবি দেবীর প্রত্যাদেশ লাভ করেন কাব্যরচনার জন্য।

ক্ষেমানন্দের কাব্যের মধ্যে তাঁর বর্ণনা শক্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এই বর্ণনায় সরলতা ও সহৃদয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় :

চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইয়া যোগী যোগিনী হৈয়া
চলিল বেহুলা নখিন্দর।

রূপজিনি তিলোত্তমা রক্ত বস্ত্র পরে রামা
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর।
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা
নখিন্দর চলে তার আগে
বেহুলা যায় পিছু পিছু লজ্জায় না বলে কিছু
মায়ারূপে দোঁহে ভিক্ষা মাগে।

এইভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বর্গপ্রত্যাগত বেহুলা লখীন্দর স্বজন সমক্ষে হাজির হয়েছে। বেহুলা শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে হাজির হয়েছে ডোমনীর ছদ্মবেশে। সেখানে চিত্রিত একখানি পাখা বিক্রি করতে গিয়ে সে সনকার মনে শোকের আবেগ সঞ্চারিত করে দিয়েছে :

বেহুলা নখাই নামে পূর্ব শোক জাগে।
সনকা ক্রন্দন করে ডোমনার আগে।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে অন্য কোন বৈচিত্র্য না থাকলেও বর্ণনার সহজ স্বচ্ছতায়, কারুণ্যের অভিসিঞ্চনে তাঁর কাব্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ক্ষমানন্দ নামে অপর একজন কবির সন্ধানও পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যের কাহিনীর কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের অপর এক জনপ্রিয় কবি দ্বিজ বংশী দাস। কবি বাংলার মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। তিনি মনসার ভাসান গান করতেন। তাঁর কাব্য করুণরসে পরিপূর্ণ। এই কাব্যধারার অন্যান্য কবি যথাক্রমে বিষ্ণুপাল, জীবনমৈত্র, জগৎ জীবন ঘোষাল, সীতারাম দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রভৃতি। সকলেই অবশ্য গতানুগতিক ভাবেই কাব্য রচনা করেছেন। এই গতানুগতিকতার মধ্যেও তাঁদের সীমিত শক্তির প্রকাশ করেছে এবং পরোক্ষে বাংলা কাব্যধারাকে কিছু পরিমাণে পরিপুষ্ট করেছে।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় স্বতন্ত্র একটি স্রোত ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে। এই কাব্য-স্রোতের কোন রূপ চৈতন্য-পূর্ব

যুগে ছিল কি না তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। এই কাব্যশাখার কাহিনী একটু স্বতন্ত্র—এখানে যুদ্ধ বিগ্রহের, বীরত্বের একটা বিশেষ স্থান আছে এবং এ কাব্য বিশেষভাবে আঞ্চলিক। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্যের ভূমিকা গ্রহণকারী হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পাবে। ধর্মঠাকুরের মহিমাকীর্তনই এই কাব্যের মূল কথা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। লাউসেন রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের পুত্র, গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা পুত্র; গৌড়েশ্বরের পাত্র মহামদের ভাগিনেয়। ধর্মঠাকুরের বরে লাউসেনের জন্ম। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের প্রধান সামন্ত ছিলেন। তিনি রাজার বিদ্রোহী প্রজা ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে উপযুক্ত ছয় পুত্র হারান এবং নিজের রাজধানী ঢেকুরগড় থেকে বিতাড়িত হন। প্রৌঢ় কর্ণসেন এই বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েন। পুত্রশোকে তাঁর পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। এই অবস্থায় গৌড়েশ্বর প্রিয় সামন্তকে সান্ত্বনা দেন, আবার তাঁকে ভূখণ্ড দান করেন এবং নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন। এই বিবাহে পাত্র মহামদের বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু রাজা কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেন। এতে মহামদ ক্ষিপ্ত হয়ে কর্ণসেনের প্রতি, নিজ ভগ্নী রঞ্জাবতীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। মহামদ কুচক্রের আধার, তার ক্রূরতাও অপরিসীম। কিন্তু রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবিকা, সেজন্য মহামদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। কালে ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে লাভ করেন এবং এই পুত্রকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধর্মঠাকুর কর্পূর ধবলকে সৃষ্টি করেন। লাউসেন ক্রমে অদ্বিতীয় বীর হয়ে ওঠে। সে ইছাই ঘোষকে দমন করে, কামরূপ জয় করে। গৌড়েশ্বরের আদেশে সে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় দেখায়। লাউসেন যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর তার অনুপমা পত্নী কানাড়াও তেমনি বীরাঙ্গনা। ধর্মমঙ্গলকাব্য শৌর্য বীর্যের কাহিনীতে এবং কুচক্রান্তে পরিপূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের যে পরিচয় আছে তাতে মনে হয় এই দেবতা বৌদ্ধ প্রভাব জাত। ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তাঁর পূজক ডোমজাতীয়, তাঁর কাছে

শূকর প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। এ দেবতার গোত্র নির্ণয় করা খুব সহজ নয়, তবে এই দেবতার সর্বাঙ্গে যে লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন রয়েছে তা অনুমান করা যায়। কোন কোন দিক থেকে আবার এই দেবদেহে বৈদিক সূর্যদেবতার ছায়া ক্ষীণভাবে এসে পড়েছে। ধর্মদেবতার দৃষ্টান্ত দেখে অনুমিত হয় যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাঠামো চৈতন্য-পূর্ব যুগেই রচিত হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি হিসেবে ময়ুরভট্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কাব্যের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। ফলে তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এ পর্যন্ত যে সব কবির কাব্য পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে খেলারামের কাব্যই ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কাব্য বলে মনে হয়। অবশ্য কবির খণ্ডিত পুঁথি মাত্র পাওয়া গেছে। এই কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোক থেকে জানা যায় যে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে কবি তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। অবশ্য খেলারামও এখন পর্যন্ত পূর্ণ জ্ঞাত কবি নন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী। কবি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর কাব্যের ছন্দে অলঙ্কারে রয়েছে; সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিনি তাঁর কাব্যকে পরিসজ্জিত করেন। অন্যদিকে তাঁর কাব্যে বীররসও পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আদি রস বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করেছিলেন। কবি লাউসেনের বিদ্যাসীমা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তাঁর জ্ঞান সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়:

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র ॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বচ্ছর ॥

সম্ভবতঃ মাণিকরামের সমসাময়িক ধর্মমঙ্গলকাব্যের অন্য কবি

হলেন রূপরাম। অবশ্য এঁর আগেও একজন রূপরামের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি আদি রূপরাম হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। মাণিকরামের সমসাময়িক রূপরাম চক্রবর্তীর কালনির্ণয় এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তবে মনে হয় কবি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি বর্ধমান জেলার কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বাড়ীতে টোল ছিল; পিতার মৃত্যুর পর কবি অগ্রজ রামেশ্বরের কাছে পাঠ গ্রহণের কালে অমনোযোগিতা দেখানোর জন্য তিরস্কৃত হন। একদিন তিনি গৃহত্যাগ করে বিদ্যালাভের জন্য নবদ্বীপের অভিমুখে যান, এই সময়েই তিনি ধর্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। পথিমধ্যে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হলেন ঃ

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল ॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর ॥
আমি ধর্ম ঠাকুর বাকুড়া রায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শুন রূপরাম ॥

কবির কাব্য গতানুগতিক, তবে কবি মাঝে মধ্যে তাঁর বর্ণনা-চাতুর্য দেখিয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারায় শ্যাম পণ্ডিত, রামদাস আদক, সীতারাম দাস প্রভৃতি কবির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই কাব্য-ধারার সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরামের কবিপ্রতিভা ধর্মমঙ্গলকাব্যের অন্য কবিদের রচনাকে ম্লান করে দিয়েছে। ঘনরাম সুপণ্ডিত, সুরসিক এবং পরিণত শিল্পবোধ যুক্ত কবি ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মঙ্গলকাব্যের যে আদর্শ-রূপ সৃষ্টি করেন ঘনরাম যেন তাকেই অনুসরণ করেন। চরিত্র পরিস্ফুটনায়, কাহিনী পরিবেশনায়, ছন্দ অলংকারের প্রয়োগে ঘনরামের নৈপুণ্য সহজেই চোখে পড়ে।

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বসতি ছিল। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়। কবির মাতা সীতাদেবী রাজবংশের কন্যা ছিলেন। কবি রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, এজন্য ছেলেদের নাম রেখেছিলেন রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ এবং রামকৃষ্ণ। কবি তাঁর কাব্যের রচনারম্ভ কাল ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি গ্রন্থসমাপনের কাল উল্লেখ করেছেন ঃ

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
সবে শুন যে কালে হইল সমাপন॥

তাঁর উক্তি অনুযায়ী ১৬৩৩ শক (১৭১১ খ্রীঃ) ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

ঘনরামের কাব্যের সবচেয়ে বড় গুণ, কবি তাঁর কাব্যকে গ্রাম্যতাহীন করেছেন। অন্য দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে ঘনরামই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান এবং প্রথম কবি যিনি পৌরাণিক হিন্দু চেতনার আভিজাত্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতেই মহাকাব্যের কাঠামো বিদ্যমান, ঘনরামেব সযত্ন শিল্প প্রয়াসের ফলে তাঁর কাব্য মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে। কবি তাঁর কাব্য রামায়ণ মহাভারতের আদর্শে সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ছিলেন, এইজন্য পৌরাণিক মহাকাব্যের রীতি এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনীর ঘননিবদ্ধতাকে তিনি একত্র করেছেন। কাব্যের চরিত্র ও রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রের সমান্তরালভাবে সৃষ্ট। এইজন্যই তিনি লাউসেন কর্পূর ধবলকে কখনও শ্রীরামলক্ষ্মণ, কখনও বা কৃষ্ণবলরাম আবার কখনও লবকুশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কল্পনার মহামদ এবং লাউসেন যথাক্রমে কংস ও কৃষ্ণ। কবি তাঁর কাব্যে নানা প্রসঙ্গেই রামায়ণ এবং মহাভারতের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। এইজন্য দেবীচণ্ডীর ভক্ত ইছাই ঘোষ লাউসেনের কাছে পরাজিত হলে দেবী

যখন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে লাউসেনকে বধ করবেন তখন মহাসমস্যার সৃষ্টি হলো। দেবতারা জানেন যে ধর্মঠাকুরের ইচ্ছা, ইছাইয়ের মৃত্যু। এ অবস্থায় দেবতারা ভাবতে লাগলেন যে কিভাবে দুই কুল রক্ষা করা যায়; কবি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে পরিস্থিতিটির ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

দুই রক্ষা কেমনে এমন চাহ যুক্তি।
সুধন্বা অর্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি ॥
পার্থ বলে সুধন্বাকে না বধিয়া বাণে।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
সুধন্বা বলেন যদি না কাটি এই বাণ।
কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়ে হারাই পরাণ ॥
আপনি রাখিল কৃষ্ণ দুজনারি পণ।
সেই রূপে যুক্তি করেন দেবগণ ॥

ঘনরাম অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণাদি থেকে প্রসঙ্গ সংগ্রহ করে তাঁর বক্তব্যের গভীরতা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর গ্রন্থে ভাগবত-পুরাণের নানা প্রসঙ্গ ও প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় যে ঘনরাম সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে, আনন্দবেদনায় জীবনকে আদর্শায়িত স্তরে উন্নীত করে মহাকাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কাহিনীর নিতান্ত লৌকিক রূপ এবং উদ্দেশ্যমুখিতা তাঁর অভীপ্সার প্রতিবন্ধক ছিল। তা না হলে তিনি যে ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কাহিনীর গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তাতে তাঁর কবিসামর্থের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

চরিত্র চিত্রণে ঘনরাম বিশেষত্বের দাবি করতে পারেন। তিনি লাউসেনের চরিত্রটিকে তাঁর কাব্যের মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করেছেন; এ চরিত্র দৈবানুকূল্য লাভ করেছে সত্য, তবু চরিত্রটির মুখ্য উপাদান মানবীয় ভাবসম্পদ। বীরত্বের আদর্শে, চারিত্রিক সমুন্নতির ঔজ্জ্বল্যে লাউসেন বাংলাসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। ঘনরাম মহামদ চরিত্রটিকে ‘ভিলেনে’র ভূমিকায় চিত্রিত করেছেন। কবি সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য

দেখিয়েছেন বীর্যবতী নারী-চরিত্র চিত্রণে; তাঁর কানাড়া বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি। বস্তুতঃ ঘনরামের কাব্যে চরিত্রের যেন মিছিল চলেছে, এমন কি গণচরিত্রও এই মিছিলে সংযুক্ত হয়েছে। ঘনরামের কাব্যে যুদ্ধবিগ্রহের যে বর্ণনা আছে তা গতানুগতিক, কিন্তু কবি সেই বর্ণনাকে যথাসম্ভব প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন :

তরাসে তবল কেহ তড়বড়ি ধায়।
হুতাশে হুটুরে ভূমে পড়ে ঠায় ঠায়॥
ঢাল খাড়া ফেলে কেহ দাঁতে করে কুটা।
কেহ বেদে ছেঁদে ধরে লখের পাছুটা॥
ওড়ে আড়ে থাকে কেহ করে চুপ চুপ।
কালিন্দী গঙ্গার জলে পড়ে ঝুপ ঝুপ॥

যুদ্ধে অনেকের প্রাণ গেছে, আহতের সংখ্যাও প্রচুর, যারা বেঁচেছে তারা :

পার হয়ে মাথে কেহ বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাশুলা বৈদ্যনাথ॥
কেহ বলে মুস্কিল আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির॥

ভাড়াটে সৈন্যের মর্মান্তিক চিত্র কবি অতি সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। ঘনরামের কাব্যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে তার মূলে রয়েছে ন্যায়ধর্মের নির্দেশ; এই ন্যায় ধর্মকাব্যকে মহাকাব্যের নীতিবোধে দীক্ষিত করেছে। এই জন্যই ঘনরাম লিখেছেন :

স্বধর্মে থাকিলে জয় অধর্মে সংহার।
তার সাক্ষী বিভীষণ রাবণলঙ্কার॥

ধর্মমঙ্গলকাব্য যুদ্ধ বিগ্রহ মূলক কুচক্রান্তপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে গঠিত হলেও ঘনরাম এই কাহিনী কাঠামোতেই পারিবারিক জীবনরস সিঞ্চন করতে সমর্থ হয়েছেন। এইজন্য তাঁর কাব্যে সন্তানের জন্য মাতার উৎকণ্ঠা, তরুণী ভার্যা লাভ করে বৃদ্ধের চিত্তক্ষোভ প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে রন্ধনশিল্পের চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন,

নারীর প্রসাধন কলাও তাঁর দৃষ্টি অতিক্রম করে নি। ঘনরাম জীবন-রসের বিচিত্র উপাদানকে তাঁর কাব্যে সমান্বিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবির সচেতন ছন্দপ্রয়োগ এবং অলঙ্কার সংযোজনা তাঁর কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কবির ছন্দপ্রযোগ সম্বন্ধে দেখা যায় যে কবি পবিবেশ অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগ করেছেন; যেমন যুদ্ধের তীব্রতা ও গতিময়তা পরিস্ফুট করতে কবি লঘু ত্রিপদী ছন্দের অপূর্ব প্রয়োগ কবেছেন:

লোহাটা দুর্বার হাঁকে মার্ মার্
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর কুঞ্জর উপর
ধর্ ধর হুকুম গজে॥

ঘনরাম একাবলী ছন্দকে তাঁব কাব্যে ব্যবহার কবেছেন:

গণ্ডূষ ধরি স্তব কবেন সেন।
স্বর্গেতে ধর্মবাজ জানিলেন॥
শুন হনুমান মোব আবতি।
এইবার রাখ সেনেব জাতি॥

কাব্যের আঙ্গিক সজ্জায ঘনরাম সচেতন শিল্পী, তাঁব কাব্যপ্রয়াস পরবর্তীকালে ভাবতচন্দ্রেব কাব্য সাধনার পথকে সুগম কবে দিয়েছে। বাংলাকাব্য সাহিত্যে ঘ বাম সার্থক শিল্পী।

ঘনরামের পরে রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, নবসিংহ প্রভৃতি কবিগণ ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গলকাব্যেব আলোচনার পবেই শিবমঙ্গল বা শিবাযণ কাব্য-শাখার প্রসঙ্গ আসে। এই কাব্যশাখায় শিবের মহিমা কীর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে শিব একেবারে গৃহস্থ বাঙালীর ভূমিকা নিয়েই কাব্যে রূপ লাভ কবেছেন। হর-পার্বতীকে কেন্দ্র করে বাঙালী কবি যুগে যুগে পারিবারিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য-সাধনার প্রথম স্তব থেকেই লৌকিক হর-পার্বতী একটি স্থান অধিকার করে আছেন, মঙ্গলকাব্যগুলিতে হর-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের সমস্যা

সঙ্কুল চিত্র রসপরিমণ্ডিত হয়ে চিত্রিত হয়েছে। শিবায়ণ কাব্যে এই চিত্রই মুখ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির সঙ্গে শিব এমন করেই মিশে গেছেন যে এই পৃথক কাব্য-শাখা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করতে পারে নি।

লৌকিক শিবায়ণ কাব্য সমূহের মধ্যে দেব মাহাত্ম্য প্রচার অপেক্ষা লোক জীবনাশ্রিত জীবন-কেন্দ্রিক গল্পরসের নিবিড়তাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য শিবায়ণ কাব্যের প্রথমাংশে পৌরাণিক মুখবন্ধটুকু ঠিকই রয়েছে। সেখানে ইন্দ্রসভায় শিব দক্ষকে নমস্কার না করায় দক্ষের ক্ষোভ, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের বিড়ম্বনা, হিমালয় গৃহে সতীর পুনর্জন্ম লাভ, হর-পার্বতীর মিলন প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। তার পরেই এসেছে হর-পার্বতীর সংসারজীবনের দারিদ্র্যপীড়িত চিত্র। এই চিত্রই শিবায়ণ কাব্যে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য বাংলাদেশে পৌরাণিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত শিবকে কেন্দ্র করে মৃগলুব্ধ কাব্য রচিত হয়েছে। এ কাব্যের কাহিনীতে ব্যাধজীবনের স্থান আছে, তবে এ কাব্য বাংলা কাব্য-ধারাকে বিশেষ পরিপুষ্ট করেনি। শিবায়ণকাব্যেও মৃগলুব্ধ কাব্যের কাহিনী সংক্ষিপ্ত রূপে আশ্রয় লাভ করেছে। শিবায়ণকাব্যের ধারায় শিব সাংসারিক চাপে কৃষিকর্মে রত হতে বাধ্য হয়েছেন, পার্বতী তাঁকে প্রতিক্ষণে খোচা দেওয়ায় উপায়ান্তর বিহীন শিব ভাঙের নেশার ঘোর কাটিয়ে সাধের ত্রিশূল ভেঙে তৈরী করা লাঙ্গল ইত্যাদি নিয়ে চাষ চষতে গেছেন। তারপর শিব কোচনাপাড়ায় প্রেমের সন্ধান করেছেন এবং পার্বতী তা জানতে পেরে বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে শিবকে নাজেহাল করে শেষ পর্যন্ত অকর্মণ্য স্বামীকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। শিব এই নাকালের প্রতিশোধ তুলেছেন শাঁখারী বেশে পার্বতীকে মোহিত করে।

শিবায়ণ কাব্যের কাহিনীর মধ্যে দাম্পত্যজীবনের চিত্রই প্রধান, তাই স্বভাবতঃই এর মধ্যে সুযোগ মত আদিরসের কিছু কিছু ছোঁয়া আছে। অবশ্য আদিরসের উৎসার হয়েছে শিবকে কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশে শিব বিষয়ক কাব্যধারার একদিকে রয়েছে মৃগলুব্ধ—এই শাখায় রতিদেব প্রাচীন কবি, তাঁর কাব্য পাঁচালী আকারে লেখা, এ কাব্যে শিবরাত্রি ব্রত-মাহাত্ম্য মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। রাম-রাজাও মৃগলুব্ধ কাব্য রচনা করেন। এ সব কাব্য সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত। শিব বিষয়ক কাব্যের অন্যদিকে আছে শিবায়ণ—এই কাব্য শাখায় কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কবি আবির্ভূত হন। রামকৃষ্ণের শিবপার্বতীর দাম্পত্যজীবনের নিতান্ত সাধারণ চিত্র সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এই দম্পতির কলহ কবি অম্লমধুর রসে পরিবেশন করেছেন। শিবায়ণ কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর। তাঁর কাব্য-সাধনা বাংলা কাব্যধারায় কিছু সম্পদ দান করেছে।

কবি রামেশ্বর ১৭১০—১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'শিবসংকীর্তন' বা শিবায়ণ কাব্য রচনা করেন। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে কবি লক্ষ্মণ চক্রবর্তীর আত্মজ। কবির পূর্বপুরুষ ভট্ট নারায়ণ বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। কবির পূর্ব নিবাস ছিল যদুপুর। তাঁর দুই পত্নী ছিল এবং বিষয় সম্পত্তিও বেশ ছিল। কিন্তু বিষয় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে হেমৎ সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে, ফলে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি মেদিনাপুরাধিপতি রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন। কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে আত্মীয় স্বজনদের পরিচয়ও দিয়েছেন।

ধর্মচেতনার দিক থেকে রামেশ্বর সমন্বয়বাদী ছিলেন। তিনি যেমন চন্দ্রচূড়চরণকে আশ্রয় করেছিলেন তেমনি আবার বৈষ্ণবতার ভাবেও বিভোর ছিলেন। কবির চেতনায় ঈশ্বর 'মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম'। ধর্ম সম্বন্ধে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি আকস্মিক নয়, মনসা-মঙ্গল কাব্য থেকে এই সমন্বয়ের প্রয়াস দেখা গেছে। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে এই সমন্বয়ীদৃষ্টিভঙ্গির সোনার ফসল ফলতে শুরু করেছিল। রামেশ্বর যুগনির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ধর্মচেতনাকে গঠন করেছিলেন।

রামেশ্বর তাঁর কাব্যের ভণিতায় বহুস্থানে বলেছেন :

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভনে রামেশ্বর॥

প্রকৃতপক্ষে কবির এই উক্তি যথার্থ, তাঁর কাব্য গ্রাম্যতা দোষ-শূন্য বলা চলে। 'শিবের কোঁচনী-পাড়ায় প্রবেশ' এবং বাগ্দিনী প্রসঙ্গে যেটুকু অশ্লীলতা আছে তার কথা বাদ দিলে রামেশ্বরের কাব্য পারিবারিক জীবন রসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। হর-পার্বতীর বিবাহ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত, বাঙালী পরিবারের একটি বিশিষ্ট ছায়াপাতে কাব্যখানি পরিকল্পিত। অবশ্য কাব্যের কাহিনীর মধ্যেই এই গুণ নিহিত আছে, রামেশ্বর সেই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। গৌরীকে বিবাহ করে নিয়ে শিব যখন কৈলাসে যাত্রা করেছেন তখন মা মেনকা জামাইকে যা বলেছেন তা বাঙালী মায়ের হৃদয় থেকে উৎসারিত :

বরকন্যা দোঁহে কৈল দোলা আরোহণ।
কান্দিযা কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ ॥
জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজমাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে ॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ॥

এ যে দেব-সমাজের কথা নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার কবি যখন গৃহিণী পার্বতী কেমন করে রেঁধে বেড়ে স্বামীপুত্রকে খাওয়াচ্ছেন তার বর্ণনা দেন তখন বাঙালীর ঘরের চিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চর্ব্বচুষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ল মধু চতুর্বিধ ব্যঞ্জনের গণ ॥

রন্ধন করে পরিপাটি ভাবে স্বামী পুত্রদের খাওয়ান পার্বতী :

যোএ কর্যা পুত্র দুটি বসে দুই পাসে।
পার্বতী পুরট পীঠে পুরহর বৈসে ॥

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটি হাতে গুটি গুটি যত দিতে পার॥
তিন জনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥

অবশ্য এ সমস্যায় সুগৃহিণী পার্বতী কাতর নন, তিনি এ সব কাণ্ড দেখে 'মুচকিয়া' হাসেন। কিন্তু গণ্ডগোল বাধে অন্য কারণে। স্বামী কিছুই উপার্জন করেন না, অতএব পার্বতী নিত্যদিন কি করে স্বামীপুত্রদের থালা সাজিযে ভাত দেন। কাজেই অনেক ভেবে-চিন্তে পার্বতী শিবকে বললেন ঃ

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥
চরণে ধরিযা চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে॥

পত্নীর এই নরম গরম বাক্যে শেষ পর্যন্ত শিব চাষ চষতে গেলেন, কিন্তু তার ফল ফললো বিপরীত। পার্বতী তো শেষ পর্যন্ত কৃষিভূমি থেকে শিবকে ফিরিয়ে আনতে পথ পান না। এর পরে হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনে সামান্য এক কারণে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। পার্বতী বড আশা করে স্বামীর কাছে সামান্য শাখা চেয়েছেন, সধবা পার্বতী খালি হাতে লোকের সামনে অপরিসীম লজ্জায পড়েন ঃ

লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই॥

কিন্তু নিরন্তর দুঃখ দারিদ্র্যে পীড়িত শিবের বোধ হয় মেজাজের ঠিক ছিল না; তিনি পত্নীর এই কথায় তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন ঃ

ভিখারীর ভার্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥

বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

স্বামীর এই কথায় পার্বতীর বুকে যেন শেল বাজলো। সর্বংসহা পার্বতী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না, তিনি সত্য সত্যই পিত্রালয়ে গমন করলেন। শেষে বাধ্য হয়ে শিব পত্নীর মান ভাঙাতে শ্বশুরবাড়ী যান। দাম্পত্য জীবনের এ চিত্র আমাদের গৃহ পরিবেশ থেকে গৃহীত।

রামেশ্বর অষ্টাদশ শতকের খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম। কাব্যের বহিরঙ্গ পারিপাট্যে কবি সংস্কৃত রীতিকে আশ্রয় করেছিলেন। তিনি তত্ত্বদর্শী, সুপণ্ডিত. লৌকিক শিবের কাহিনীর মধ্যেই কবি তাঁর ভাবচেতনাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। কবি তাঁর কাহিনীকে হাস্যরসের আবেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছেন, ফলে দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর কাব্য সুখপাঠ্য। শিবায়ণ কাব্যশাখায় দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর একখানি কাব্য রচনা করেছেন।

শিবায়ণ কাব্য ঠিক মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত নয়, এগুলি শিবকাহিনীর কাব্যরূপ। বাংলা কাব্যধারায় শিব একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছেন; তিনি বৈদিক, পৌরাণিক এবং লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের মিশ্র উপাদানে গঠিত। সবচেয়ে বড় কথা তিনি বাঙালী-কবির রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন; তাকে নিয়ে বাঙালী কবি হাস্য পরিহাসের আসর জমিয়েছেন এবং এই হাসির অন্তরালেই দুঃখ-দারিদ্র্যের শতছিন্ন রূপও প্রকটিত করেছেন। এইখানে বাঙালীর বিশেষত্ব, এইজন্যই 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। শিব চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর প্রসঙ্গে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

অনুবাদ সাহিত্য : চৈতন্যোত্তর যুগ

চৈতন্য-পূর্ব যুগ থেকেই বাংলা কাব্যধারায় অনুবাদ কাব্যপ্রবাহ স্বচ্ছন্দ গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে এই প্রবাহ পরিপুষ্ট হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত এই প্রবাহে আত্মরূপ বিস্তার করেছে ; অগণিত কবির দানে এই অনুবাদ-প্রবাহ তার ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছে। এই পর্বের সব কবির পরিচয় অবশ্য আজ আর পাওয়া যায় না, এবং যাঁদের কাব্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাঁদের অধিকাংশই ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে পড়েছেন। একমাত্র 'কবীশ দলে পুণ্যবান' কাশীরাম দাস ছাড়া অন্য কোন অনুবাদক কবি চৈতন্যোত্তর যুগের অনুবাদ-প্রবাহে উজ্জ্বল নন। অথচ প্রত্যেক অনুবাদক কবিই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে অনুবাদের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। হয়ত ছাপাখানার দৌলতে কাশীরাম-দাস কবীশদলে পুণ্যবান হয়েছেন। তিনি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নি, তা সত্ত্বেও মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে একমাত্র তিনিই মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দীপ্যমান। এ কথা বলা বাহুল্য যে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের অনুবাদ-প্রবাহেও চৈতন্যজীবনরাগ সঞ্চারিত হয়েছে, ফলে অনুবাদের প্রত্যেকটি শাখায় প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে মানবজীবনরস প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা কাব্যপ্রবাহকে এই জীবন-রসই প্রাণসম্পদ দান করেছে। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যোত্তর যুগের অনুবাদ-প্রবাহে লৌকিক ধর্মধারণাও প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রত্যেকটি শাখা অনুযায়ী এই অনুবাদ সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ করা যাক :

(ক) রামায়ণ—আলোচ্য যুগের রামায়ণ কাব্যে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, বাশিষ্ঠ রামায়ণ ইত্যাদির প্রভাবই মুখ্য। এই সব বিচিত্র পৌরাণিক রামায়ণ কাহিনীর সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক রূপ সমন্বয় সংযোজনের

মাধ্যমে নতুন আকার ধারণ করেছে এবং ঘরের কথাকেই বড় করে দেখিয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের রামচন্দ্র প্রেম করুণাঘন মূর্তিতে পরিস্ফুট হয়েছেন। এই যুগে ৫১ জনেরও বেশী কবি রামায়ণ রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয়ই বর্তমানে লভ্য।

চৈতন্যোত্তরযুগের রামায়ণকারদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। কবির পিতৃদত্ত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। কবি ষোড়শ শতকে না সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন এ নিয়ে বাদ বিতণ্ডা আছে। অবশ্য তাঁর কাব্য কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে এবং সেইটাই বড় কথা। তাঁর কাব্যের সবচেয়ে বড় গুণ যে কবি চরিত্র-সৃষ্টিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা বিচিত্র ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আপন ভাবকল্পনার সাহায্যে রূপ নির্মাণ করেছে, এজন্যে তাঁর রচনায় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অদ্ভুতাচার্যের কৌশল্যা তাই কানুজননীর ভাবাবেশে পরিপূর্ণ, বাৎসল্যের ধারায় অভিসিঞ্চিত। সেইজন্যই তিনি স্বামী কর্তৃক অবহেলিতা অন্তঃসত্ত্বা সুমিত্রাকে স্নেহ-প্রাবল্যে বুকে টেনে নিয়েছেন ঃ

> যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
> তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥
> যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
> ইহজন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন ॥

সতীনের জন্য এমন মমত্ববোধ দুর্লভ, কিন্তু অসহায়া নারীর প্রতি নারীর এই ব্যবহার বাঙালী ঘরে দুর্লভ নয়। আবার এই কৌশল্যাই সুমিত্রাকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে স্বামীর ঘরে উঁকি দিয়েছেন। এইভাবে অদ্ভুতাচার্য বাঙালীজীবনের সার্বিক চিত্রকে অবলম্বন করে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে একদিকে বাঙালী জীবনের আদর্শায়িত রূপ অন্যদিকে তরল চপল ভাব একত্রিত হয়ে কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

রামায়ণের পরবর্তী কবি কৈলাস বসু। তিনি অদ্ভুত রামায়ণের

আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। এঁর কাব্য সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল।

আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বাংলাকাব্যের প্রথম সার্থক মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্য রচিত হয়। চন্দ্রাবতী বিখ্যাত মনসামঙ্গলকার দ্বিজবংশীদাসের সুযোগ্যা তনয়া। তিনি নিজে বিশিষ্টা কবি, তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে লোককাব্যও রচিত হয়েছে, মৈমনসিংহ-গীতিকায় তার নিদর্শন আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। চন্দ্রাবতী, বাল্যের লীলাসহচর ব্রাহ্মণবালক জয়ানন্দের প্রতি পরিণত-যৌবনে প্রণয়াসক্তা হন, উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থাও হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জয়ানন্দ এক মুসলমান নারীর রূপমোহে আবর্তিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার পাণিগ্রহণ করেন। ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনাভারকে আপন বক্ষে ধারণ করে চন্দ্রাবতী চিরকুমারী থাকেন। অবশ্য জয়ানন্দের রূপোন্মাদনা প্রশমিত হতে বেশী সময় লাগে নি, কিন্তু অনুতপ্ত জয়ানন্দ সমাধিমগ্না চন্দ্রাবতী কর্তৃক রুদ্ধদ্বার রুদ্রমন্দিরের বহির্দেশ থেকে প্রত্যাখ্যাত হন এবং নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেন। চন্দ্রাবতীও শিবের আরাধনায় দেহত্যাগ করেন। এই প্রেমিক প্রেমিকার জীবনগাথা এখনো পূর্ববঙ্গের গ্রামের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। চন্দ্রাবতীর রচিত কাব্যের কোন পুঁথি সংগৃহীত হয়নি। লোকস্মৃতির রাজ্য থেকে তাঁর কাব্যের রূপ আবিষ্কৃত হয়। অবশ্য এই রূপের মধ্যে প্রচুর আধুনিকতার ছাপ বর্তমান। সে সব মেনে নিয়েও অনুমান করা যায় যে চন্দ্রাবতীর কাব্যে নারী-হৃদয়ের কোমলতায় রামায়ণ কাহিনী নতুনতর এক রূপ লাভ করেছিল। বাংলা কাব্যধারার এমন অপূর্ব রূপ কালগর্ভে হারিয়ে গেছে। ভিষক্ রামশঙ্কর দত্ত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কৃত্তিবাস এবং অদ্ভুতাচার্যের কাব্যদ্বয়ের সমন্বয়ে রামায়ণ রচনা করেন। কাব্যখানিতে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবও কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্ট। এভিন্ন গুণরাজ

খান (মালাধর বসু নন) ভবানী দাস, দ্বিজলক্ষ্মণ, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজভবানীনাথ, বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ, রামানন্দ যতি প্রভৃতি কবি রামায়ণ রচনা করেন। এঁরা সকলেই অষ্টাদশ শতকের কবি। অষ্টাদশ শতকেই রামায়ণকে কেন্দ্র করে রায়বার কাব্য সমূহ লিখিত হয়। এই কাব্যসমূহের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ডস্থ অঙ্গদ রায়বারই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রাবণের রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে অঙ্গদ তাকে যে ভর্ৎসনা ইত্যাদি করেছিল তারই কৌতুকপূর্ণ, হাস্যরসাত্মক পরিণতি অঙ্গদ রায়বার। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে আদিরসাত্মক রুচিবিকৃত এবং ভাঁড়ামি আছে সত্য, কিন্তু এর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্তির ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে রয়েছে। রায়বার কাব্য-সমূহের কবিদের মধ্যে ফকির রাম, কাশীনাথ, দ্বিজতুলসী প্রভৃতি প্রখ্যাত।

উনবিংশ শতকের রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন গোস্বামী। তাঁর কাব্যের নাম রামরসায়ন। কবি ছিলেন, নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত। ভক্তপণ্ডিত কিশোরী মোহন কবির পিতা, কবির মাতার নাম উমা। বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামে কবির বাসস্থান ছিল। রঘুনন্দন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি পূর্ববর্তী রামায়ণকারদের সাধনাকে আত্মস্থ করে তাঁর সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যও সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত, তবে এই কাব্যের উত্তরা কাণ্ডটি বস্তুতঃ নতুন সৃষ্টি। সীতার পাতাল প্রবেশের গতানুগতিক কাহিনী এই অংশে বর্ণিত হয়নি। কবির কাব্যে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীর সন্নিবেশ ঘটায় কাব্যখানির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রামরসায়ন বাংলাভাষার বৃহত্তম কাব্যগুলির একখানি। এই কাব্যের ভাষা ছন্দ প্রভৃতিতে কবির সযত্ন প্রয়াস লক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতকে কুচবিহার রাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, স্যার আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও রামায়ণ অনুবাদ করেন। অবশ্য সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকেই রামায়ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে পৌরাণিকতার প্রভাব সমধিক হয়েছে, অনুবাদকগণ মূলকে

বেশী অনুসরণ করেছেন। তাতে অনুবাদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে, কাব্য সম্পদে ঘাটতি পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

(খ) মহাভারত—বাংলাদেশে মহাভারত মহাকাব্যের রস গ্রহণের ধারাটি সুপ্রাচীন। তবে কি অবস্থায় এবং কবে সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়, তা সঠিক করে বলা দুষ্কর। সর্বশ্রেণীর বাঙালীর জীবনসাধনার ক্ষেত্রে মহাভারতের দান অসামান্য। অবশ্য সর্বভারতীয় পটভূমিতেই একথা প্রযোজ্য। ভারতীয় জীবন রামায়ণ মহাভারতের যুগ্মধারায় পরিপুষ্ট। উপযোগিতার দিক থেকে মহাভারতের মূল্য নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, মহাভারতের অনুবাদ বাংলা কাব্যপ্রবাহকে কি ভাবে পরিপুষ্ট করেছে সেই দিকটাই আমাদের আলোচ্য।

বলা বাহুল্য মধ্যযুগের অনুবাদের আদর্শেই মহাভারতের অনুবাদও সাধিত হয়। তবে এই অনুবাদ-শাখা বিশেষ করে রাজদরবারের আনুকূল্যেই বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাগাধুনিক বাংলা-সাহিত্য কোন না কোন পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মরূপ বিকশিত করেছে, মহাভারতের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যক্ষতঃ রাজদরবার,—বিস্ময়ের কথা বিজাতীয় রাজদরবার থেকেই এসেছে। হয়ত মহাভারত কাব্যের শৌর্যবীর্যের বিস্ময়কর রূপ-সৌন্দর্য রাজারাজড়ার হৃদয়ে বীরত্বের প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল। এদিক দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ এবং ভাগবত অপেক্ষা অনেকখানি পরিমাণে পৃথক। রামায়ণ ও ভাগবতের অনূদিত রূপ বাংলার লোকজীবনের বিশ্বাস-প্রবণতার সঙ্গে সুসঙ্গতি রক্ষা করেছে—এইজন্য শূরশ্রেষ্ঠ দশরথাত্মজ রামচন্দ্র বাংলাদেশের পরিবেশে বিশেষভাবে পতিতপাবন করুণাঘন শ্রীরামের মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছেন। কংসারি, গিরি গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ প্রেমসর্বস্ব নায়ক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মহাভারতের যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি চরিত্র বাঙালীত্বের বর্ণ-বিলেপনে অন্যতর হয়ে ওঠেন নি, তাঁরা স্ব-ভাবধর্মেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের ন্যায়নীতি বাঙালীর মনে প্রগাঢ় ছায়াপাত করেছে সত্য কিন্তু মহাভারতের চরিত্রের প্রতি তার ভয়বিস্ময় মিশ্রিত

শ্রদ্ধা বিরাজিত। আংশিকভাবে পাণ্ডবদের সৌভ্রাত্র, কর্ণের বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি বাঙালী মনে জীবনরসের সন্ধান দিলেও বাঙালী মহাভারতের প্রায় কোন চরিত্রকেই আপন গৃহসীমায় এনে তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। আসলে এজন্য বাঙালী স্বভাবই দায়ী ; বাঙালী মধুরভাবে সমস্ত কিছুকে পেতে চায়, অথচ মহাভারতের মধ্যে একধরনের তেজোদ্দীপ্ত কাঠিন্য বিদ্যমান। এজন্য বাংলা কাব্য-ধারার ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে বিজড়িত হতে মহাভারতের কিছু সময় লেগেছে।

সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ করেন সম্ভবতঃ পরাগলী মহাভারতের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কবির কাব্য বাংলাদেশের শাসনকর্তা হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৮) রচিত হয়। হুসেন শাহের এক সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আদেশে কবি কাব্য রচনায় রত হন :

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥

পরাগল খান পাণ্ডবদের ভাগ্য বিপর্যয়ের, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিচিত্র কাহিনীতে কৌতূহল বোধ করেই কবিকে সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারত কাহিনী রচনা করতে বলেন :

কোনমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কর্ম করিল তারা বনের ভিতর ॥
বৎসরেক আছিল তারা অজ্ঞাত বসতি।
কোনমতে পৌরুষে পাইল বসুমতী ॥
এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া ॥

কবি 'দিনেকে' শোনানোর উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এ কাব্যে মহাভারতের কাব্যরস অপেক্ষা বর্ণনা, ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপই প্রাধান্য পেয়েছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্য আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। এই কাব্যের মধ্যে আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

প্রসঙ্গতঃ বাংলায় মহাভারতের 'সর্বপ্রাচীন রচনাকার' হিসেবে সঞ্জয়ের উল্লেখ করতে হয়। এই কবি সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ প্রচুর। বর্তমানে অবশ্য গবেষণাব আলোকপাতে সঞ্জয়ের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কবির কাব্য পূর্ববঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আজকের দিনে সে জনপ্রিয়তার মূল্যায়নের প্রয়োজন।

পরাগল খানের পুত্র নসবৎ খান চট্টগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি ছুটি খান নামেই পবিচিত। পিতার মত ইনিও মহাভারত কাব্যের উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন। ছুটি খানেব আদেশে তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করেন। কবি তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেছেন :

সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্বজন।
মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ॥
দেশিভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার।
সঞ্চারউ কীর্তি মোর জগৎ ভিতর॥

বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসা-যোগ্য। কবি উৎসাহদাতা সম্পর্কেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন :

খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু।
পিতার দুর্লভ বড় গুরুভক্তি চারু॥
দীর্ঘজীবী হউক নৃপতি ছুটি খান।
বলি কর্ণ দধীচি সমান যার দান॥

ষোড়শ শতকে রামচন্দ্র খান নামক একজন কবি অশ্বমেধ পর্ব আশ্রয় করে মহাভারতের অনুবাদ করেন। কবি বৈষ্ণব ছিলেন, ফলে তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবভক্তিবাদের সুর স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। ষোড়শ শতকে মহাভারতের অংশকে অবলম্বন করে পীতাম্বর দাস (নল দময়ন্তী কাহিনী), দ্বিজরঘুনাথ, কবি অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কাব্য রচনা

করেন। এই কবিদের প্রচেষ্টায় ক্রমে বাংলা কাব্যধারায় মহাভারতের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়ে উঠছিল। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন কবির প্রচেষ্টায় মহাভারত কাহিনী কিভাবে কাব্যরূপ লাভ করেছিল তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো ঃ

সপ্তদশ শতাব্দী—১। নন্দরাম দাসের—উদ্যোগ ও দ্রোণপর্ব, ২। বিশারদ ভণিতাযুক্ত কবির বন ও বিরাট পর্ব, ৩। কবীন্দ্র উপাধিধারী নিত্যানন্দ ঘোষের সংক্ষিপ্ত আকারের ভারত পাঁচালী, ৪। অনন্ত মিশ্রের অশ্বমেধ পর্ব, ৫। দ্বিজহরিদাসের অশ্বমেধ পর্ব, ৬। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারতের আদি পর্ব, ৬। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ভারত পাঁচালী।

অষ্টাদশ শতাব্দী—১। রাজীব সেনের উদ্যোগ পর্ব, ২। দ্বিজ-ঘনশ্যামের অশ্বমেধ পর্ব, ৩। দ্বিজকৃষ্ণরাম, দ্বিজপ্রেমানন্দের ভণিতা-যুক্ত অশ্বমেধ পর্ব, ৩। রাজেন্দ্র দাসের আদি পর্ব [এই রচনায় শকুন্তলা কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে।]

অষ্টাদশ শতকে কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর সেন এবং গঙ্গাদাস সেন সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচনা করেন।

এই বিস্তৃত কালসীমায় মহাভারতের কাহিনীধারা মূলতঃ পৃষ্ঠ-পোষকের রুচির ওপর নির্ভর করেই বাংল্যকাব্যের ক্ষেত্রে আত্মবিস্তার করেছে। অবশ্য জনরুচিও যে কবিদের উদ্দীপ্ত করেছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ ভারত পাঁচালী নামের সঙ্গে জনরুচির দিকটি জড়িয়ে আছে।

মহাভারত অনুবাদের সাধনায় যে কবি সিদ্ধি অধিগত করেছিলেন তিনি কবীশদলে পুণ্যবান কাশীরাম দাস। কবির কাব্য বাঙালীর অন্তরের সামগ্রী, কবি যেন তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কবিদের যশকে ম্লান করে দিয়েছেন। তাঁর মহাভারত পাঁচালী কাব্যে বাঙালী চরিত্রের, বাঙালী সংস্কৃতির এবং বাংলাদেশের ভক্তিরসধারার সুনিপুণ উপস্থাপনা ঘটায় কাব্যখানি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

অবশ্য প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করায় কাব্যখানি বর্তমান কালে রাজরাজেন্দ্রের আসনে সহজেই অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়েছে যে কাশীরাম সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করতে পারেন নিঃ

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীরাম গেলা স্বর্গপুর॥

অর্থাৎ কাশীরাম বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করেছিলেন বলেই মনে হয়। বাকী কাব্যের খানিকটা কবির ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম রচনা করেন:

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত।
প্রশংসিয় আমারে করিল আশীর্বাদ॥
আয়ু ত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোকে।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম আদরে॥

নন্দরামও ভারত পাঁচালী সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এই কাব্যের শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব দুটি অন্ততঃ কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা বলেই ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত। অবশ্য এই খুঁটিনাটি বিচারের অধিকার আমরা দাবি করি না, মহাভারত কাব্যখানি বাংলা কাব্যপ্রবাহকে কিভাবে পরিপুষ্ট করেছে সেই দিকটাতেই আমাদের লক্ষ্য।

কাশীরামদাসের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অত্যন্ত সংক্ষেপে দিয়েছেন:

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥

তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানু গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হন কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥

কথিত আছে, কাশীরাম দাস মেদিনীপুরের এক রাজার আশ্রয়ে থেকে শিক্ষকতা করতেন, সেখানে পুরাণ পাঠকারী পণ্ডিতদের এবং কথকদের মুখে মহাভারতের কথা শুনে এই কাব্য অনুবাদে উৎসাহী হন। তিনি নিজে সংস্কৃত বেশ ভালভাবেই জানতেন। তৎকালীন কাব্যধারার সঙ্গেও কবির যে গভীর পরিচয় ছিল, এ কথাও অনুমান করা যায়। সর্বোপরি কবি দেশকালের প্রবাহটি আপন অন্তরে স্পষ্ট স্বচ্ছভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি কবি কৃত্তিবাসের মতই আক্ষরিক অনুবাদের পথ পরিহার করে তাঁর রচনাকে যথাসাধ্য রসের সামগ্রী করে তুলেছেন। রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্বাধীন কল্পনাবৃত্তিকেও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারেও কবি নিজেকে ব্যাসকৃত মহাভারতের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি, বিভিন্ন পুরাণের কাহিনী থেকে, সংস্কৃত কবিদের বিভিন্ন রচনা থেকে, বাঙালী কবির রচনা থেকে তিনি নির্বিচারে উপাদান আহরণ করেছেন। এই আহৃত উপাদানরাশি তাঁর কল্পনার সুষম প্রাণময়তার সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ পুষ্পমাল্যে পরিণত হয়েছে। এইজন্যই সামগ্রিকভাবে তাঁর কাব্য অন্যান্য কবিদের রচনার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

কাশীরাম বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। এজন্য বৈষ্ণবতার ছাপ তাঁর কাব্যে প্রগাঢ়। কবির কাব্যে বৈষ্ণব বিনয়ের সুন্দর সার্থক অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর কাব্যের এই বৈষ্ণবভাবাদর্শকে কেন্দ্র করেই কাব্যখানিতে বাঙালিয়ানার সুবিস্তৃত প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে এই দিকটির জন্য তাঁর কাব্য বাঙালীর মহাভারত অনুবাদের সকল প্রয়াসের নির্যাস-সাফল্য।

কাব্যের আঙ্গিকগত দিকেও কাশীরামের দান সামান্য নয়। তাঁর পয়ার ত্রিপদীর সহজ সাবলীল গতিভঙ্গি, তাঁর শব্দনির্বাচনের

দক্ষতা এবং অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য কাব্যপ্রসাধনকলার সুন্দর দৃষ্টান্ত ঃ

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগবাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ গতিমন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগাবর জানু সুবলিত ॥
মুক্ত পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি ইহা ধৈর্য হিয়া নহেক কামিনী ॥

পাঞ্চালীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত ছদ্মবেশী অর্জুনকে লক্ষ্য করে কবি যে রূপসৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা বাঙালীর রূপ-তৃষ্ণার সুন্দর প্রতিফলন। উদ্ধৃত অংশটিতে অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ, উপমার সহজ রূপ, ছন্দের মন্দমন্থর প্রবাহ পাঠকের নয়নমন শ্রবণকে আকৃষ্ট করে, পাঠক আগামী দিনে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বাভাসও হৃদয়ঙ্গম করেন।

কল্পনার নিবিড়তায়, রচনাশৈলীর শ্রীমণ্ডনে, আন্তরিকতার প্রাবল্যে কাশীরাম দাস বাংলা কাব্যসংসারের বিশিষ্ট সাধক! এইজন্যই কবি শ্রীমধুসূদন যেন সমস্ত বাঙালীর হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঃ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

(গ) ভাগবত—চৈতন্য সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে সাধারণ বৈষ্ণব পাঠকের ভক্তিরস নিবৃত্ত করার জন্যই বোধ হয় বহু কবি

ভাগবত রচনায় ব্রতী হন। অবশ্য এই রচনাস্রোতে প্রত্যক্ষতঃ চৈতন্য-জীবনের বর্ণ মিশ্রিত হওয়ায় ভাগবত যেন নবকলেবর কাব্যরূপ লাভ করলো। এইজন্য চৈতন্য-সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের ভাগবত রচনায় বাঙালী কবি পৌরাণিক আখ্যান অপেক্ষা লৌকিক কাহিনীর ওপর বেশী নির্ভর করেছেন। উক্ত সময় সীমায় অনূদিত ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী থেকে আরম্ভ করে তাঁর ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। আবার এই লীলাত্রয়ের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকালীলা প্রায় সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে এবং ব্রজলীলার মধ্যে মধুররসাশ্রয়ী আখ্যান বিস্তৃত আকারে রূপায়িত হয়েছে। ব্রজলীলার মধুর রসাশ্রয়ী উপাদানের সূত্রেই দানলীলা নৌকালীলা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাঙালীর জীবন-চেতনার মর্মবাণীটি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বাঙালী কবি ভাগবতের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপকে রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কয়েকজন কবি ভাগবত রচনায় ব্রতী হন। আমরা কালানুক্রমিকভাবে প্রধান প্রধান কবিদের তালিকা দিলাম :—

ষোড়শ শতক : যশোরাজ খানের কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য। এই কাব্যের পুঁথি পাওয়া যায় নি, সপ্তদশ শতকের শেষভাগের কবি পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে যশোরাজ খানের কাব্যের সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে।

গোবিন্দ আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। কবি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর ছিলেন। কবি তাঁর কাব্যের ভণিতায় বার বার শ্রীচৈতন্য-দেবকে প্রণতি জানিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য একজন ভক্ত পরমানন্দ গুপ্ত 'কৃষ্ণস্তবাবলী' নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। চৈতন্যজীবনীকার জয়ানন্দের কাব্যে পরমানন্দদাসের একখানি গৌরাঙ্গ বিষয়ক কাব্যের উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' কাব্য। বরাহনগরে কবির বাসস্থান ছিল। গৌড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন-কালে শ্রীচৈতন্যদেব কবির গৃহে বিশ্রাম লাভ করেন এবং কবির ভাগবত শ্রবণ করেন :

প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥

রঘুনাথও বোধহয় শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ মত ভাগবতের অনুবাদে প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদে কবি সযত্ন হন, 'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।' কবির কাব্যের প্রথম নয়টি স্কন্ধ সংক্ষেপে ভাগবতের সারানুবাদ, শেষ তিনটি স্কন্ধ প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কাব্যখানি পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল, কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কাব্যখানির উল্লেখ আছে। কাব্যখানি রচনাভঙ্গিগত দিক থেকে গাম্ভীর্যপূর্ণ, কিন্তু মাঝে মাঝে কবির ললিত রচনাভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবির পুতনা বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

কেশপাশ বিনিহিত ফুল্লমল্লী মালা।
পৃথুশ্রোণী কুচভর গমন মন্থরা॥
ক্ষীণ কটিতট পট্টবাস পরিধানা।
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড মুদিত রচনা॥
ভুরুভঙ্গ বিলসিত মুণি মনোহরা।
বিলোল অলকাবলী কুঞ্চিত কুন্তলা॥
অলস বিলস গতি কমল দুলায়।
চকিত চপল দিঠি নন্দ ঘরে যায়॥

চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায়ও কবি সচেতন ছিলেন : 'গৌরচন্দ্র অবতার নিত্যরস সঙ্গে'। এ দিক দিয়ে কবির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

দ্বিজমাধব আচার্যের 'কৃষ্ণ মঙ্গল' কাব্য। চৈতন্য-সমসাময়িক কালে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবির কাব্যের ভণিতা থেকে জানা যায় যে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ করেছিলেন—'চৈতন্য চরণধূলি শিবে বিভূষণ করি দ্বিজমাধব রসভাষে।' কবি তাঁর কাব্যের উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যে অন্যান্য পুরাণেরও ছায়া পড়েছে। কবির সহজ কবিত্ব আহৃত উপাদান থেকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি করেছে। দ্বিজমাধব আচার্য লোকসমাজের উপযোগী ভক্তি-ধর্মকেও তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন।

পদাবলীকার কবিশেখর রায় 'গোপালবিজয়' কাব্য রচনা করেন। কবির প্রতিভা পদাবলীর ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত। কবি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃতে 'গোপালচরিত' মহাকাব্য, 'গোপীনাথবিজয়' নাটক রচনা করেন। কবির গোপালবিজয় কাব্য পয়ার ও ত্রিপদীর সহজ সরল ভঙ্গিতে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগে কাব্য শেষ হয়েছে। এই কাব্যের কাহিনী নির্বাচিত হয়েছে ভাগবত-বর্ণিত ব্রজলীলা এবং দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি দেশীয় উপাদান থেকে। এদিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতই এ কাব্যেও শ্রীরাধা দর্শনে প্রথমে কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রসঙ্গ আছে। কাব্যখানি সহজ সরল কবিত্বের সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই কবিত্বগুণেই কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাগবত রচয়িতা।

দুঃখী শ্যামাদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি বর্ণনামূলক এবং ভাগবত ও লৌকিক কৃষ্ণকথার মিশ্রণে রচিত। কবির আন্তরিকতা ও গভীর সহানুভূতির স্পর্শে কাব্যের কোন কোন অংশ সুন্দর কবিত্বময় হয়ে উঠেছে :

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন নহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু॥

চিত্ত নিবারিব কত বিরহব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥

... ...

আষাঢ়ে আঙ্গিনা রসে আশিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে থাকি শ্যামবিনোদিয়া ॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ ॥

[রাধার বারমাস্যা]

ষোড়শ শতকে কবি কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। পৌরাণিক এবং অপৌরাণিক উপাদানে কাব্যখানি রচিত, তবে কাব্যখানিতে ভাগবতের সংক্ষিপ্ত রূপই প্রকটিত। সপ্তদশ শতকে 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', ভবানন্দ 'হরিবংশ', বিপ্রপরশুরাম কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য এবং অন্যান্য কবিও কৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এই সব রচনার মূল উৎস ভাগবত। অষ্টাদশ শতকেও বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিজরমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত প্রভৃতি রচিত হয়। শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি জনপ্রিয় কাব্য পাঁচালী আকারে রচনা করেন।

ভাগবতের অনুবাদ-প্রবাহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙালী কবির চেতনালোকে কৃষ্ণের প্রেমিকরূপই বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এইজন্যই ভাগবতের বৃন্দাবনলীলা লৌকিক কৃষ্ণকথার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকাংশ বাংলা ভাগবতের রূপ সৃষ্টি করেছে।

নাথসাহিত্য

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা কাব্যে অন্যান্য যে রূপবিকাশ ঘটেছে তাদের মধ্যে নাথসাহিত্য অন্যতম। এই সাহিত্যশাখাও ধর্ম-কেন্দ্রিক। বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিবউপাসক এক যোগী-সম্প্রদায় ছিল, এই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ধর্মের নাম নাথধর্ম। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য নাথধর্মকে প্রতিহত করেছিল এবং এই ধরনের এক জটিল পরিবেশে বাংলায় প্রায় অবলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাথধর্মের কিছু কিছু সংমিশ্রণ ঘটে। নাথধর্ম সেই সংমিশ্রণের ফল। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের যোগমাহাত্ম্য নাথসাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই সাহিত্যধারা সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের অবকাশ পায়নি, একান্তভাবে একটি গণ্ডীবদ্ধ-সমাজে এই সাহিত্যস্রোত সীমিত ছিল। এই সাহিত্যের দুটি ভাগ রয়েছে—১। শিষ্য গোরক্ষনাথ কেমন করে সংসারজালে আবদ্ধ গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেছে,—গোরক্ষবিজয় কাব্য। ২। রাণী ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনী,—গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান।

এই কাহিনীদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনত্বের বহু ছাপ আছে, কিন্তু এদের যেভাবে কাব্যাকারে পাওয়া যায় তাতে ভাষাগত দিক থেকে প্রাচীনত্ব কিছুই নেই। দীর্ঘকাল লোকের মুখে মুখে নাথসাহিত্যের গানগুলি প্রচারিত হওয়ার পর সেগুলি অর্বাচীন কালেই পুঁথিতে আবদ্ধ হয়েছে। এজন্য এই সাহিত্য রূপগত দিক থেকে মোটেই প্রাচীন নয়। আবার কালপ্রবাহে আসল গল্পের সঙ্গে নতুন নতুন গল্প মিশে গোরক্ষবিজয় এবং গোপীচন্দ্রের গানের আদিম বিশুদ্ধ রূপটি হারিয়ে গেছে।

গোরক্ষবিজয় এবং গোপীচন্দ্রের গান একসময় বাংলাদেশের

নানা স্থানে গাওয়া হত। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের করুণ কাহিনী লোকের মনে নিবিড় দুঃখের সৃষ্টি করতো; সহজ সরল গ্রাম্য কবিমনের নিরলঙ্কৃত প্রকাশ এই সব অংশে দেখতে পাওয়া যায়:

রাজা গোপীচন্দ্র মাতা ময়নামতার আদেশে সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যোগী হলে রাজার দুই পত্নী, অদুনা পদুনা বলেন:

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর—
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতলমন্দির ঘর?
নিদের স্বপনে রাজা হবে দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত,—নাই প্রাণের ধন॥
দশ গৃহস্থের মা বইন রবে স্বামী লৈয়া কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।

কিন্তু গোপীচন্দ্র কোন কথায় কর্ণপাত না করে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করায় রাণীদের বিরহের জ্বালাময় নিশ্বাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আপন হৃদয় মন্থিত করে রাণীরা বলেন:

কতকাল রাখব যৌবন আঞ্চলে বাঁন্ধিয়া।
বাহির হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া॥
নেতে বান্ধিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কারো নয়॥
নেতে বান্ধিলে যৌবন চটকিয়া উঠে।
স্বামীকে পাইলে যৌবন কভু নাহি টুটে।

গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে যোগীদের যোগসাধনার নানা অতি-প্রাকৃত কাহিনী আছে সত্য কিন্তু মানবীয় রসের সন্ধানও এ কাহিনীতে দুর্লভ নয়। এদিক দিয়ে গোরক্ষবিজয় একেবারেই যোগাচারের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য লেখা। গুরু মীননাথের পদস্খলনকে কেন্দ্র করে যেটুকু মানবিক পরিবেশের সম্ভাবনা ছিল তাও বিকৃতিতে পূর্ণ হয়েছে। নাথযোগীদের জীবনটাই অস্বাভাবিক, এজন্য এখানে জীবনের স্পষ্ট স্বচ্ছ রূপ প্রস্ফুটিত হতে পারেনি। আসলে সামগ্রিকভাবে

নাথসাহিত্য আপন সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভেদ করে বৃহত্তর শ্রোতা-পাঠক-সমাজের আশ্রয়ভূমি লাভ করতে না পারায় বাংলা কাব্যধারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেনি। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের করুণ কাহিনী বাঙালী শ্রোতার মনকে দ্রবীভূত করেছিল, এ কাহিনীর করুণ সংবেদনা অন্যান্য প্রদেশের শ্রোতার মনেও ছায়াপাত কবেছিল, সামগ্রিকভাবে নাথসাহিত্য এইটুকুই দাবি করতে পারে।

গোবক্ষবিজয় এবং ময়নামতীব বা গোপীচন্দ্রের গানের বচযিতা একাধিক কবিব সন্ধান পাওয়া যায। গোবক্ষবিজয় কাব্যের প্রাচীনতম কবিদেব একজন হলেন ভীমসেন রায। শ্যামদাস সেন ও শেখ ফয়জুল্লা এ কাব্যের কবি। ময়নামতী গোপীচন্দ্রেব গানের কবি যথাক্রমে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুব মামুদ প্রভৃতি।

লোকসাহিত্য

আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশেই শিষ্ট সাহিত্যের সমান্তরাল রেখায় লোকসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে। লোকসাহিত্য যেন প্রকৃতির আপন পরিবেশের অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্যরাশি। বাংলার লোকসাহিত্য বাংলাদেশের অন্তরে বিরাজিত ভাবসম্পদের অজস্রতাকেই যেন বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত করে তুলেছে। এই লোকসাহিত্যে স্পষ্টতঃই চৈতন্যপ্রভাব বিমুক্তির সন্ধান বর্তমান। এখানে পরিশীলিত কোন চেতনামানস সংস্কারের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে অভিব্যক্তি লাভ করে নি, করেছে আপন প্রাণের সুষমিত আবেগের বর্ণানুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে। লোকসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন নরনারীর প্রণয়-প্রাবল্য। যৌবনের অরুণাভ বর্ণসম্পাতে জীবনের রক্ত শতদলের পাঁপড়িগুলি যখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তখনকার আতপ্ত জীবন-রস প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে অভিসিঞ্চিত হয়ে তাদের ভাববিহ্বল করে তোলে। কবি সেই ভাবের রূপসাগরে ডুব দিয়ে প্রেমের মুক্তা তুলে আনেন ; লোকসাহিত্যের হৃদয়ে সৌন্দর্য বিমণ্ডিত সেই মুক্তামালা শোভা পায়।

লোকসাহিত্যের ধারা সুপ্রাচীন, তুষারমৌলি হিমালয়ের বিরাট বক্ষে চির বিরাজমান প্রাণোচ্ছল ঝর্ণাধারার মত লোকসাহিত্য সমাজ মানসে স্বতঃ সক্রিয়। লোকসাহিত্য বিশেষভাবে লোকমুখে প্রচারিত হয়, লিখিত আকারে সচরাচর লোক-সাহিত্য পাওয়া যায় না। তবে লোকসাহিত্যের স্বভাবধর্মকে পুরোপুরি বজায় রেখে যে সাহিত্য রচিত হবে তাকেও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করাই সঙ্গত। বিশেষ করে ধর্মকেন্দ্রিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন মধ্যযুগের সাহিত্যে এই ধরনের রচনা লোকজীবনকেই মুখ্য করে নিয়েছে। চট্টগ্রাম-রোসাঙ্গের রাজসভায় বিশেষভাবে মুসলমান

কবিগণ সপ্তদশ শতকে যে লোকসঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেগুলি লোকসাহিত্যের স্তবকিত রূপ। এই কাব্যপ্রবাহে দৌলতকাজির 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যখানির উৎস, হিন্দীতে রচিত সতীময়নামতীর কাহিনী। এই কাহিনীতে প্রেমের ত্রিভুজাকৃত রূপ দেখা যায়। সতীময়নামতীর স্বামী লোর অন্য এক বিবাহিতা নারী চন্দ্রানীর (চন্দ্রাণী) প্রতি প্রণয়াসক্ত হলে ময়নামতীর বিরহ বেদনা কাহিনীকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। লোকসমাজে ময়নামতীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত সহানুভূতির রসঘন মণ্ডল কবি সৃষ্টি করেছেন। দৌলতকাজি তাঁর সহজ স্বচ্ছ রচনারীতির সাহায্যে ময়নামতার সতীত্ব-সাধনামূলক বিরহ বেদনাকে মধুর রূপ দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম-রোসাঙ্গ রাজসভা কেন্দ্রিক কাব্যধারার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। তাঁর কাব্য পদ্মাবতী (পদুমাবৎ) মাগন ঠাকুরের আশ্রয়ে রচিত হয়। মাগন ঠাকুর ছিলেন রোসাঙ্গ রাজকন্যার শ্রেষ্ঠ অমাত্য; তিনি আলাওলের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেন। আলাওলের পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়, তাঁর সাহিত্য রূপগত দিক থেকে শিষ্ট সাহিত্যের সীমাবর্তী। আলাওল ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী কবি জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেন। আলাওল 'সৈফুল মুলুক' ফারসী তত্ত্বকাব্যকেও বাংলায় রূপান্তরিত করেন। হপ্ত পয়গম্বর এঁর অন্য এক রচনা।

চট্টগ্রাম-রোসাঙ্গ রাজসভার সূত্রেই আমরা আরও কয়েকজন মুসলমান কবির সন্ধান পাই—সুফি সাধক কবি সৈয়দ সুলতান, 'মুক্তাল হুসেন' কাব্যের কবি মহম্মদ খান প্রভৃতি।

এই কবিদের কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যধারা অন্যতর-ভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। বাংলাদেশের কাহিনী-ধারায় ইসলামী কাহিনীর সংস্পর্শ ঘটেছে, চেতনাজগতেও সুফিসাধনার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, আরবি ফার্সি প্রেম কাহিনী প্রত্যক্ষতঃ প্রেমের চেতনাকে উন্মীলিত করে দিয়েছে। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব কম নয়। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-প্রেম

কাহিনী পরোক্ষতঃ এই সাহিত্যধারা থেকে প্রাণরস আহরণ করেছে। বাউল গান এই সাহিত্য সাধনার নিশ্বাস বায়ুতে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। অন্য দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে এই সাহিত্য-সাধনা বাংলা-দেশের গ্রহণক্ষমতার, আত্মীয় করে নেওয়ার বৃত্তিটির সার্থক পরিচায়ক।

লোকসাহিত্যের অন্য একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির পরিচায়ক মৈমনসিংহ গীতিকা। এই গীতিকা মর্তপৃথিবীর নরনারীর বিরহ মিলনের আনন্দ বেদনায় বিকশিত। এই গীতিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলার পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা।' এই গীতিকাগুলিতে পূর্বরাগের কাহিনীই বেশী, সেকালের নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহে যৌবনের কুঞ্জবন কেমন করে মুকুলিত হয়ে উঠতো, এক একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে তার রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনীগুলিতে ইতিহাসের কাঠামো থাকায় প্রায় প্রত্যেকটি গীতিকা সত্যের সুদৃঢ় বন্ধনে জীবনকে রূপায়িত করেছে। সত্যকেন্দ্রিক বলেই গীতিকাগুলিতে বাস্তব প্রেমের স্বরূপ, বাস্তব প্রেমের নিবিড়তা ও তীব্রতা সহজ সরল অথচ রসঘন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই গীতিকাগুলি কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত নয়, এগুলির নায়ক নায়িকা অতি সাধারণ স্তর থেকে এসেছে। এইজন্য প্রেমের সহজ সরল রূপ কাব্যের মধ্যে অনলঙ্কৃত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গীতিকাগুলির ভাবাভিব্যক্তি সেইজন্যই নিটোল মুক্তা বিন্দুর মত। মলুয়া শীর্ষক গীতিকায় নায়িকার পূর্বরাগের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা যেন হৃদয়ের ভাব-প্রবাহে পরিধৌত:

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥

বয়ঃসন্ধির নায়িকার এই রূপ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও

দুর্লভ। অথচ এই বর্ণনায় অলঙ্কার উপমার বর্ণচ্ছটা নেই। প্রেমানুভূতির দিক থেকে এই গীতিকাগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর সমস্থানীয়। পল্লীগাথা রচয়িতাদের প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির ভাব-গভীরতা অকুণ্ঠভাবে গীতিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। নায়িকা সোনাই-এর সঙ্গে নায়ক মাধবের পূর্বরাগ সঞ্চাবিত হওয়ার পর নায়িকা মুহূর্তের জন্যও প্রিয়বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না ঃ

ধরতাম যদি পারতাম ভমবারে রাইতের নিশাকালে
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোঁপার ফুলে ॥

....

পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুবে খোঁপায় রাখতাম তোরে ॥
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুবে নয়ান ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী হইয়া ॥ ইত্যাদি
['দেওয়ান ভাবনা']

অনুরাগের তীব্রতা ও গভীরতা কোন্ স্তরে গিয়ে পৌছোয় তার সার্থক দৃষ্টান্ত ঃ

বঁধু যদি হৈতা আমার কনক চম্পা ফুল।
সোনায় বাঁধিয়া তাবে কানে করতাম তুল ॥
বঁধু যদি হৈতা আমার পরাণের নীলাম্বরী।
সর্বাঙ্গ ঘুরিয়া পরিতাম নাহি দিতাম ছাড়ি ॥
বঁধু যদি হৈতা আমার মাথার দীঘল চুল।
ভাল কইরা বাধতাম খোঁপা দিয়া চাঁপা ফুল ॥

প্রেমের চন্দ্রকলা কেমন করে ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধ হয়, তার প্রত্যেকটি স্তরই এই কবিদের চেতনার স্ফটিক স্বচ্ছ দীঘিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং এই প্রতিবিম্ব স্বপ্নময় মধুর চিত্র-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে ঃ

নায়কের পূর্বরাগ ঃ

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুকায় ॥
এইত কেশ কন্যার লাখটাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল ॥
ডাগল দীঘল আঁখি যার পানে সে চায়।
একবার দেখিলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করিল মন ॥

নায়িকার রূপ ঃ

হাট্টিয়া না যাইতে কন্যাব পায়ে পড়ে চুল।
মুখে ফুট্যা উঠে কন্যার কনক চম্পার ফুল ॥
আগল ডোগল আখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখিলে কইন্যা না যায় পাশুরা ॥

[মহুয়া]

অথবা ঃ

নবীন বয়স কন্যা পরথম যৌবন।
রূপেতে রোশনাই করে চান্দমা যেমন ॥
কাল চিকন কেশে বাধিয়াছে খোঁপা।
মালতীর মালা দিয়া বেড়িয়াছে সোপা ॥
আশ্বিন মাসেতে যেন পদ্মের কলি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি ॥
... ...
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসি খুসি।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি ॥

[কমলা]

হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারের রূপ ঃ

যে দিন হইতে দেখছি বন্ধু
তোমায় মৈশালের বাড়ী

সেই দিন হইতে বন্ধু
আরে বন্ধু পাগল হইয়া ফিরি ।।

... .

বুক ফাটিয়া যায় রে বন্ধু
আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি ।
অন্তরের আগুনে বন্ধু
আমি জ্বলিয়া পুড়ি ।। ইত্যাদি

বিরহের পরে মিলনের অভিব্যক্তি

মেওয়া মিশ্রী সকল মিঠা
মিঠা গঙ্গাজল
তার থাক্যা অধিক মিঠা
শীতল ডাবের জল
তার থাক্যা মিঠা দেখ
দুখের পরে সুখ
তার থাক্যা মিঠা যখন
ভরে খালি বুক ।
তার থাক্যা মিঠা যদি
পায় হারান ধন
তার থাক্যা অধিক মিঠা
বিরহে মিলন ।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় নায়িকাদের প্রেমজীবনের বিরহিত নিশ্বাস অধিকতর ছড়িয়ে আছে এবং বিরহের অশ্রুসিক্ত ম্লানমধুর রূপ মানুষের মনকে মন্থিত করে গীতিসুধারসের অমৃত প্রবাহকে উৎসারিত করে দিয়েছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় প্রচলিত সমাজসংস্কার কবিদের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি, কবিরা নরনারীর প্রেমকে নিঃসংশয়ে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এইজন্যই গাথা সমূহে জাতি বিচার, কুলশীল পদমর্যাদা—সমস্ত কিছুই প্রেমের দুর্বার বন্যা স্রোতে ভেসে

গেছে। এইজন্যই বেদের মেয়ে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের প্রতি অনুরক্তা হয়েছে এবং উভয়ের প্রেমের প্রবাহ উদ্দাম উধাও হয়ে মহাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আঁধাবঁধুতে রাজকুমারী সাধারণ একজন বংশীবাদকের প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়েছে এবং সেই প্রণয় বাস্তবের সীমাকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে উপনীত হয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাকেই অবলম্বন করে বাঙালীর প্রাণের সহানুভূতি স্পর্শে অন্তরের একান্ত সামগ্রী হয়ে উঠেছে। যে বাঙালীর 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', যে বাঙালী 'পিরীতি নগরে বসতি' করতে চায়, মৈমনসিংহ সেই বাঙালীর সরস প্রাণ সুধায় পরিপুষ্ট 'গহীন গাঙ'।

লোকসাহিত্যের সূত্রেই বাউল গানের কথা আসে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের এই বাংলা দেশে এক শ্রেণীর অধ্যাত্ম সঙ্গীতের ধারা চলে আসছে। একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বাউল নামে পরিচিত। এই ধর্মসম্প্রদায় অন্তঃসলিলা নদীর মত সুদীর্ঘ কাল থেকে বাংলার মানসচেতনাকে সরস করেছে। বাউল কোন সংস্কারাবদ্ধ রীতিনীতিকে আমল দেন না; সহজ ও সংস্কারমুক্তভাবে জীবন যাপন ও ধর্মাচরণই বাউলের উদ্দেশ্য। কোন বন্ধনকে এঁরা স্বীকার করেন না,

তাই তো বাউল হইনু ভাই
এখন লোকের বেদের ভক্তি ভেদের
আর তো দাবি দাওয়া নাই।

বাউলের মতে প্রতিমাপূজা, ব্রত উপবাসাদি, তীর্থ ভ্রমণাদির কোন সার্থকতা নেই, তাঁরা মনে করেন মানুষের দেহেই পরমদেবতা, 'মনের মানুষ' অধিষ্ঠিত,

কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

অথবা, যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস
এই দেহে সে রয়॥

আছে আদ মক্কা এই মানব দেহে
দেখ নারে মন চেয়ে
দেশ দেশান্তরে দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥

[লালন ফকির]

বাউল, দেহে অধিষ্ঠিত 'মনের মানুষের' সন্ধানেই, সেই মনের মানুষের প্রেম লাভেই আত্মসমর্পণ করেন.

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥
লাগি সেই হৃদয় শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হ'ত খুশী
দিবানিশি দেখতাম নয়ন ভরে ॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে ?
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে দেখ্‌না তোরা হৃদয় চিরে ।

বাউলের গানই তাঁর শাস্ত্র, জীর্ণ পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ কোন শাস্ত্র তাঁর নেই। 'মনের মানুষের' জন্য বিচিত্র অনুভূতিতে তাঁদের মন যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন তার উচ্ছ্বলিত রূপ থেকেই ভাবগভীর অর্থব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ গানগুলির সৃষ্টি হয়। বাঙালীর সহজ সরল জীবন-বিশ্বাসের প্রদীপ শিখার মত গানগুলি স্থির অকম্পিত আলোয় আলোকময়। বাঙালীর সাহিত্য সাধনার এ এক অন্যতর দিগন্ত। বাউলের গানগুলির সাহায্যেই যেন বাঙালী 'মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে' যত দ্বার ছিল সবগুলিরই আগল খুলে দিয়েছে।

মণিকার ভারতচন্দ্র

আধুনিকপূর্ব বাংলাকাব্যধারার পরিক্রমার শেষে আমরা উপস্থিত হই আশ্চর্য এক মণিময় প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে এই প্রাসাদের স্রষ্টা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর অন্নদামঙ্গল সচেতন শিল্প প্রয়াসের সার্থক দৃষ্টান্ত, এ কাব্য 'রাজকণ্ঠের মণিহার'। রূপ ও রীতিগত দিক থেকে এ কাব্য মঙ্গলকাব্য শাখার অন্তর্গত, কিন্তু ভাব ও রসগত দিক থেকে এ কাব্যের মূল্য স্বতন্ত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্যের এবং কবিপ্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই কবির যুগ-পরিবেশটি জানা দরকার।

ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবকালে নবাবী আমলের সূর্যাস্তের সোনা ঘনায়মান অন্ধকার যন্ত্রণার অঞ্চলের অন্তরালে অপসৃত হচ্ছিল। নবাবের চারপাশে স্বার্থান্বেষী একটি দল চক্রচক্রান্তে রত ছিল, কবি তাঁর পারিবারিক জীবনেই তার তিক্ত তীব্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বার্থপরতার কুটিল প্রবাহে রাজপুত্র ভারতচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর রাজসভার সভাকবি হয়েছেন। ভারতচন্দ্র শিক্ষায়-দীক্ষায়, রুচি-রীতিতে উন্নত ছিলেন, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণরস গ্রহণ করেছিলেন, ফারসি সাহিত্য তার অধিগত ছিল। জ্ঞানের বিপুল সম্পদ দিয়ে ভারতচন্দ্র যুগ-মানসের হৃদয় স্পন্দন আহরণ করেছেন। তাঁর কাব্যের পরিচয় দানপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'ইতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা।' এ ইতিহাস সুখের নয়। পলাশী যুদ্ধের ঠিক আগে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য লিখিত হয়। তখন বাংলাদেশ এক জটিল যুগসন্ধিক্ষণে দিকভ্রান্তের মত বিমূঢ় ছিল। দেশের একদিকে তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে সেই সুযোগে বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ডে পরিণত হতে চলেছিল। এ অবস্থায় মধ্যপন্থাবলম্বী কৃষ্ণ

নগর রাজপ্রাসাদে ক্ষণিক উৎসবের রঙিন নেশা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য সরস্বতীর বরপুত্র ভারতচন্দ্র নটবিটের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে এই জন্য যুগের অবক্ষয়ের চিহ্ন প্রকটিত। এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রমথ চৌধুরী তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত ; কেননা Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাস-ভবনের পাঞ্চালিকা, সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত, তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরীর কাছে।' এই উক্তিটি ভারতচন্দ্রের কাব্য পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর কাব্য-আলোচনার কালে এই মন্তব্যের তাৎপর্য প্রমাণিত হবে।

ভারতচন্দ্রের কাব্য অন্নদামঙ্গল বা কালিকামঙ্গল একটি কাব্য-শাখার ঐতিহ্য সূত্রেই সৃষ্ট। এই কাব্যের কাহিনী ও রূপ ভারত-চন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি নয়। এই কাব্যশাখা আপাতদৃষ্টিতে মঙ্গল-কাব্য প্রবাহের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে, কিন্তু বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কাহিনীকে রূপায়িত করা। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি প্রাচীন, এই কাহিনীতে কলাবিৎ রাজকন্যার সঙ্গে তার শিক্ষাগুরু কবিপ্রণয়ী সুন্দরের গোপন মিলনের বর্ণনা আছে। বররুচির সংস্কৃত কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরম্' এবং কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলায় কবিকঙ্কণ চৈতন্য-সমসাময়িক যুগে তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতকে কবি শ্রীধর বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের কবি সাবিরিদ খাঁ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। এ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ধর্মসম্পর্ক-বিবর্জিত ভাবেই কাব্যরূপ লাভ

করেছে। সম্ভবতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাস বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যকথায় কালিকা দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন সংযুক্ত করেন। কৃষ্ণরাম দাসের নিবাস কলকাতার সন্নিকটে 'নিমিতা' গ্রামে; ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তিনি কাব্যরচনা করেন। তাঁর পরে কবি গোবিন্দদাস, বলরাম কবিশেখর কালিকামঙ্গল কাব্যরচনা করেন। কবি রামপ্রসাদ সেনও কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল কবির রচনাকে ম্লান করে দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের আলোচনার সাহায্যেই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ধারার এবং রূপগত দিক থেকে মঙ্গলকাব্যশাখার শেষ কবির কাব্যের মূল্যায়ন হবে।

কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্য মঙ্গলকাব্যধারার পরিণত ও পরিপূর্ণ রূপ। এই কাব্যের দেবী অন্নদা। কিন্তু এই কাব্যের দেবী আদি ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেবতার মত একান্ত হয়ে ওঠেন নি। যুগমানসের পরিবর্তনের জন্যই এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আদি ও মধ্যস্তরের মঙ্গলকাব্য একান্তই দেব-নির্ভর, এখানে দেবতার কাছে মানবশক্তি খর্ব হয়েছে, মানুষ তার দীনতা দুর্বলতা নিয়ে দেবতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে।

এই পরিবেশে কাব্যের মধ্যে দেবতা একটি সন্দেহাতীত বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করেছেন, দেবতার প্রতিষ্ঠায় একটি অন্ধ আবেগময় বিশ্বাস সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র আবেগ চালিত ভক্তির পথ পরিহার করে তাঁর কাব্যে ভক্তপন্থী অদ্বয় বোধ প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর কাব্যের ধর্মরূপটিকে অভিনব করে তুলেছেন। এইজন্য বেদব্যাস হরিভক্তির প্রাবল্যে শিব নিন্দা করার ফলে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ইষ্টদেবতা তাকে বলেছেন—'যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।' অর্থাৎ ঈশ্বর রূপের সাহায্যে পরম অদ্বয়-তত্ত্বের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠায় স্বভাবতঃই ভারতচন্দ্র অকুণ্ঠ :

হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥

দুই জনে সহাস্য বচনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হইলা দুই অর্ধ অঙ্গে॥

ধর্ম সম্বন্ধে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য উদার মানসিকতার জন্যই ভারতচন্দ্র দেবতা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত সংস্কার রাখেন নি। দেবতাকে কেন্দ্র করে রঙ্গরসিকতাতেও কবি সহজেই রত হতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে গঠিত। এজন্য এই কাব্যে বন্দনাংশ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড প্রভৃতি পর্বগুলি আছে। শিবের চরিত্র, হীরামালিনীর চরিত্র প্রভৃতি গতানুগতিক পথেই এসেছে। কিন্তু কবি তাঁর রসিক মনের সাহায্যে কাব্যের সবত্র আপন প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর কাব্যকে সুন্দর করে তোলার জন্য তিনি নির্বিচারে 'যাবনী মিশাল' ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন; ছন্দের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা স্বরূপ লিখেছেন —'যে হৌক সে হৌক বাক্য কাব্য নয়ে রস।' ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে প্রসাদগুণ সমন্বিত করার জন্য, রসাল করার জন্য সবতোভাবে এবং সচেতনভাবে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। ফলে তার কাব্য 'রাজকণ্ঠের মণিহার'-এ পরিণত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীতে রতিবিলাসের বিকৃত কলাবৈচিত্র্য আপাত সুন্দরভাবে পরিসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে সন্দেহ নেই. এই কাহিনীতে বিরংসাবৃত্তির অর্গল উন্মুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু কেবলমাত্র সেইগুলিই তাঁর কাব্যের শেষ কথা নয়। নানা কৌতুকপূর্ণ চিত্রের সমাবেশে. মানবচরিত্রের নানা হাস্যকর অসঙ্গতির উপস্থাপনায় ভারতচন্দ্রের কাব্য হাস্যরসের প্রবাহে পরিণত হয়েছে। বিকৃতির যে পরিচয় তাঁর কাব্যে আছে তা যুগরুচির তাগিদেই এসেছে, পরের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার এ যেন কলঙ্ক রেখা।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, কাহিনীর দিক থেকে ভারতচন্দ্র কোন মৌলিকতা দেখান নি, তাঁর কাব্যে চরিত্রসমূহও ঐতিহ্য

সূত্রে এসেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁর প্রতিভার সাহায্যে পুরনো উপাদানকে নতুন করে তুলেছেন। অবশ্য কোন কোন দিক থেকে তিনি মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যসাধনার সম্পদকে তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে—(১) দেবতা সম্বন্ধে তথাকথিত সংস্কার বর্জন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদিতা এবং উদারতা (২) চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মূলতঃ পরিহাস-রসিক দৃষ্টিভঙ্গি (৩) আঙ্গিক পারিপাট্য, ছন্দ অলঙ্কার এবং শব্দের বিস্ময়কর এবং বিচিত্র প্রয়োগ।

বলা বাহুল্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বভাবতঃই কবির সচেতন শিল্প-প্রয়াসের পরিচায়ক; কবির ধর্মগত উদারতার কথা আগেই বলা হয়েছে। কবির চরিত্রসৃষ্টির রীতি সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তার কাব্যের চরিত্রগুলি যেন মুখের কথার মানুষ, রক্তমাংসের কোন প্রাণময়তা সেখানে অনুপস্থিত, তাঁর চরিত্র টাইপ জাতের। ভারতচন্দ্র যে বুদ্ধিবাদী কবি ছিলেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই জন্যই কথায় বার্তায় চরিত্রগুলি হামেশাই শ্লেষ, যমক ইত্যাদির সহায়তা নিয়ে বক্তব্যকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলেছে। ঈশ্বর পাটনীর কাছে দেবী অন্নপূর্ণা যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা মোটেই সহজ সরল নয়, তা ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত:

অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

দেবীর এই আত্মপরিচয়কে সহজ সরলভাবে গ্রহণ করে ঈশ্বর পাটনী মন্তব্য করেছে 'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বর পাটনীই একমাত্র সহজ সরল চরিত্র, এজন্য সে দেবীর আসল পরিচয় জানামাত্র তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' নিরন্ন নিপীড়িত নিম্নবিত্ত বাঙালী এর চেয়ে ভালো কি প্রার্থনাই বা করতে পারে?

অবশ্য ঈশ্বর পাটনীর চরিত্র অন্নদামঙ্গলকাব্যে ব্যতিক্রম, কিন্তু তা হলেও এই চরিত্র কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক। ভারতচন্দ্র শিবকে নিয়ে, বেদব্যাসকে নিয়ে হাস্যপরিহাসের বন্যা স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। দক্ষরাজ জামাতা শিবের প্রসঙ্গে বলেছেন :

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

আমাদের প্রশ্ন কবি কি দক্ষরাজের উক্তির অন্তরালে তৎকালের বৃদ্ধ কুলীনপতিদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন? তা হলে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। হাসির আড়ালে তীক্ষ্ণ আঘাত হানা ভারতচন্দ্রের মত নিপুণ শিল্পীর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বর্ধমান রাজকন্যা বিদ্যাকে ব্যভিচারিণী করে নাকি কবি বর্ধমানরাজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, কেননা বর্ধমানরাজ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারের প্রতি অবিচার করেছিলেন। বেদব্যাসকে ভারতচন্দ্র চিত্রিত করেছেন গোঁড়া বৈষ্ণব হিসেবে; বেদব্যাস গোঁড়ামির জন্য নাকালের একশেষ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'হরিহর এক' এই অদ্বয় জ্ঞান লাভ করেছেন। ভারতচন্দ্রের শিব হাস্য-পরিহাসময় পার্বতীর সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি বিয়ে পাগলা বুড়োর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নারদ তাঁকে পার্বতীর সংবাদ দেওয়া মাত্র তিনি নারদকে বলেছেন :

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাপা।

বিবাহ বাসরে তিনি সমবেত নারীদের সামনে দিগম্বর হয়ে পড়েন, আবার পরক্ষণেই আপন ভুবনমোহন রূপ দেখিয়ে সকলকে বিমুগ্ধ করেন। তিনি ভিক্ষাজীবী অথচ অলস, পেটুক। পত্নীর নির্যাতনে তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভিক্ষায় যান :

বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥

হেঁটমুখে পঞ্চানন গৌরীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।

... .

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষার যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥

অন্যান্য দিন ভিক্ষায় বেরিয়ে শিব নানা রঙ্গরসিকতা করেন, সেজন্য তাঁকে আসতে দেখে সবাই উদ্‌গ্রীব, এবারে হাসির ঝড় বইবে :

দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ চিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হরষ গোঁসাই।
ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥

অন্নচিন্তা যে কতখানি মর্মান্তিক জ্বালার সৃষ্টি করতে পারে ভারতচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তীব্র ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্যদোষ যে গুণরাশি নাশের ব্রহ্মাস্ত্র ভারতচন্দ্রের শিবের মধ্য

দিয়ে সে কথা অতিশয় বাস্তবভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এ শিব যেন নিরন্ন বাঙালীর মূর্ত প্রতীক।

বিদ্যাসুন্দর অংশের চরিত্রগুলিও গঠন পারিপাট্যে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। সুন্দর এখানে রসিক নাগর, তার বৈদগ্ধ্য অতুলনীয়। রতিকলা বিলাসে সে পারঙ্গম। তার সঙ্গিনী বিদ্যাও রসবতী অথচ বিদূষী নারী। এই নায়ক নায়িকার মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়েছে হীরামালিনী, যে 'এবে বুড়া' কিন্তু রসের গুঁড়ার অধিকারিণী। বিদ্যার পিতামাতার চরিত্র, সমস্যা পীড়িত অভিভাবকত্বের সার্থক দৃষ্টান্ত। কবি যেন নিজের পরিবেশের নানা জটিল সমস্যাকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে তির্যকভাবে প্রতিফলিত করেছেন। বাস্তববোধের দ্বারা তিনি চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু অপরের মনোরঞ্জন তাঁর উদ্দেশ্য, তাই চরিত্রগুলি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমিত, সেখানে অনুভূতির গভীরতা স্বভাবতঃই অনুপস্থিত। ভারতচন্দ্র কলাকুশলী কবি, ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং অলংকার ইত্যাদির অজস্র প্রয়োগে তার কাব্য মণিখচিত সুবর্ণ-গঠিত রাজপ্রাসাদের বিলাস ভবনের পুত্তলিকার সমতুল্য হয়ে উঠেছে। বাংলার চির-প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ তাঁর হাতে নতুন রূপ লাভ করেছে, এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃত তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ। ছন্দের এমন সুনিপুণ, সযত্ন এবং সচেতন প্রয়োগ খুব কম বাঙালী কবিই করেছেন। কবির ছন্দ প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

তূণক ৹

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে।

ভুজঙ্গ প্রয়াত

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥

তামরস ঃ হর হর শঙ্কর সংহার পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥

পয়ার ঃ অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥

ধামালী ঃ আই আই এই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥

ত্রিপদী ঃ ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারিদিকে কর ব্রহ্ম তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর॥

চতুষ্পদী ঃ ভুজঙ্গ ভঙ্গিত ভুজঙ্গ রঞ্জিত কন্দর্প মর্দিত জটাধর
গণেশ শৈশব বিভূতি বৈভব ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥

দীর্ঘাক্ষরা বৃত্তি কান্দে নলকূবর দুখিতে।
চন্দ্রলী পদ্মিনী সংহতিতে॥

একাবলী অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন॥

ছন্দের এই পারিপাট্য সঙ্গীতের তাল লয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, সুতরাং সঙ্গীতের অস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি সূক্ষ্ম মাত্রাপরিমাপ এবং কাব্যের গুণ বর্ধিত করেছে।

বাংলা ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দগুলি বাংলাভাষার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এদের সাহায্যে অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু, ভাব, গুণ অথবা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম দ্যোতনা প্রকাশিত হয়; এগুলি কথার সাহায্যে চিত্র অংকন করে। ভারতচন্দ্র অনুকারাত্মক শব্দের সার্থক প্রয়োগ করে তাঁর কাব্যকে স্থানে স্থানে চিত্রময়, জীবন্ত করে তুলেছেন। নিচের উদাহরণটিতে ভোজনরত শিবের বর্ণনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পুরেন উদর সাধের মত॥

পায়স পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্বত কচমচিয়া ॥
চুক চুক চুক চূষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥

ধ্বনির মধ্য দিয়ে কবি আমাদের সামনে নটরাজ শিবের সজ্জা ও তাঁর ভৈরব মূর্তি প্রকটিত করে তুলেছেন :

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্বম্ ভভম্বম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট জটা জূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলছল টলটল কলকল তরঙ্গা ॥

শব্দ এবং ছন্দের ঝঙ্কার ছাড়া এই চিত্র নির্মাণ অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়।

অলংকার প্রয়োগে ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, রূপক উৎপ্রেক্ষা যমক উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতি তাঁর কাব্যে মণিমুক্তার মত বিন্যস্ত। সে সবের দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কবির বহু উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন ॥ যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥ অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ॥ মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে ॥ বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ॥ ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যের সুনিপুণ রূপদক্ষ মণিকার। তাঁর কাব্য তৎকালীন বাংলা দেশের লৌকিক জীবন ধারার নাগরিক রূপ। তিনি একান্তই বৈদগ্ধ কবি। তাঁর কাব্য বাংলা কাব্যধারার এক নতুন যুগসীমার আরম্ভ সূচনা করে। এ কাব্যে ভক্তিরসের প্রাবল্য নেই, আছে বাস্তবতার দীপ্তি। সর্বোপরি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ভাষার মণিদেউল।

শাক্তপদাবলী ও রামপ্রসাদ

অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য সাধনার নতুন এক রূপ শাক্ত পদাবলী। এই শাক্ত পদসাহিত্যের আদি কবি রামপ্রসাদ সেন। শাক্ত ধর্ম-চেতনাকে আপন অনুভূতির বীণা যন্ত্রে ঝংকৃত করে তিনি শাক্ত সাহিত্যের এক নতুন রূপ সৃষ্টি করলেন। শাক্তপদাবলীতে ভক্তির আবেগ প্রীতিতে পরিবর্তিত হয়ে কল্পনালোকের এবং কবিত্বের উৎসমুখ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। বাঙালী যে দেবতাকে, তা তিনি যত ভীষণা ভীমা ভয়ঙ্করী হোন না কেন, আত্মীয় না করে তৃপ্ত হয় না, বাঙালী যে বিশেষভাবে গীতি সুরে আপন অন্তরের ভাবানুভূতিকে প্রকাশিত করে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে শাক্তপদাবলী সেই কথাই প্রমাণ করে। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তিতে কালিকামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতাই তাকে বাংলা কাব্য প্রবাহে নবতর তরঙ্গ সৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছে এ অনুমান মিথ্যা নাও হতে পারে। শাক্ত পদাবলীতে শক্তির মহিমা কীর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি-পরিকল্পনায় এই শক্তি জগজ্জননীর রূপে বিধৃত। কবির অন্তর জননীর পদপ্রান্তে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ করে পরিতৃপ্ত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতীক আদ্যাশক্তি কালীমাতা শেষ পর্যন্ত কবি কল্পনায় কন্যারূপে পরিগৃহীতা। কবি সেই মহাশক্তিময়ীকে আপন গৃহসীমায় এনে তবে তৃপ্ত হয়েছেন। এইখানেই বাঙালীর ভাবচেতনার বিশিষ্টতা। অন্যদিকে শাক্তপদাবলী অদ্বয় বোধ যুক্ত ধর্ম ধারণার সার্থক দৃষ্টান্ত—'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।' ধর্মচেতনার এই অভেদ জ্ঞান বৈষ্ণবপদাবলীতে অনুপস্থিত। শাক্ত-পদাবলীর অপর বৈশিষ্ট্য, এই পদাবলী সাহিত্য গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলকে বেশী করে আশ্রয় করেছে, মর্ত্য জীবনের শোক তাপ দুঃখ বেদনা

শাক্ত কবির সংবেদনশীল মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এজন্য দেখা যায় যে, শাক্তপদাবলীতে একটি বেদনার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই বেদনার্তির মূলে আছে তৎকালীন সমাজ পরিবেশের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। যখন এই পদগুলি রচিত হয় তখন দেশের সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করছিল, দেশের শাসকদের উদ্ধত অবিচার, মারাঠা ঠগী দস্যুদের নির্মম নিপীড়ন, পর্তুগীজ হার্মাদ জলদস্যুর নিষ্ঠুর অত্যাচার জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় মায়ের প্রতি ভক্তির ঐকান্তিকতা শাক্তকবিকে দুঃখজয়ী করে তুলেছে :

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জনম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোনোখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই ॥

দুঃখ শাক্ত কবিকে দুঃসহ ভার দিয়েছে সত্য, কিন্তু কবি কিছুতেই দুঃখের দহনে বিমূঢ় হন নি। তিনি নিশ্চিত জানেন, দুঃখ জ্বালা জীবন সাধনার অঙ্গ, ব্রহ্মময়ীর লীলা। এই চেতনা নিয়ে কবি ব্রহ্মময়ীর কাছে থেকে দুঃখ পেয়ে তাঁর সঙ্গে মান অভিমানের পালা শুরু করেন, কপট কলহে রত হন, স্পষ্টতঃই জিজ্ঞাসা করেন :

কোন্ অধিকারে আমার পরে
করলে দুখের ডিক্রী জারি।

কিম্বা, মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত ?

অবশ্য তিনি নিঃসংশয়ে জানেন বিশ্বমাতাই সকল কিছুর মূল :

সংসার বিষে জ্বলি যত
দুর্গা দুর্গা বলি তত।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে শাক্তকবি তাঁর আরাধ্যা দেবীকে দেখতে পান, তিনি সবত্র বিরাজমানা :

মন তোমার এই ভ্রম গেল না ?
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
ওবে ত্রিভুবন যে মায়েব মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না ?

এই সবত্র-প্রতিভাতা মাতৃরূপই আবাব কবির কল্পনায় আমাদেব গৃহসীমায় উদিত হয়েছে। কবি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে শিবজায়া উমাকে আপন গৃহসীমায় কন্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আগমনী-বিজয়ায় সেই কন্যাপ্রীতির সুখ আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ঝংকৃত-হয়েছে। সেকালে অল্পবয়স্কা বালিকা কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হতো, সেই কন্যার জন্য পিতামাতার, বিশেষ করে মাতার উদ্বেগের অবধিমাত্র ছিল না। শাক্তকবি এই সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার অধ্যাত্মচেতনাকে অবারিত করেছেন :

কবে যাবে বল গিরিরাজ আনিতে গৌরী।
আকুল হয়েছে প্রাণ দেখিতে উমারে হে॥

মাতা মেনকা উমার জন্য শেষ পর্যন্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন, তার আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত গিরিরাজ হিমালয় উমাকে আনতে কৈলাসে যান। শেষ পর্যন্ত মেনকার অধীর প্রতীক্ষা সার্থক হলো :

উমাশশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে '
এবে নয়নতারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল॥

কিন্তু এ আনন্দ অচিরেই স্বর্ণমৃগের মত মিলিয়ে যাবে, সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পরেই দশমীর বিচ্ছেদকাতর দিনটি উপস্থিত হবে। এজন্য মা মেনকা সকাতরে বলেন :

ওরে নবমী নিশি
না হইওরে অবসান।

তুমি অস্ত গেলে নিশি
অস্ত যাবে উমাশশী,
হিমালয় আঁধার করে।

সন্তান স্নেহের এমন সুন্দর সার্থক সুর, এমন মর্মমন্থিত রূপ এর আগে পাওয়া যায়নি। বাঙালীর গার্হস্থ্য রূপের, সন্তানপ্রীতির এমন আন্তরিক অভিব্যক্তি অন্য কোন সাহিত্যধারায় এত তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। রামপ্রসাদ এদিক দিয়ে বাংলা কাব্যধারাকে সাধারণ সমাজের হৃদয়-সম্ভূত একটি স্বর্ণকমল উপহার দিয়েছেন।

চর্যাগীতি পদাবলীর গোমুখী উৎস থেকে বাংলা কাব্যপ্রবাহের যে ক্ষীণ ধারা উষার অস্পষ্ট আলোকসরণি বেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল অষ্টাদশ শতকের চৈত্রশেষের আলোয়-রাঙা অপরাহ্ণে সে তার আদিগন্ত বিস্তৃত দিব্যকান্তি দেহকে সহস্র সম্ভারে সাজিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট এক পরিমণ্ডল রচনা করেছে। একান্তভাবে ধর্মীয় চেতনা থেকে যে কাব্যধারা নির্ঝরিত হয়েছে, কালের রশ্মি সম্পাতে জীবনের বিচিত্র-বর্ণের ইন্দ্রধনু শোভায় তা অলংকৃত হয়েছে। গীতিসুর দিয়ে যার যাত্রা শুরু তাতে এসে মিশেছে কত জীবনের কত ধারা। খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকের সীমারেখায় যে কাব্যদেহ ছিল মুকুলিকা বালিকার মত অষ্টাদশ শতকের প্রান্তসীমায় সে পরিপূর্ণ যৌবনের ঐশ্চর্যমহিমায় হলো প্রতিষ্ঠিত। তার রূপের যেন সীমা পরিসীমা নেই অথচ তার ভাব অচঞ্চল, সে কলাবতী নিপুণা নায়িকা। এই বিস্তীর্ণ প্রবাহের প্রাণরস জুগিয়েছে সংস্কৃত ঐতিহ্য, বাংলার জলমাটির স্বভাবধর্ম, এমন কি স্বদেশী শাসকের বিজাতীয় ধর্মসংস্কৃতির ভাবধারা। তাই আধুনিকপূর্বযুগেই বাংলা কাব্যধারা 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরের' অমৃত-প্রবাহ হয়ে উঠেছে।

নির্ঘণ্ট

কবি

কাব্য

অন্যান্য বই

প্রবন্ধ

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ১২.০০
—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৈরাজ্যবাদ—ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু ১০.০০

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ৬.০০
—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫.০০
সং ও অনু : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৮.০০

আমার ঘরের আশেপাশে ৫.০০
(নরসিংহদাস পুরস্কার প্রাপ্ত)
—ডঃ তারকমোহন দাস
ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু** জাতীয় অধ্যাপক

চায়ের ধোঁয়া— উৎপল দত্ত ৬.০০

জীবন-জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন ৮.০০
সং ও অনু : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু**, জাতীয় অধ্যাপক

সুখের সন্ধানে—বার্টাণ্ড রাসেল ৫.০০
অনু : পরিমল গোস্বামী

বিবাহ-সাধনা—শচীন্দ্র মজুমদার ৩.০০